আব্বাস আলী খান

বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস

বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস

[প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ]

আব্বাস আলী খান

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

সূচীপত্র

গ্রন্থকারের কথা ॥ ৯

প্রথম অধ্যায়

বাংলায় মুসলমানদের আগমন ॥ ১৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিজয়ীর বেশে মুসলমান ॥ ২০
বাংলায় মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা ॥ ২১
বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ ॥ ২৫
রাজা গণেশ ॥ ২৬
ইলিয়াস শাহী বংশ ॥ ২৭
হিন্দুজাতির পুনরুত্থান ॥ ৩০
গণেশের বংশ ॥ ৩৫
ইলিয়াস শাহী বংশের পুনরুত্থান ॥ ৩৫
বাংলার মসনদে হাবশী সুলতান ॥ ৩৫
হোসেন শাহ ॥ ৩৬
শ্রীচৈতন্য ॥ ৪১
হোসেন শাহী বংশ ॥ ৪৭

তৃতীয় অধ্যায়

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাংলায় আগমন ॥ ৫০
মীর জুমলা থেকে সিরাজদ্দৌলা ॥ ৫১
নবাব শায়েস্তা খান ॥ ৫১
ফিদা খান ও যুবরাজ মুহাম্মদ আজম ॥ ৫১
সুবাদার ইব্রাহীম খান ॥ ৫২
সুবাদার আজিমুশ্‌শান ॥ ৫৩
মুর্শিদ কুলী খান ॥ ৫৪
সুজাউদ্দীন ॥ ৫৪
সরফরাজ খান ॥ ৫৫
আলীবর্দী খান ॥ ৫৫
সিরাজদ্দৌলা ॥ ৫৬

চতুর্থ অধ্যায়
বাংলার মুসলিম শাসন বিলুপ্তির পটভূমি ॥ ৫৭
মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ॥ ৫৯
বাংলার পতনের রাজনৈতিক কারণ ॥ ৭০
বাংলায় ইংরেজদের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের উচ্চাভিলাষ ॥ ৭৮
ফল্‌তায় ইংরেজগণ ॥ ৮৩

পঞ্চম অধ্যায়
ইংরেজদের আক্রমণ ও নবাবের পরাজয় ॥ ৮৬
সিরাজদ্দৌলার পতনের পর বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা ॥ ৯৪

ষষ্ঠ অধ্যায়
মুসলিম সমাজের দুর্দশা ॥ ৯৭
নবাব ॥ ১০১
সম্ভ্রান্ত বা উচ্চশ্রেণীর মুসলমান ॥ ১০১
নিম্নশ্রেণীর মুসলমান ঃ কৃষক ও তাঁতী ॥ ১০৫
তাঁতী ॥ ১০৮
হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক ঃ ধর্ম ও সংস্কৃতি ॥ ১১১
সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ॥ ১১৬

সপ্তম অধ্যায়
মুসলমানদের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা-দীক্ষা ॥ ১৪০
ইংরেজদের আগমনের পর ॥ ১৪৪
খৃস্টান মিশনারী ও ইংরেজী শিক্ষার সূচনা ॥ ১৫০
বাংলার মুসলমান ও বোধনকৃত নতুন বাংলাভাষা ॥ ১৮০
আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও সাম্প্রদায়িকতা ॥ ১৮৮

অষ্টম অধ্যায়
আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলমান ॥ ১৯১
উনবিংশ শতকে মুসলমান ঃ
মুসলমান চরম অগ্নি পরীক্ষার মুখে ॥ ১৯৩
ফকীর আন্দোলন ॥ ১৯৪

নবম অধ্যায়
ফারায়েজী আন্দোলন ॥ ১৯৯

দশম অধ্যায়
শহীদ তিতুমীর ॥ ২০৭
কোলকাতায় জমিদারদের ষড়যন্ত্র সভা ॥ ২২১
আলেকজান্ডার রিপোর্ট ও তার প্রতিক্রিয়া ॥ ২২৯

একাদশ অধ্যায়
সাইয়েদ আহমদ শহীদের জিহাদী আন্দোলন ॥ ২৩৩
মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব ॥ ২৩৪
শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র) ॥ ২৪২
শাহ আবদুল আযীয (র) ॥ ২৪৪
শাহ ওয়ালিউল্লার বংশতালিকা ॥ ২৪৫
সাইয়েদ আহমদ শহীদ ॥ ২৪৫
বালাকোট বিপর্যয়ের কারণ ॥ ২৫৫
বালাকোট বিপর্যয়ের পর ॥ ২৭০
মওলানা বেলায়েত আলী ॥ ২৭০
বিপ্লবী আহমদুল্লাহ ॥ ২৭৩
মওলানা ইহাহ্‌ইয়া আলী ॥ ২৭৯
মওলানা ইমামুদ্দীন ॥ ২৮৩
সূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী ॥ ২৮৪

দ্বাদশ অধ্যায়
বৃটিশ ভারতের প্রথম আযাদী সংগ্রাম ॥ ২৮৫

ত্রয়োদশ অধ্যায়
স্যার সাইয়েদ আহমদ খান ॥ ৩০৪
বংগভংগ ॥ ৩০৬
আর্য সমাজ ॥ ৩০৭
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ॥ ৩০৯
বালগংগাধর তিলক ॥ ৩০৯

চতুর্দশ অধ্যায়
বংগভংগ রদ ও তার প্রতিক্রিয়া ॥ ৩৩৫

পঞ্চদশ অধ্যায়
উনিশ শ' ছয় থেকে ছত্রিশ ॥ ৩৪৪

খেলাফত আন্দোলন ॥ ৩৪৭
হিজরত আন্দোলন ॥ ৩৫০
মোপ্‌লা বিদ্রোহ ॥ ৩৫৩
ইসলাম ও মুসলমানদের উপর সুপরিকল্পিত হামলা ॥ ৩৫৯
সংগঠন আন্দোলন ॥ ৩৬১
মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের স্বাতন্ত্র দাবী ॥ ৩৬২
সর্বদলীয় সম্মেলন ॥ ৩৬২
মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঐতিহাসিক চৌদ্দ দফা ॥ ৩৬৩
সাইমন কমিশন ॥ ৩৬৪
গোলটেবিল বৈঠক ॥ ৩৬৪
দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ॥ ৩৬৬
তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক ॥ ৩৬৬
পুনাচুক্তি ॥ ৩৬৭
ভারত শাসন আইন ॥ ৩৬৮

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম অধ্যায় ॥ ৩৭০
ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ ॥ ৩৭১
প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন ॥ ৩৭২
রক্ষাকবচ প্রশ্নে অচলাবস্থা সৃষ্টি ॥ ৩৭৪
নির্বাচনের ফলাফল ॥ ৩৭৬
বাংলা ॥ ৩৭৬
পাঞ্জাব ॥ ৩৮০
সিন্ধু ॥ ৩৮১
আসাম ॥ ৩৮১

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রদেশগুলোতে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা ॥ ৩৮৩
কংগ্রেস শাসন এবং মুসলমান ॥ ৩৮৮

তৃতীয় অধ্যায়
মুসলিম লীগ-কংগ্রেস আলোচনা ॥ ৩৯৯

চতুর্থ অধ্যায়
পাকিস্তান আন্দোলন ॥ ৪০৪

পঞ্চম অধ্যায়
পাকিস্তানের আদর্শিক ভিত্তি ॥ ৪১৩

ষষ্ঠ অধ্যায়
পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা ॥ ৪৩০

সপ্তম অধ্যায়
বৃটিশ সরকারের আগস্ট প্রস্তাব ॥ ৪৩৩

অষ্টম অধ্যায়
ক্রিপ্‌স্ মিশন ॥ ৪৪১

নবম অধ্যায়
ওয়াভেল পরিকল্পনা ১৯৪৫ ॥ ৪৫৪

দশম অধ্যায়
কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা ॥ ৪৫৯

একাদশ অধ্যায়
ডাইরেক্ট অ্যাকশন ॥ ৪৬৬

দ্বাদশ অধ্যায়
একজেকিউটিভ কাউন্সিলে লীগের যোগদান ॥ ৪৭২

ত্রয়োদশ অধ্যায়
গণপরিষদ ॥ ৪৮০

চতুর্দশ অধ্যায়
মাউন্টব্যাটেন মিশন ॥ ৪৮৩

পঞ্চদশ অধ্যায়
ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া ॥ ৪৯১

ষষ্ঠদশ অধ্যায়
উপসংহার ॥ ৫০০

গ্রন্থকারের কথা

প্রায় দেড় যুগ পূর্বে বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস লেখার দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়। কথা ছিল বাংলায় মুসলমানদের প্রথম আগমন থেকে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ পর্যন্ত এ সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস লেখার। তবে বিশেষভাবে বলা হয় যে, ইংরেজদের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করার পর মুসলমানদের প্রতি বৃটিশ সরকার ও হিন্দুদের আচরণ কেমন ছিল তা যেন নির্ভরযোগ্য তথ্যাদিসহ ইতিহাসে উল্লেখ করি। Government of India Act-1935 পর্যন্ত ইতিহাস লেখার পর আর কলম ধরার ফুরসৎ মোটেই পাইনি। সম্প্রতি কয়েক বছরের শ্রম ও চেষ্টা সাধনায় ইতিহাস লেখার কাজ সমাপ্ত করতে পেরেছি বলে আল্লাহ তা'য়ালার অসংখ্য শুকরিয়া জানাই।

এ ইতিহাসের কোথাও কণামাত্র অসত্য, স্বকপোলকল্পিত অথবা অতিরঞ্জিত উক্তি করিনি। অনেকের কাছে তিক্ত হতে পারে, কিন্তু আগাগোড়া সত্য ঘটনাই লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি।

আমি ইতিহাসের একজন একনিষ্ঠ ছাত্র ছিলাম বলে তখন থেকেই সত্য ইতিহাস জানা ও লেখার প্রবণতা মনের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল। রংপুর কারমাইকেল কলেজের বিএ চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে আকবর ও আওরংজেবের উপরে ইংরেজীতে এক গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করি। কিছু বিরোধিতা ও বাধা সত্ত্বেও প্রবন্ধটি কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়।

শিক্ষা জীবন শেষ করার পর সরকারী ও বেসরকারী চাকুরীতে জীবনের পঁচিশটি বছর কেটে যায়। ইতিহাসের উপর কোন গবেষণামূলক কাজ করার সুযোগ থেকে একেবারে বঞ্চিত হই। বরঞ্চ ইতিহাসই ভুলে যেতে থাকি। দেড় যুগ পূর্বে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নতুন করে ইতিহাস চর্চার সুযোগ হয়েছে।

ইতিহাস একটা জাতির মধ্যে জীবনীশক্তি সঞ্চার করে। কোন জাতিকে ধ্বংস করতে হলে তার অতীত ইতিহাস ভুলিয়ে দিতে হবে অথবা বিকৃত করে পেশ করতে হবে। একজন তথাকথিত মুসলমান যদি ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভের সুযোগ না পায় এবং তার জাতির অতীত ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তাহলে তার মুখ থেকে এমন সব মুসলিম ও ইসলাম বিরোধী কথা বেরুবে যেসব কথা একজন অমুসলমান মুখ থেকে বের করতে অনেক সাতপাঁচ ভাববে। এ ধরনের হস্তীমূর্খ মুসলমানের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে এবং মুসলমানদের জাতশত্রুগণ তাদেরকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করছে।

মুসলিম জাতিসত্তার অস্তিত্ব বক্ষা করতে হলে তাদের সঠিক অতীত ইতিহাসের সাথে ইসলামেরও সঠিক জ্ঞান ও ধারণা নতুন প্রজন্মের মধ্যে পরিবেশনের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ একেবারে অপরিহার্য। বাংলার মুসলমানদের ইতিহাসে প্রসংগক্রমে ইসলামের মূলনীতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। আধিপত্য ও সম্প্রসারণবাদী শক্তির পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রুখতে হলে ইতিহাসের পর্যালোচনা ও ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা সর্বস্তরে তুলে ধরতে হবে।

মুসলমানী জীবনটাই এক চিরন্তন সংগ্রামী জীবন। সংগ্রাম বিমুখতার ইসলামে কোন স্থান নেই। তাই ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অগ্রগামীর ভূমিকা পালন করতে হবে। নতুবা জাতিকে শত্রুর নির্যাতনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে।

'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাসে' প্রায় দু'শ' বছর যাবত মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের উৎপীড়ন অবিচারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। অতীতের কথা কেউ কেউ মনগড়া মনে করতে পারেন। বর্তমান সময়ে ভারতে কি হচ্ছে তা কি তাঁরা দেখছেন না? সেখানে প্রতিনিয়ত সংঘটিত লোমহর্ষক দাংগায় যে মুসলমানদেরকে নির্মূল করা হচ্ছে তা কি তাঁদের চোখে পড়েনা? সম্প্রতি বোম্বাইয়ে সংঘটিত দাংগার জন্য যে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠিত হয়েছিল, তার রায় প্রকাশিত হয়েছে। কমিশনের রায়ে দাংগাকারিদের সহযোগিতা করার জন্য পুলিশকে দায়ী করা হয়েছে। রাজ্য সরকার ও

প্রধানমন্ত্রীর বৈষম্যমূলক আচরণেরও সমালোচনা করা হয়েছে। এরপর উগ্র মুসলিম বিদ্বেষীদের দেশ ভারতে মুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তা কোথায়? ভবিষ্যতে হয়তো এসবের সঠিক ইতিহাস প্রণীত হবে।

পরম পরিতাপের বিষয় এই যে, একটা সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে জাতির নতুন প্রজন্মকে তাদের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ রাখা হয়েছে। এ ষড়যন্ত্রের ভূত বিভাগোত্তর কালের পাকিস্তানী শাসকদের ঘাড়েও শক্ত করে চেপে বসেছিল। পাকিস্তান কি কারণে হয়েছিল, এর আদর্শিক পটভূমি কি ছিল, কেন সুদীর্ঘ সাত বছর নিরলস ও আপোষহীনভাবে পাকিস্তান আন্দোলন করা হলো, কেন লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ-শিশু খুনের দরিয়া সাঁতার দিয়ে পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিল, তার কোন কিছুই নতুন প্রজন্মকে জানানো হয়নি।

আমাকে ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে হয়। তখনকার পাঠ্য ইতিহাসে পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাসের কোন উল্লেখ ছিলনা। যার ফলে পাকিস্তানের ভিত্ আরও নানা কারণে দুর্বল হতে থাকে। পাকিস্তান ও তার শাসকদের প্রতি জনগণের অসন্তোষ ও ক্ষোভ বাড়তে থাকে যার পরিণামে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ নামে আত্মপ্রকাশ করে।

অত্র ইতিহাসটিতে মুসলিম জাতির গৌরবময় অতীত ইতিহাসের দিকে নতুন প্রজন্মের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মুসলিম জাতির ইতিহাস কালের কোন এক বিশেষ সময় থেকে শুরু হয়ে কোন এক বিশেষ সময়ে গিয়ে শেষ হয়নি। এ ইতিহাসের সূচনা দুনিয়ায় প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ) এর আগমন থেকে। তখন থেকে আজ পর্যন্ত এ ইতিহাস অবিচ্ছিন্নভাবে চলে এসেছে সময়, কাল ও পরিবেশ পরিস্থিতির চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে এবং চলতে থাকবে যতোদিন দুনিয়া বিদ্যমান থাকবে। মুসলমানদেরকে অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেই সামনে অগ্রসর হতে হবে।

এ ইতিহাস লেখার জন্য বহু খ্যাতনামা ঐতিহাসিকের গ্রন্থ থেকে মালমশলা সংগ্রহ করেছি। তার জন্য তাঁদের সকলের নিকটে চির কৃতজ্ঞ রইলাম। অতঃপর

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার গ্রন্থখানার প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছেন বলে এর ডাইরেক্টর আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদ সাহেবকে জানাই আমার অশেষ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ এ গ্রন্থ থেকে কিছু শিক্ষা ও ইসলামী প্রেরণা লাভ করতে পারলে আমার কয়েক বছরের অধ্যবসায় ও শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব। আল্লাহ তায়ালা এ গ্রন্থখানা কবুল করুন—আমীন।

ঢাকা, ১৫ই জমাদিউল আউয়াল
১৭ই কার্তিক
পয়লা নভেম্বর ১৯৯৩ সাল। গ্রন্থকার

বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

বাংলায় মুসলমানদের আগমন

বাংলায় সর্বপ্রথম মুসলমানদের আগমন কখন হয়েছিল, তার সন তারিখ নির্ধারণ করা বড়োই দুঃসাধ্য কাজ। প্রাচীন ইতিহাসের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত স্তূপ থেকে তা উদ্ধার করা বড়ো কষ্টসাধ্য কাজ সন্দেহ নেই। তবুও ইতিহাসবেত্তাদের এ কাজে মনোযোগ দেয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি।

তৎকালীন ভারত উপমহাদেশে বহির্জগত থেকে যেসব মুসলমান আগমন করেছিলেন, তাদেরকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর মুসলমান ব্যবসা–বাণিজ্য ব্যপদেশে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আগমন করে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার করেন। কতিপয় অলী দরবেশ ফকীর শুধুমাত্র ইসলামের দাওয়াত ও তবলিগের জন্যে আগমন করেন এবং এ মহান কাজে সারা জীবন অতিবাহিত করে এখানেই দেহত্যাগ করেন।

আর এক শ্রেণীর মুসলমান এসেছিলেন—বিজয়ীর বেশে দেশজয়ের অভিযানে। তাঁদের বিজয়ের ফলে এ দেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। বলা বাহুল্য ৭১২ খৃষ্টাব্দে ভারতের সিন্ধু প্রদেশে সর্বপ্রথম মুহাম্মদ বিন কাসিম আগমন করেন বিজয়ীর বেশে এবং এটা ছিল ইসলামের বিরাট রাজনৈতিক বিজয়। তাঁর বিজয় সিন্ধুপ্রদেশ পর্যন্তই সীমিত থাকেনি। বরঞ্চ তা বিস্তার লাভ করে পাঞ্জাবের মুলতান পর্যন্ত। আমরা যথাস্থানে তার বর্ণনা সন্নিবেশিত করব।

অপরদিকে বাংলায় মুসলমানদের আগমন দূর অতীতের কোন এক শুভক্ষণে হয়ে থাকলেও তাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ হয়েছিল—হিজরী ৬০০ সালে অর্থাৎ ১২০৩ খৃষ্টাব্দে। তৎকালীন ভারত সম্রাট কুত্‌বুদ্দীন আইবেকের সময়ে মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিল্‌জী, বলতে গেলে অলৌকিকভাবে, বাংলায় তাঁর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মুসলমানদের এ উভয় রাজনৈতিক বিজয়ের বিস্তারিত বিবরণ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু এসবের অনেক পূর্বেই যে এ দেশে ইসলামের বীজ বপন করা হয়েছিল এবং সে উপ্ত বীজ

অংকুরিত হয়ে পরবর্তীকালে তা যে একটি মহীরুহের আকার ধারণ করেছিল, তাও এক ধ্রুব সত্য—কিন্তু তার সময়কাল নির্ধারণটাই হলো আসল কাজ যা ইতিহাসের প্রতিটি অনুসন্ধিৎসু ছাত্রের জন্যে একান্ত বাঞ্ছনীয়। আসুন ঐতিহাসিক দিকচক্রবাল থেকে কোন দিগদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা তা একবার চেষ্টা করে দেখা যাক।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরববাসী শুধু বর্বর, কলহপ্রিয় ও রক্তপিপাসু জাতিই ছিল না। বরঞ্চ তাদের মধ্যে যারা ছিল অভিজাত ও বিত্তশালী, তারা জীবিকার্জনের জন্যে ব্যবসা–বাণিজ্য করতো। মরুময় দেশে জীবন ধারণের জন্যে খাদ্য এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাদেরকে আবহমান কাল থেকেই ব্যবসা–বাণিজ্য করতে হতো। যে বণিক দল হযরত ইউসুফকে (আ) কূপ থেকে উদ্ধার করে মিশরের জনৈক অভিজাত বংশীয় রাজকর্মচারীর কাছে বিক্রয় করে, তারা ছিল আরববাসী। অতএব আরববাসীদের ব্যবসার পেশা ছিল অত্যন্ত প্রাচীন এবং বিস্তৃত ছিল দেশ–দেশান্তর পর্যন্ত।

স্থলপথ জলপথ উভয় পথেই আরবগণ তাদের ব্যবসা পরিচালনা করতো। উটের সাহায্যে স্থলপথে এবং নৌযানের সাহায্যে তারা বাণিজ্য–ব্যপদেশে দেশ থেকে দেশান্তরে ভ্রমণ করতো। প্রাক ইসলামী যুগেই তারা একদিকে সমুদ্র পথে আবিসিনিয়া এবং অপরদিকে সুদূর প্রাচ্য চীন পর্যন্ত তাদের ব্যবসার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করেছিল। আরব থেকে সুদূর চীনের মাঝপথে তাদের কয়েকটি ঘাঁটিও ছিল। এ পথে তাদের প্রথম ঘাঁটি ছিল মালাবার। মালাবার মাদ্রাজ প্রদেশের সমুদ্রতীরবর্তী একটি জেলা। ভৌগোলিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ উপদ্বীপটিকে মালাবার নামে অভিহিত করা হয়। আরব ভৌগোলিকগণের অনুলিখনে একে মালিবার (مليبار) বলা হয়েছে।

মওলানা আকরাম খাঁ তাঁর 'মুসলেম বংগের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে বলেনঃ

"আধুনিক গ্রীকদিগের মলি (MALI) শব্দে বর্তমান মালাবার নামের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ 'মালাবার' নাম আরববাসী কর্তৃক প্রদত্ত হয়—বিশ্বকোষ সম্পাদকের এই সিদ্ধান্তটা খুবই সংগত। আমাদের মতে মালাবার, আরবী ভাষার শব্দ—মলয় + আবার = মালাবার। আরবী অনুলিখনে م ل ى মলয় + আবার। মলয় মূলতঃ একটি পর্বতের নাম, আবার অর্থ কূপপুঞ্জ, জলাশয়। আরবরা

এদেশকে মা'বারও معبر বলিয়া থাকেন। উহার অর্থ, অতিক্রম করিয়া যাওয়ার স্থল, পারঘাট। আজকালকার ভূগোলে পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট। যেহেতু আরব বণিক ও নাবিকরা এই ঘাট দুইটি পার হইয়া মাদ্রাজে ও হেজাজ প্রদেশে যাতায়াত করিতেন, এবং মিশর হইতে চীনদেশে ও পথিপার্শ্বস্থ অন্যান্য নগরে বন্দরে গমনাগমন করিতেন, এই জন্য তাহারা এই দেশকে মা'বার বলিয়া উল্লেখ করিতেন। এই নাম দুইটি হইতে ইহাও জানা যাইতেছে, এই দেশের সহিত তাহাদের পরিচয় অতি পুরাতন এবং সম্বন্ধ ছিল অতি ঘনিষ্ঠ।" (মুসলেম বংগের সামাজিক ইতিহাস, পৃঃ ৪৭–৪৮)।

নবী মুহাম্মদ মুস্তাফার (সা) দুনিয়ায় আগমনের বহুকাল পূর্বে বহুসংখ্যক আরব বণিক এদেশে (মালাবারে) আগমন করেছিলেন। তারা হরহামেশা এ পথ দিয়ে অর্থাৎ মালাবারের উপর দিয়ে চট্টগ্রাম এবং সেখান থেকে সিলেট ও কামরূপ হয়ে চীন দেশে যাতায়াত করতেন। এভাবে বাংলার চট্টগ্রাম এবং তৎকালীন আসামের সিলেটও তাদের যাতায়াতের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হতো। এর থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রাক ইসলামী যুগেই মালাবার, চট্টগ্রাম, সিলেট প্রভৃতি স্থানে আরবদের বসতি গড়ে উঠেছিল।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে নবী মুস্তাফা (সা) আরবের মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং চল্লিশ বৎসর বয়সে অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে দ্বীন ইসলামের প্রচার কার্য শুরু করেন। তাঁর প্রচার আন্দোলন ছিল অত্যন্ত বিপ্লবাত্মক। এ বিপ্লবের ঢেউ আরব বণিকদের মাধ্যমে মালাবার, চট্টগ্রাম, সিলেট ও চীনদেশেও—যে পৌঁছেছিল, তা না বল্লেও চলে। নবী মুহাম্মদের (সা) বিপ্লবী আন্দোলনের যেমন চরম বিরোধিতা করেছে এক দল, তেমনি এ আন্দোলনকে মনেপ্রাণে গ্রহণও করেছে এক দল। মালাবারের আরববাসীগণ খুব সম্ভব হিজরী সনের প্রারম্ভেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এটাও এক ঐতিহাসিক সত্য যে, সপ্তম শতক পর্যন্ত এশিয়া ও আফ্রিকায় ইসলামের বাণী প্রচারিত হয়েছিল আরব বণিকদের দ্বারাই।

মালাবারে যেসব আরব মুহাজির ইসলাম গ্রহণ করার পর স্থায়ীভাবে বসবাস করে তারা মোপ্‌লা নামে পরিচিত। ছোটো বড়ো নৌকার সাহায্যে মাছ ধরা এবং মাল ও যাত্রী বহন করা ছিল তাদের জীবিকার্জনের প্রধান পেশা। অনেক সময়ে তাদেরকে জীবিকার্জন ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের জন্যে ভারত মহাসাগর পাড়ি

সিংহাসন ত্যাগ করতঃ এসব আরব মুহাজিরগণের সংগে ইসলাম গ্রহণ করেন। সিংহাসন ত্যাগের পর তাঁর পরিচয় গোপন করাটাও অসম্ভব কিছু নয়—আর এই কারণেই হয়তো তাঁর ইসলাম গ্রহণ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কোন কৌতূহলের উদ্রেক করেনি। তথাপি তোহ্‌ফাতুল মুজাহেদীনের গ্রন্থকার কতিপয় হাদীসের ও রাবীর উল্লেখ করেছেন।

মালাবারের আরব মুহাজিরগণের এবং স্থানীয় রাজার ইসলাম গ্রহণের পর স্থানীয় মালাবারবাসীগণও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তারা দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হয়। তারপর মালাবারে পরপর দশটি মসজিদ নির্মিত হয়। প্রথম মসজিদ পেরুমলের রাজধানী কর্ণক্লোর (কোড়ঙ্গনূর) বা ক্রাঙ্গানূরে নির্মাণ করেন মালেক ইব্‌নে দীনার। এভাবে ত্রিবাংকোরের অন্তর্গত কওলাম বা কোল্লমে, ডিল্লি পর্বতে, দক্ষিণ কানাডার অন্তর্গত কুর্কবে, মঈলোর নগরে, ধর্মপত্তন নগরে, চালিয়াম নগরে, সুরুকুন্ডপুরমে, পন্থারিণীতে এবং কঞ্জরকোটে মসজিদ নির্মিত হয়।

"বিশ্বকোষ প্রণেতা বলেন ঃ মসজিদ প্রতিষ্ঠার সংগে সংগেই যে এদেশে মুসলমান প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নেই। এই সকল মসজিদের ব্যয়ভার বহনের জন্য অনেক সম্পত্তিও প্রদত্ত হইয়াছিল। . . .ঐ সময়ে উপকূলবাসী মুসলমানগণের এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত দেশীয় অধিবাসীদিগের সংখ্যায় পরিবৃদ্ধি হইয়াছিল। ক্রমে তাহারা রাজ্য-মধ্যে প্রভাব সম্পন্ন হইয়া উঠে।" (মুসলেম বংগের সামাজিক ইতিহাস)

উপরের আলোচনায় এ সত্য প্রকট হয়ে যায় যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতকেই ভারতের মালাবার মুসলমানদের একটি শক্তিশালী কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল। তাদের ছিল না কোন রাজনৈতিক লক্ষ্য। ব্যবসা-বাণিজ্য ও ইসলামের প্রচার ও প্রসার ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য।

মালাবারের পরেই মুসলিম আরব মুহাজিরদের বাণিজ্য পথের অন্যান্য মনযিল্ চট্টগ্রাম ও সিলেটের কথা আসে। মালাবারে আরব মুহাজিরদের স্থায়ী বসবাসের পর তাদের অনেকেই চট্টগ্রাম বন্দরে ব্যবসার ক্ষেত্র তৈরী করে এবং এখানেও তাদের অল্পবিস্তর বসতি গড়ে উঠে। এটাই ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, মালাবারে যেমন প্রথম হিজরী শতকেই ইসলাম দানা বেঁধেছিল, চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচার কি সমসাময়িক কালেই হয়েছিল, না তার অনেক পরে। এ সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পরিবেশন করা সম্ভবপর নয়। তবে খৃষ্টীয়

অষ্টম-নবম শতকে আরবের মুসলমান বণিকদের চট্টগ্রামের সাথে যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল তা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে।

ডক্টর আবদুল করিম তাঁর 'চট্টগ্রামের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেন ঃ . . .খৃষ্টীয় অষ্টম/নবম শতাব্দীতে চট্টগ্রামের সংগে আরবীয় মুসলমান বণিকদের যোগাযোগ ছিল। পরবর্তীকালে চট্টগ্রামে আরব ব্যবসায়ীদের আনা-গোনার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। আরব বণিকেরা চট্টগ্রামে স্বাধীন রাজ্যগঠন না করলেও আরবদের যোগাযোগের ফলে চট্টগ্রামের সংস্কৃতিতে তাদের প্রভাব এখনও পরিলক্ষিত হয়। চট্টগ্রামী ভাষায় প্রচুর আরবী শব্দ ব্যবহৃত হয়। চট্টগ্রামী ভাষায় ক্রিয়াপদের পূর্বে 'না' সূচক শব্দ ব্যবহারও আরবী ভাষার প্রভাবের ফল। অনেক চট্টগ্রামী পরিবার আরব বংশসম্ভূত বলে দাবী করে। চট্টগ্রামী লোকের মুখাবয়ব আরবদের অনুরূপ বলেও অনেকে মনে করেন। তাছাড়া চট্টগ্রামের কয়েকটি এলাকা যেমন, আলকরণ, সুলুক বহর (সুলুক-উল-বহ্‌র), বাকালিয়া ইত্যাদি এখনও আরবী নাম বহন করে। আগেই বলা হয়েছে যে, কোন কোন পন্ডিত মনে করেন যে, আরবী শব্দ শৎ (বদ্বীপ) এবং গঙ্গা (গঙ্গ) থেকেই চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি হয়। (ইস্টার্ন বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, চট্টগ্রাম পৃঃ-১)।

চট্টগ্রামে কয়েক শতাব্দী যাবত মুসলমান বসবাস করলেও তারা কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেননি। তাদের কাজ ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য ও ইসলাম প্রচার। মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বাংলায় মুসলমান শাসন কায়েমের অনেক পরে সোনার গাঁয়ের স্বাধীন সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ (১৩৩৮-৪৯ খৃঃ) সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম জয় করে তা মুসলিম শাসনের অন্তর্ভুক্ত করেন।

দিয়ে আরব দেশে যাতায়াত করতে হতো। এভাবেই তারা ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াতের সংস্পর্শে এসেছিল।

মোপ্লাদের সম্পর্কে পরবর্তী কোন এক অধ্যায়ে আলোচনার বাসনা রইলো। এখানে, তাদের সম্পর্কে শুধু এতটুকু বলে রাখতে চাই যে, তারা ছিল অত্যন্ত কর্মঠ ও অধ্যবসায়ী। সুন্দর ও বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী ছিল তারা। সাহসিকতায় এরা চিরপ্রসিদ্ধ। এরা দাড়ি রাখে এবং মাথায় টুপি পরিধান করে, এদের মধ্যে অনেকেই ধীবর জাতীয় এবং ধীবরদের মধ্যে ইসলামের বাণী প্রচার করা ছিল এদের প্রধান কাজ।

মালাবারের অনারব অধিবাসীদের মধ্যেও ধীরে ধীরে ইসলামের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সেকালে ভারতে বৌদ্ধ এবং জৈন মতাবলম্বীদের উপরে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের নিষ্ঠুর ও অমানুষিক নির্যাতন চলছিল। এসব নির্যাতন উৎপীড়নের মুখে মুসলমান সাধুপুরুষের সাহচর্য ও সান্নিধ্য তাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে।

মালাবারের অনারব অধিবাসীদের মধ্যে ইসলামের দ্রুত বিস্তার লাভের প্রধান কারণ মালাবারের স্থানীয় রাজার ইসলাম গ্রহণ। মালাবার-রাজের ইসলাম গ্রহণের চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণিত আছে।

মওলানা আকরাম খাঁ তাঁর পূর্ব বর্ণিত গ্রন্থে বলেন ঃ

"হিন্দু সমাজের প্রাচীন শাস্ত্রে ও সাহিত্যে মালাবার সম্বন্ধে কিছু কিছু উল্লেখ দেখা যায়। বিশ্বকোষের সম্পাদক মহাশয় তাহার অনেকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেগুলির অধিকাংশই মহাভারত ও পুরাণাদি পুস্তক হইতে উদ্ধৃত পরশুরামের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে কতকগুলি উদ্ভট উপকথা ছাড়া আর কিছুই নহে। তবে এই কোষকার নিজে মালাবারের হিন্দুরাজা সম্বন্ধে একটা বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন ঃ পুরাবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে, চেরর রাজ্যের শেষ রাজা চেরুমল পেরুমল ইচ্ছাপূর্বক সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ অভিলাষে মক্কা নগরীতে গমন করেন—(বিশ্বকোষ-১৪ঃ২৩৪)।

শেখ যয়নুদ্দিন কৃত তোহ্‌ফাতুল মুজাহেদীন পুস্তকেও একজন রাজার মক্কা গমন, তাঁহার হযরত রসূলে করীমের খেদমতে উপস্থিত হওয়া এবং স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। .... তাহার এই বর্ণনা হইতে জানা যাইতেছে যে, মালাবারের রাজা-যে মক্কায় সফর করিয়াছিলেন এবং হযরতের

খেদমতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট ইসলামের বয়আত গ্রহণ করিয়াছিলেন, স্থানীয় মুসলমানদিগের মধ্যে ইহাই মশহুর ছিল।"

মওলানা তাঁর উক্ত গ্রন্থে আরও মন্তব্য করেন ঃ

"স্থানকালাদির খুঁটিনাটি বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও এবং সেগুলিকে অবিশ্বাস্য বলিয়া গৃহীত হইলেও রাজার মক্কায় যাওয়ার, হযরতের খেদমতে উপস্থিত হওয়ার এবং কিছুকাল মক্কায় অবস্থান করার পর দেশে ফিরিয়া আসার জন্য সফর করার বিবরণকে ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার কোন কারণ নাই। মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে একটা দেশের সমস্ত অধিবাসী আবহমান কাল হইতে যে ঐতিহ্যকে সমবেতভাবে বহন করিয়া আসিতেছে তাহাকে অনৈতিহাসিক ও ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া কোনও মতে বিবেচিত হইতে পারে না। এই প্রসংগে বিশেষভাবে বিবেচ্য হইতেছে বিশ্বকোষের বিবরণটি। কোষকার বলিতেছেন ঃ 'পুরাবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে, চেরর (মালাবার) রাজ্যের শেষ রাজা চেরুমল পেরুমল ইচ্ছাপূর্বক সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণাভিলাষে মক্কা নগরীতে গমন করেন।' সুতরাং মালাবার রাজ্যের রাজার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সিংহাসন ত্যাগ করা এবং হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করার বিবরণকে ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া আদৌ সংগত হইতে পারে না।" (মুসলেম বংগের সামাজিক ইতিহাস)

এখন শেখ যয়নুদ্দীন প্রণীত তোহ্‌ফাতুল মুজাহেদীন গ্রন্থের বিবরণ, বিশ্বকোষের বিবরণ, মালাবারের মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে সকল অধিবাসীর আবহমান কালের ঐতিহ্য অনুযায়ী রাজার ইসলাম গ্রহণ ব্যাপারটি সত্য বলে গ্রহণ করতে দ্বিধাসংকোচ থাকার কথা নয়। কিন্তু তথাপি একটি প্রশ্ন মনের মধ্যে রয়ে যায়। তা হচ্ছে এই যে, এত বড়ো একটি ঘটনা হাদীসের কোন গ্রন্থে বর্ণিত হয়নি কেন? অবশ্য শেখ যয়নুদ্দীন তাঁর বিবরণে কতিপয় রাবীর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হাদীসবেত্তাদের মতে তা' সন্দেহমুক্ত নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আসল ব্যাপারটি তাহলে কি ছিল? ঘটনাটিকে একেবারে ভিত্তিহীন বলে গ্রহণ করলে হাদীসগ্রন্থে তার উল্লেখের কোন প্রশ্নই আসে না। কিন্তু এমন হওয়াটাও আশ্চর্যের কিছু নয় যে, মালাবারের আরব মুহাজিরগণ যেমন হিজরী প্রথম সনে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেন, সম্ভবতঃ মালাবারের রাজা

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিজয়ীর বেশে মুসলমান

সাধারণভাবে এ কথা সর্বজন বিদিত যে, মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধুরাজ দাহিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে সিন্ধু প্রদেশে ইসলামের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সিন্ধু প্রদেশ পর্যন্ত সামরিক অভিযান পরিচালনার কাজ বহু পূর্ব থেকেই শুরু হয়। হিজরী প্রথম শতকের মাঝামাঝি সময়ে সিন্ধু অভিযানের সূচনা হয়। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে কয়েকবার সিন্ধু প্রদেশের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু মুহাম্মদ বিন কাসিমের পূর্বে মুসলমানগণ এখানে কোন স্থায়ী প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেননি। সিন্ধুরাজের সহায়তায় জলদস্যু কর্তৃক মুসলিম বণিকগণ বার বার লুণ্ঠিত হওয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়। যুদ্ধে তাদেরকে পরাজিত করে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির পুনরুদ্ধার ও বন্দী বণিকদের মুক্ত করার পর মুসলমানগণ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

পঞ্চদশ হিজরীতে হযরত ওমরের (রা) খেলাফত আমলে উস্‌মান ইবনে আবুল আবী সাকাফী বাহ্‌রাইন ও ওমানের গভর্ণর নিযুক্ত হন। উসমান আপন ভাই হাকামকে বাহ্‌রাইনে রেখে নিজে ওমান চলে যান। সেখান থেকে তিনি একটি সেনাবাহিনী ভারত সীমান্তে প্রেরণ করেন। উক্ত অভিযানের পর পুনরায় তিনি তাঁর ভ্রাতা মুগীরাকে সেনাবাহিনীসহ দেবল (বর্তমান করাচী) অভিমুখে প্রেরণ করেন। মুগীরা সিন্ধুর জলদস্যু ও তাদের সহায়ক শক্তিকে পরাজিত করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

হযরত আলীর (রা) খেলাফতের সময় ৩৯ হিজরীর প্রারম্ভে হারীস ইবনে মুররা আবৃদী সিন্ধু সীমান্তে অভিযান পরিচালনা করে জয়ী হন। বহু শত্রুসেনা বন্দী করেন এবং প্রচুর গণীমতের মাল হস্তগত করেন।

আমীর মুয়াবিয়ার (রা) শাসনামলে মুহাল্লাব ইবনে আবু সুফ্‌রা সিন্ধুর সীমান্ত আক্রমণ করেন এবং মুলতান ও কাবুলের মধ্যবর্তী স্থান বান্না ও আহ্‌ওয়াজ পর্যন্ত অগ্রসর হন।

খলিফা ওয়ালিদের শাসনামলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ইরাকের গভর্ণর নিযুক্ত হলে তিনি সিন্ধু অভিযানের উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ ইবনে হারুন নসিরী, উবায়দুল্লাহ ইবনে নবহান এবং বুদায়েল ইবনে তোহ্‌ফা বজলীকে পর পর প্রেরণ করেন। অবশেষে ৯৩ হিজরীতে মুহাম্মদ বিন কাসিম জল ও স্থল উভয় পথে অভিযান পরিচালনা করে সিন্ধু জয় করেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক চূড়ান্তভাবে সিন্ধু প্রদেশ বিজিত হবার বহু পূর্বে তদানীন্তন ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও জারী করা হয়েছিল। তার প্রমাণ এই যে, রাজা দাহির যুদ্ধে নিহত হওয়ার পর সমগ্র সিন্ধু প্রদেশ মুসলমানদের করতলগত হয়। সেখানে শাসন শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করার পর মুহাম্মদ বিন কাসিম সম্মুখের দিকে অভিযান পরিচালনা করেন। পূরাতন ব্রাহ্মণাবাদ জয় করার পর সম্মুখে অগ্রসর হওয়া কালে তাঁকে সাওয়ান্দারবাসীদের সম্মুখীন হতে হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আক্রান্ত জনপদের অধিবাসী ছিল মুসলমান। স্বভাবতঃই তাদের সাথে একটা মিটমাট করার পর অন্যান্য বহু স্থান জয় করে মুহাম্মদ বিন কাসিম পাঞ্জাবের মুলতান নামক স্থানে উপনীত হন। মুলতানও তাঁর করতলগত হয়।

বাংলায় মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা

মালিক ইখ্‌তিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখ্‌তিয়ার কর্তৃক বাংলা বিজয়ের ফলে এ দেশে মুসলমানদের সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। এ সময় থেকে ক্রমাগত অব্যাহত গতিতে ভারতের পশ্চিমাঞ্চল, আফগানিস্তান, ইরান, আরব ও তুরস্ক থেকে অসংখ্য মুসলমান বাংলায় আগমন করতে থাকেন। অধিকাংশ এসেছিলেন সৈনিক হিসাবে, অবশিষ্টাংশ ব্যবসা-বাণিজ্য, ইসলাম প্রচার ও আশ্রয় গ্রহণের উদ্দেশ্যে। এভাবে বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যা হয়ে পড়ছিল ক্রমবর্ধমান।

মুহাম্মদ বিন বখ্‌তিয়ারের বাংলা বিজয় ছিল এক অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। বলতে গেলে এ মানুষটিই এক ঐতিহাসিক বিস্ময়। তিনি ছিলেন তুর্কিস্তানের খালজ বংশসম্ভূত। তাই তাঁর বংশ পরিচয়ের জন্যে তাঁর নামের শেষে খাল্‌জী বা খিলজী শব্দ যুক্ত করা হয়। তাঁর পূর্ব পুরুষদের আবাসভূমি ছিল সীস্তানের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত গারামসীর অথবা দাশ্‌তে মার্গো। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ

বখ্‌তিয়ার খাল্‌জী জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে জন্মভূমি ত্যাগ করে গজনী এবং অতঃপর ভারতের বাদাউনে আগমন করেন। তাঁর দেহ ছিল খর্ব ও হস্তদ্বয় অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘ। সম্ভবতঃ এ কারণেই গজনী ও দিল্লীর সামরিক বাহিনীতে তাঁর চাকুরীর আবেদন গৃহীত হয়নি। কিন্তু তাঁর মধ্যে যে অসীম সাহসিকতা ও দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনার যোগ্যতা ছিল তা বুঝতে পেরে বাদাউনের সিপাহ্‌সালার তাঁকে সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত করেন। এখান থেকেই তাঁর ভাগ্যোন্নয়ন শুরু হয়। তিরৌরী বা তরাইনের যুদ্ধের পর বখ্‌তিয়ারের চাচা, মুহাম্মদ-ই-মাহমুদ নাগাওরীর শাসনকর্তা আলী নাগাওরীর নিকট থেকে কষমন্ডী বা কষ্টমন্ডীর অধিকার লাভ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর বখ্‌তিয়ার তার অধিকার লাভ করেন। কিছুকাল পর তিনি অযোধ্যার মালিক মুয়াজ্জম হিসামউদ্দীনের নিকট গমন করেন। এ সময়ে তিনি অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্রাদি সংগ্রহ করেছিলেন বলে মালিক হিসামউদ্দীন তাঁকে দু'টি গ্রাম উপঢৌকন স্বরূপ দান করেন। গ্রাম দুটি কারো মতে ভগবৎ ও ডোইলি, কারো মতে সহলন্ড ও সহিলী অথবা কম্পিলা ও পতিয়ালি ছিল। গোলাম হোসেন সলিমীর 'রিয়াযুস্ সালাতীনে' এ গ্রাম দুটির নাম বলা হয়েছে কম্বালা ও বেতালি।

এখান থেকে মুহাম্মদ বখ্‌তিয়ার বিহারের দিকে অগ্রসর হয়ে কয়েকস্থানের ভূস্বামী বা প্রধানদেরকে পরাজিত করে প্রচুর মালে গণীমত হস্তগত করেন। তার দ্বারা তিনি বহু অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্রাদি সংগ্রহ করতে থাকেন। তাঁর বীরত্বের খ্যাতিও চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ঘোর, গজনী, খোরাসান প্রভৃতি অঞ্চলে বার বার বিদ্রোহ, যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাত সংঘটিত হতে থাকায় তথাকার বহুসংখ্যক অধিবাসী দেশত্যাগ করে ভারতে আগমন করে ভাগ্যের অন্বেষণে ঘুরাফেরা করতে থাকে। বখ্‌তিয়ারের সুনাম সুখ্যাতি শ্রবণ করে তারা দলে দলে তাঁর সেনাবাহিনীতে যোগদান করে। এভাবে বখ্‌তিয়ার হয়ে ওঠেন প্রবল শক্তিশালী।

তৎকালীন দিল্লীর সুলতান কুত্‌বউদ্দীন আইবেক বখ্‌তিয়ারের অসীম বীরত্বের কথা জানতে পেরে তাঁর সম্মানের জন্যে 'খিলাত' প্রেরণ করেন এবং এতে করে বখ্‌তিয়ারের শক্তি ও সাহস বহুগুণে বেড়ে যায়। তারপর তিনি সমগ্র বিহার প্রদেশে তাঁর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন। অতঃপর তাঁর অভিযান বাংলার দিকে পরিচালিত হয় এবং ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বাংলার রাঢ় ও বরিন্দ অঞ্চল অধিকার করেন।

বাংলা আক্রমণকালে এর শাসক ছিলেন রায় লক্ষ্মণ সেন। রাজধানী ছিল নদিয়া। রাজধানীসহ এ অঞ্চলটিকে লক্ষ্মণাবতী বলা হতো। 'তাবাকাতে নাসিরী'তে এ সম্পর্কে এক মজার কাহিনী বিবৃত হয়েছে।

রাজ দরবারের গণক ব্রাহ্মণের দল এক ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন যে, এ দেশ অচিরেই তুর্কী মুসলমানদের হস্তগত হবে। দেশ আক্রান্ত হলে রাজাকে বশ্যতা স্বীকার করতে হবে। অন্যথায় দেশবাসীকে প্রচুর রক্তপাত ও লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হবে।

রাজা ব্রাহ্মণ-পন্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করেন যে, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে এহেন মুসলিম অভিযানকারীর কোন চিহ্ন বর্ণনা করা হয়েছে কিনা, যা দেখে তাকে যথাসময়ে চিনতে পারা যায়। তাঁরা বলেন যে, সে তুর্কী সেনা সোজা দন্ডায়মান হলে তাঁর হস্তদ্বয় হাঁটু পর্যন্ত লম্বিত হবে। রাজা রায় লক্ষ্মণ সেন এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাবার জন্যে একদল বিশ্বস্ত লোক নিযুক্ত করেন। তাঁরা অনুসন্ধানের পর রাজাকে বলেন যে, মুহাম্মদ বখ্‌তিয়ারের মধ্যে উপরোক্ত চিহ্ন বিদ্যমান। এদিকে মুহাম্মদ বখ্‌তিয়ারের দুঃসাহসিক অভিযান ও তাঁর জয়জয়কার কারো অজ্ঞাত ছিল না। ব্রাহ্মণ পন্ডিতগণ, সম্মানী ও জ্ঞানী-গুণী, ভূস্বামী ও প্রধান প্রধান ব্যক্তি দেশ-পরিত্যাগ করে জগন্নাথ, কামরূপ এবং অন্যান্য নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজা তখনো তাঁর রাজধানী পরিত্যাগ করা সমীচীন মনে করেননি। হঠাৎ এক সময় মুহাম্মদ বখ্‌তিয়ার নদিয়া আক্রমণ করে রাজধানীতে প্রবেশ করলে, রাজা রাজ-প্রাসাদের পশ্চাদ্বার দিয়ে পলায়ন করে বিক্রমপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এভাবে সমগ্র লক্ষ্মণাবতী বখ্‌তিয়ারের করতলগত হয়— বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, মাত্র সতেরো জন অশ্বারোহীসহ মুহাম্মদ বখ্‌তিয়ার নদিয়া আক্রমণ ও জয় করেন।

অতঃপর তাঁর অভিযান বিস্তার লাভ করে এবং নবদ্বীপ ও গৌড় তাঁর করতলগত হয়। 'তারিখে ফেরেশতা'য় বর্ণিত আছে যে, মুহাম্মদ বখ্‌তিয়ার বাংলাদেশে রংপুর নামে এক নতুন রাজধানী নির্মাণ করেন। এর থেকে বুঝতে পারা যায় যে, বাংলার শুধু পূর্বাঞ্চল ব্যতীত সমগ্র রাঢ় ও বরেন্দ্র অঞ্চল অর্থাৎ দক্ষিণ ও উত্তর বংগ তাঁর শাসনাধীন হয়েছিল। রায় লক্ষ্মণ সেন বিক্রমপুরে আশ্রয় গ্রহণ করলেও তাঁর পশ্চাদানুসরণ বখ্‌তিয়ার করেননি। যার ফলে বাংলার পূর্বাঞ্চল ছিল তাঁর শাসনের বাইরে। এক শতাব্দীকাল পর ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে

মুহাম্মদ তোগলোক শাহ পূর্বাঞ্চল জয় করেন এবং সাতগাঁও ও সোনারগাঁও-এ যথাক্রমে রাজধানী স্থাপন করেন।

যাহোক, মুহাম্মদ বখতিয়ারের বাংলা বিজয়ের ফলে বহিরাগত মুসলমান দলে দলে এ দেশে বসতিস্থাপন করেন। ব্যবসা বাণিজ্য, সেনাবাহিনীতে চাকুরী ও অন্যান্য নানাবিধ উপায়ে জীবিকার্জনের নিমিত্ত অসংখ্য মুসলমান এ দেশে আগমন করেন এবং এ আগমনের গতিধারা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত।

মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয়ের পর থেকে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশী প্রান্তরে মুসলিম রাজ্যের পতন পর্যন্ত পাঁচ শত চুয়ান্ন বৎসরে একশত একজন বা ততোধিক শাসক বাংলায় শাসন পরিচালনা করেন।

বাংলার মুসলিম শাসনকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

বাংলা-	খিলজীদের অধীনে—	১২০৩-১২২৭ খৃঃ
বাংলা-	দিল্লীর অধীনে—	১২২৭-১৩৪১ খৃঃ
বাংলা-	ইলিয়াস শাহী বংশের অধীনে (প্রথম ধারা)—	১৩৪২-১৪১৩ খৃঃ
বাংলা-	গনেশ জালাল উদ্দীনের অধীনে—	১৪১৪-১৪৪১ খৃঃ
বাংলা-	ইলিয়াস শাহী বংশের অধীনে (দ্বিতীয় ধারা)—	১৪৪২-১৪৮৭ খৃঃ
	হাবশী শাসনাধীন বাংলা—	১৪৮৭-১৪৯৩ খৃঃ
	হুসেনশাহী বংশের অধীনে বাংলা—	১৪৯৩-১৫৩৮ খৃঃ
	পাঠানদের অধীনে (শের শাহ্ ও সূর বংশ) বাংলা—	১৫৩৮-১৫৬৪ খৃঃ
	কররাণী বংশের অধীনে বাংলা—	১৫৬৫-১৫৭৬ খৃঃ
	মোগল শাসনাধীন বাংলা—	১৫৭৬-১৭৫৭ খৃঃ

সাড়ে পাঁচশত বৎসরাধিক কাল যাঁরা বাংলার মসনদে সমাসীন ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কিছুসংখ্যক এমন ছিলেন যাঁরা আপন বাহুবলে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করে দিল্লীর সম্রাটের অনুমোদন লাভ করেন। কিছুসংখ্যক শাসক ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। আর অবশিষ্টাংশ দিল্লীর দরবার থেকে নিয়োগপত্র লাভ করে গভর্ণর অথবা নাজিম হিসাবে বাংলা শাসন করেন।

মুসলমানগণ বিজয়ীর বেশে এ দেশে আগমন করার পর এ দেশকে তাঁরা মনেপ্রাণে ভালোবাসেন, এ দেশকে স্থায়ী আবাসভূমি হিসাবে গ্রহণ করেন এবং

এ দেশের অমুসলিম অধিবাসীর সাথে মিলে মিশে বাস করতে চেয়েছেন। শাসক হিসাবে শাসিতের উপরে কোন অন্যায়-অবিচার তাঁরা করেননি। জনসাধারণও তাঁদের শাসন মেনে নিয়েছিল। মুহাম্মদ বখতিয়ার বাংলা বিজয়ের পর আভ্যন্তরীণ আইনশৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি মুসলমানদের জন্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপন করলেও অমুসলিমদের প্রতি উদার নীতি অবলম্বন করেন। তিনি ইচ্ছা করলে পলাতক লক্ষ্মণসেনের পশ্চাদানুসরণ করে তাকে পরাজিত করতে পারতেন। কিন্তু সে কথা তিনি মনে আদৌ স্থান দেননি। যদুনাথ সরকার তাঁর 'বাংলার ইতিহাসে' বলেন ঃ

" . . . .কিন্তু তিনি রক্তপিপাসু ছিলেন না। নরহত্যা ও প্রজাপীড়ন তিনি পছন্দ করতেন না। দেশে এক ধরনের জায়গীর প্রথা বা সামন্ততান্ত্রিক সরকার কায়েমের দ্বারা আভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও সামরিক প্রধানদের সন্তুষ্টি সাধন করতেন।". . .

— (History of Bengal Vol. II, Muslim period p. 9)

বাংলার শাসনকর্তাগণ		দিল্লীর সমসাময়িক সম্রাট
১২০৩-৬ খৃঃ	মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী	কুত্‌ব উদ্দীন আইবেক
১২০৬-৮ খৃঃ	মালিক ইজ্জদ্দীন মুহাম্মদ শিরীন খিলজী	ঐ
১২০৮-১০ খৃঃ	হসাম উদ্দীন ইওয়াজ	ঐ
১২১০-১৩ খৃঃ	আলী মর্দান (সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী)	ঐ
১২১৩-২৭ খৃঃ	সুলতান গিয়াস উদ্দীন-ইওয়াজ খিলজী	আরাম শাহ (কুত্‌বউদ্দীন আইবেকের পুত্র)।

বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ

সমগ্র বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান ছিলেন শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ্। অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে দিল্লী সম্রাট ফিরোজশাহ তোগলোক যুদ্ধযাত্রা করে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকান্দার শাহ বাংলার স্বাধীন সুলতান হিসাবে সিংহাসনে আরোহণ করে দিল্লীর সম্রাটের প্রীতি অর্জনের উদ্দেশ্যে পঞ্চাশটি হাতী উপঢৌকন স্বরূপ দিল্লী প্রেরণ করেন। এ সময়

থেকে ১৪০৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যাঁরা বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁরা হলেন—

সিকান্দার শাহ (১ম)	১৩৫৮–৯১ খৃঃ
গিয়াস উদ্দীন আজম শাহ	১৩৯১–৯৬ খৃঃ
সাইফুদ্দীন হামজা শাহ	১৩৯৬–১৪০৬ খৃঃ
শামসুদ্দীন	১৪০৬–১৪০৯ খৃঃ

রাজা গণেশ

পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভে বাংলায় হিন্দুজাতির পুনরুত্থান আন্দোলন শুরু হয়। মুহাম্মদ বখতিয়ারের বাংলা বিজয়ের পর হতে চতুর্দশ শতকের শেষ অবধি মুসলমান শাসকগণ কখনো দিল্লী সুলতানের নিযুক্ত গভর্ণর হিসাবে, কখনো স্বাধীন সুলতান হিসাবে এবং কখনো উপঢৌকনাদির মাধ্যমে দিল্লী দরবারকে প্রীত ও সন্তুষ্ট রেখে বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এ দুই শতকের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়—মুসলমানগণ নিশ্চিন্ত মনে শান্তিতে রাজত্ব করতে পারেননি। তাঁদের মধ্যে আত্মকলহ ও বলপূর্বক ক্ষমতা দখলের প্রবল আকাংখাই ছিল সে শান্তি বিনষ্টের কারণ। কিন্তু তাই বলে মুসলমান শাসকগণ কর্তৃক হিন্দুজাতি দলন ও প্রজাপীড়ন হয়নি কখনো। ফলে জাতি–ধর্ম নির্বিশেষে প্রজাগণ সুখ–শান্তি ও জানমালের পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করেছিল। বখতিয়ার খিলজীর পূর্বে এদেশে বহু স্বাধীন হিন্দু রাজা বাস করতেন। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তা তাঁরা মনে প্রাণে মেনে না নিলেও মুসলমানদের সাথে সংঘর্ষে আসা সমীচীন মনে করেননি। তার দুটি মাত্র কারণ হতে পারে। প্রথম কারণ এই যে, বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল মুসলমানদের হাতে এবং বখতিয়ারের পর থেকে ক্রমাগত বহির্দেশ থেকে অসংখ্য মুসলমান বাংলায় আসতে থাকে। মুসলিম ধর্ম প্রচারক অলী ও দরবেশগণ এদেশে আগমন করতঃ ইসলামের সুমহান বাণী, ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রচার করতে থাকেন। ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদের দ্বারা নিষ্পেষিত হিন্দু জনসাধারণ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। তথাপি এখানকার বর্ণহিন্দুরা মুসলমান শাসকদের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও আত্মকলহের সুযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারতো। কিন্তু তা করেনি। তার কারণও আছে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, তারা এক দীর্ঘ পরিকল্পনার ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছিল। তা হলো মুসলিম শাসকদের বিরাগভাজন না হয়ে বরঞ্চ শাসন কার্যের বিভিন্ন স্তরে এরা নিজেদের স্থান করে নিয়ে কোন এক মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তারা তাদের এ পরিকল্পনায় পূর্ণ সাফল্য লাভ করেছিল। তবে সে সময়ে নিজেরা ক্ষমতালাভ না করে মুসলিম শাসন বিলুপ্ত করে ইংরেজদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে পরিতৃপ্তি লাভ করেছিল। পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভে তাদের সাফল্য স্থায়ী না হলেও এ ছিল তাদের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার প্রথম প্রকাশ।

এ সময়ে বাংলার একজন হিন্দু জমিদার প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে উঠেন। ফার্সি ভাষায় লিখিত ইতিহাসে তার নাম 'কান্‌স্' বলা হয়েছে। কান্‌স্ প্রকৃতপক্ষে 'কংস' অথবা 'গণেশ' ছিল। তিনি গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালে রাজস্ব ও শাসন বিভাগের অধিকর্তা হয়েছিলেন। 'রিয়াযুস্ সালাতীনে'র বর্ণনা অনুসারে গণেশ শামসুদ্দীন ইলিয়াসের পৌত্র গিয়াসউদ্দীন আজম শাহকে হত্যা করেন। অতঃপর গিয়াসউদ্দিনের পৌত্র শামসুদ্দীনকেও তিনি হত্যা করে গৌড় ও বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ইলিয়াস শাহী বংশ

শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৩৯–৫৮ খৃঃ)
|
সিকান্দার শাহ (১৩৫৮–৮৯ খৃঃ)
|
গিয়াস উদ্দীন আজম শাহ (১৩৮৯–৯৬ খৃঃ)
|
সাইফউদ্দীন হামজা শাহ (১৩৯৬–১৪০৬ খৃঃ)

শামসুদ্দীন (১৪০৬–১৪০৯ খৃঃ) শাহাবুদ্দীন বায়েজিদ শাহ (১৪০৯–১৪ খৃঃ)

ব্লকম্যান (Blockman) বলেন যে, গণেশ নিজে সিংহাসনে আরোহণ করেননি। তবে তিনি শামসুদ্দীনকে হত্যা করে তাঁর ভ্রাতা শাহাবুদ্দীন বায়েজিদ শাহকে ক্রীড়াপুত্তলিকা স্বরূপ রেখে স্বয়ং রাজদন্ড পরিচালনা করতেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাংলার ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ডে ১৪০৯–১৪১৪

খৃঃ পর্যন্ত বাংলার সিংহাসনে দু'জন শাসনকর্তার নাম উল্লেখ করেছেন। যথা, শাহাবুদ্দীন বায়েজিদ শাহ ও গণেশ।

রাজা গণেশ বাঙালী বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। উত্তর বংগের (দিনাজপুর) ভাটুরিয়া পরগণার শক্তিশালী রাজা গণেশ তাঁর নিজস্ব একটি সেনাবাহিনী রাখতেন। দুর্ধর্ষ মংগল গোত্র থেকে তিনি তাঁর সৈন্য সংগ্রহ করতেন। তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে তাঁকে বাংলার সুলতানের অধীনে চাকুরীতে নিযুক্ত করা হয় এবং ক্রমশঃ তিনি রাজ্যের খাজাঞ্চিখানার একচ্ছত্র মালিক মোখতার (সাহেব-ই-ইখতিয়ার-ই-মুল্‌ক ও মাল) হয়ে পড়েন। এ পদমর্যাদার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এক গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তিনি প্রথমে গিয়াস উদ্দীন আজম শাহকে হত্যা করেন এবং কয়েক বৎসর পর শামসুদ্দীন শাহকে হত্যা করে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

গণেশের বাংলার সিংহাসনে আরোহণ দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা ও গভীর ষড়যন্ত্রের ফল। গণেশ ও তাঁর সমমনা হিন্দু সামন্তবর্গ বাংলায় মুসলমানদের শাসন মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেননি। যদিও বিগত দুই শতকের ইতিহাসে মুসলিম শাসকগণ কর্তৃক অমুসলমানদের প্রতি কোনপ্রকার উৎপীড়নের নজির পাওয়া যায়না, তথাপি মুসলিম শাসনকে তারা হিন্দুজাতির জন্যে চরম অবমাননাকর মনে করতেন। তাই গণেশ সিংহাসনে আরোহণ করার পর মুসলিম দলনে আত্মনিয়োগ করেন। এভাবে মুসলমানদের প্রতি তাঁর বহুদিনের পুঞ্জিভূত আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

বুকানন হ্যামিল্টন কর্তৃক লিখিত দিনাজপুর বিবরণীতে আছে যে, জনৈক শায়খ বদরে ইসলাম এবং তদীয় পুত্র ফয়জে ইসলাম গণেশকে অবনত মস্তকে সালাম না করার কারণে তিনি উভয়কে হত্যা করেন। শুধু তাই নয়, বহু মুসলমান অলী দরবেশ, মনীষী, পন্ডিত ও শাস্ত্রবিদকে গণেশ নির্মমভাবে হত্যা করেন। একদা শায়খ মুঈনুদ্দীন আব্বাসের পিতা শায়খ বদরুল ইসলাম বিধর্মী রাজা গণেশকে সালাম না করার কারণে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। অতঃপর একদিন তিনি উক্ত শায়খকে দরবারে তলব করেন। তাঁর কামরায় প্রবেশের দরজা এমন সংকীর্ণ ও খর্ব করে তৈরী করা হয় যে, প্রবেশকারীকে উপুড় হয়ে প্রবেশ করতে হয়। শায়খ রাজার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে প্রথমে তাঁর দু'খানি পা কামরার ভিতরে রাখেন এবং মস্তক অবনত না করেই প্রবেশ করেন। কারণ, ইসলামের

নির্দেশ অনুযায়ী কোন মুসলমানই আল্লাহ ব্যতীত আর কারো সামনে মস্তক অবনত করতে পারেন না। রাজা গণেশ তাঁকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করেন এবং অন্যান্য আলেমগণকে একটি নৌকায় করে নদী-গর্ভে নিমজ্জিত করে মারেন।

মুসলিম নিধনের এ লোমহর্ষক কাহিনী শ্রবণ করে শায়খ নূরে কুতুবে আলম মর্মাহত হন এবং জৌনপুরের গভর্ণর সুলতান ইব্রাহিম শার্কীকে বাংলায় আগমন করতঃ ইসলাম ধর্ম রক্ষার জন্যে আবেদন জানান। সুলতান ইব্রাহিম বিরাট বাহিনীসহ বাংলা অভিমুখে যাত্রা করে সরাই ফিরোজপুরে শিবির স্থাপন করেন। রাজা গণেশ জানতে পেরে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কুতুবে আলমের শরণাপন্ন হন। কুতুবে আলম বলেন, তিনি এ শর্তে সুলতান ইব্রাহিমকে প্রত্যাবর্তনের পরামর্শ দিতে পারেন, যদি গণেশ ইসলাম গ্রহণ করেন। গণেশ স্বীকৃত হলেও তার স্ত্রী তাঁকে বাধা দান করেন। অবশেষে তাঁর পুত্র যদুকে ইসলামে দীক্ষিত করে গণেশের স্থলে তাকে সিংহাসন ছেড়ে দেয়ার জন্যে বলা হয়। গণেশ এ কথায় স্বীকৃত হন। যদুর মুসলমানী নাম জালালউদ্দীন রেখে তাঁকে বাংলার সুলতান বলে ঘোষণা করা হয়।

সুলতান ইব্রাহিম অত্যন্ত ক্ষুণ্ন মনে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাওয়া মাত্র গণেশ জালালউদ্দীনের নিকট থেকে সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। সরলচেতা কুতুবে আলম গণেশের ধূর্তুমি বুঝতে পারেননি। তাই পুত্রকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে চাইলে পিতার নরহত্যার অপরাধ ক্ষমা করেন।

গণেশ সিংহাসন পুনরুদ্ধার করার পর সুবর্ণধেনু অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধর্মচ্যুত যদুর শুদ্ধিকরণ ক্রিয়া সম্পাদন করেন। অর্থাৎ একটি নির্মিত সুবর্ণধেনুর মুখের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে তার মল ত্যাগের দ্বার দিয়ে হিন্দু শাস্ত্রের বিশেষ ধর্মীয় পদ্ধতিতে বহির্গত হওয়াই হলো শুদ্ধিকরণ পদ্ধতি।

এ শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠানের পর গণেশ দেশ থেকে মুসলমানদের মূলোৎপাটনের কাজ শুরু করেন। তিনি পূর্বের চেয়ে অধিকতর হিংস্রতার সাথে মুসলিম নিধনকার্য চালাতে থাকেন। তিনি কুতুবে আলমের পুত্র শায়খ আনওয়ার ও পৌত্র শায়খ জাহিদকে বন্দী অবস্থায় সোনারগাঁও পাঠিয়ে দেন। অতঃপর তাঁদের পিতা-পিতামহের ধনসম্পদের সন্ধান দেয়ার জন্যে তাঁদেরকে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার করা হয়। পরে শায়খ আনওয়ারকে হত্যা করা হয়। এমনিভাবে গণেশ সাত বৎসর যাবত বাংলায় এক বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম

করেন এবং মুসলমানদের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলেন।

গণেশের মৃত্যুর পর পুনরায় জালালউদ্দীন (যদু) সিংহাসনে আরোহণ করেন।

হিন্দুজাতির পুনরুত্থান

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাংলার ইতিহাস ২য় খন্ডে লিখেছেন, "গণেশ নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুবর্ণধেনু ব্রত দ্বারা যদুর প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা তাহার কিঞ্চিৎ প্রমাণাভাস মাত্র। রাজা গণেশের সময় হইতে গৌড়ে ও বংগে সংস্কৃত চর্চা আরম্ভ হইয়াছিল। সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনাও আরম্ভ হইয়াছিল এবং বাংলা ভাষার উন্নতির সূচনা হইয়াছিল। এই সকল কারণের জন্য গণেশ বাংলার ইতিহাসে, ভারতের ইতিহাসে ও ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে উচ্চাসন লাভ করিয়াছিলেন।" (উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৩৫–৩৬)

গণেশের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুসলমান হয়েছিলেন। তাঁর মুসলমান হওয়ার প্রকৃত কারণ কি ছিল তা অবশ্য বলা কঠিন। তবে একজন প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রাহ্মণ হিন্দুরাজার পুত্র মুসলমান হয়েছিলেন—মুসলিম বিদ্বেষী ঐতিহাসিক একে হিন্দুজাতির পক্ষে চরম অবমাননাকর মনে করে অনেক কল্পিত কাহিনী রচনা করেছেন।

রাখালদাস তাঁর উক্ত ইতিহাসে বলেন, "বরেন্দ্রভূমিতে প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে যদু ইলিয়াস শাহের বংশজাতা কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমান রমণীর রূপে মোহিত হইয়া স্বধর্ম বিসর্জন দিয়াছিলেন।"

রাখালদাস স্বজাতির গ্লানি অপর ধর্মাবলম্বীর উপর চাপিয়ে বলেন–

"ঐতিহাসিক স্টুয়ার্ট (Stewart) অনুমান করেন যে, যদু বা জালালউদ্দীন গণেশের মুসলমান উপপত্নীর গর্ভজাত পুত্র।"

কিভাবে মুসলিম জাতির ইতিহাস কলংকিত করা হয়েছে, উপরের বর্ণনা তাঁর এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

এ এক অনস্বীকার্য সত্য যে, তৎকালে মুসলমানদের নৈতিক অধঃপতন এতখানি হয়নি যে, মুসলমান রমণীগণ তখন বেশ্যাবৃত্তি শুরু করেছে অথবা কোন অমুসলমানের স্বামীত্ব গ্রহণ করেছে। অথবা বর্তমান কালের মতো মুসলমান রমণীগণ বেপর্দায় পর–পুরুষের সামনে চলাফেরা করতো যার ফলে গণেশপুত্র যদু কোন সুন্দরী মুসলমান যুবতীর প্রেমাসক্ত হয়ে তাঁর পাণি গ্রহণের

জন্যে মুসলমান হয়েছে। ইতিহাস একথার সাক্ষ্যদান করে যে, সে সময়ে দলে দলে মুসলমান ফকীর দরবেশ এদেশে ইসলামের মহান বাণী প্রচার করতেন এবং তাঁদের অনেকে শাসনকার্যেও অংশগ্রহণ করেছেন। শাসকগণের উপর ছিল তাঁদের বিরাট প্রভাব।

গণেশের আমলের কথাই ধরা যাক। বিখ্যাত অলী নূরে কুতুবে আলম, তাঁর পুত্র শায়খ আনওয়ার গণেশের সমসাময়িক লোক। তাঁদের প্রভাব শুধু বাংলার মুসলমান ও শাসকদের উপরেই ছিলনা, বরঞ্চ অযোধ্যার গভর্ণর সুলতান ইব্রাহিম শার্কীর উপরেও ছিল। যার উল্লেখ উপরে করা হয়েছে। তাঁদের আচার আচরণ, নির্মল চরিত্র ও তাঁদের মুখনিঃসৃত ইসলামের অমিয় বাণী শ্রবণ করে বহু হিন্দু স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্টচিত্তে ইসলাম গ্রহণ করে—যাদের মধ্যে গণেশপুত্র যদু একজন। সমাজে তাঁদের এতখানি প্রভাব বিদ্যমান থাকা সত্বেও মুসলমান নারী বেশ্যাবৃত্তি করবে অর্থাৎ কোন পুরুষের উপপত্নী হবে, অথবা বল্গাহীনভাবে চলাফেরার কারণে কোন হিন্দু প্রেমাসক্ত হবে, এ একেবারে কল্পনার অতীত। অতএব গণেশের মুসলিম উপপত্নী রাখা এবং যদুর মুসলিম রমণীর প্রেমাসক্ত হওয়া একেবারে স্বকপোলকল্পিত এবং দুরভিসন্ধিমূলক। নিজের গ্লানি অপরের ঘাড়ে চাপাবার হাস্যকর প্রয়াস মাত্র।

আর একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তা হলো এই যে, মুসলমান এদেশে এসেছিল বিজয়ীর বেশে। স্বভাবতঃই বহিরাগত বিজয়ী মুসলমানদের মধ্যে ছিল শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি (Superiority Complex)। সম্ভ্রান্ত মুসলমান বলতে বহিরাগত মুসলমানকেই বুঝাত। তাঁদের কোন রমণী হিন্দুর স্বামীত্ব গ্রহণ করবে—এ চিন্তার অতীত।

তারপর কথা থাকে এই যে, নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুজাতির ইসলাম গ্রহণের পর তাদের কোন রমণী গণেশকে স্বামীত্বে বরণ করেছে, এটাও ছিল অবাস্তব। কারণ গণেশ ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদের ধারক–বাহক। যে হিন্দু ইসলাম গ্রহণের পর যবন ও ম্লেচ্ছ হয়েছে তাঁদের ঘরে বিবাহ করা গণেশের পক্ষে ছিল এক অচিন্তনীয় ব্যাপার। অতএব এসব কাহিনী–যে অলীক কল্পনাপ্রসূত মাত্র, তাতে সন্দেহ নেই।

কেউ কেউ বলেন, যদু রাজ্যলোভে মুসলমান হয়েছিলেন। আমাদের মতে একথাও সত্য নয়। অবশ্য সুলতান ইব্রাহিম শার্কীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার

জন্যে গণেশ তদীয় পুত্রকে নূরে কুতুবে আলমের হস্তে ইসলাম গ্রহণের জন্যে সমর্পণ করেন। যদুর ইসলাম গ্রহণ এবং তাঁকে সুলতান হিসাবে ঘোষণা করার পর সুলতান ইব্রাহিম শার্কী বাংলা আক্রমণ না করে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই গণেশ পুনরায় যদুকে অপসারিত করে নিজে সিংহাসনে পুনঃ আরোহণ করেন। তারপর হিন্দুমতে যদুর প্রায়শ্চিত্ত করা হয়। গণেশ প্রবল পরাক্রমসহ সাত বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁকে কোনক্রমেই সিংহাসনচ্যুত করা যায়নি। যদু যদি শুধুমাত্র রাজ্যলোভেই ইসলাম গ্রহণ করে থাকতেন, তাহলে তাঁর প্রায়শ্চিত্ত ও সুবর্ণধেনুর শুদ্ধিকরণের পর নির্বিঘ্নে হিন্দু হিসাবে পিতার সিংহাসনে আরোহণ করতে পারতেন। কিন্তু যদু ইসলাম ত্যাগ করেননি।

অতঃপর মানুষের মধ্যে থাকে একটি বিবেক যার দ্বারা সত্য ও মিথ্যাকে উপলব্ধি করতে পারা যায়। তার সাথে মানুষের মধ্যে থাকে একটা নৈতিক অনুভূতি। গণেশের যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা দেখে বাংলার সুলতান তাঁকে রাজ্যের সর্বোচ্চ পদে নিযুক্ত করেন।

কিন্তু ষড়যন্ত্র ও হত্যাকান্ডের মাধ্যমে তিনি বাংলার সিংহাসন দখল করেন। প্রথমতঃ তিনি প্রভুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা প্রদর্শন করেন এবং অতঃপর নিরীহ মুসলমানদের হত্যাযজ্ঞ শুরু করেন। কিন্তু তথাপি তাঁর পুত্র ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁর সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেন নূরে কুতুবে আলম। শায়খ নূরে কুতুবে আলমের আচরণ, ইসলামের সহনশীলতা ও উদারতার প্রতি অবশ্য যদু মুগ্ধ হয়ে থাকবেন। পিতার বিশ্বাসঘাতকতা, কৃতঘ্নতা ও নিষ্ঠুরতা অবশ্য অবশ্যই যদুসেনের মনের গভীরে দাগ কেটে থাকবে। উপরন্তু, কামেল অলীর সংস্পর্শে যদুর অন্তর সত্য সত্যই ইসলামের নূরে উদ্ভাসিত হয়েছিল। এটাই আমাদের ধারণা। তা মোটেই অযৌক্তিকও নয় এবং অসম্ভবও নয়।

এখন মুসলিম বিদ্বেষী ঐতিহাসিকগণের মতে, যদু যখন ইসলামে অবিচলিত ছিলেন, তখন তাঁকে নানাভাবে কলংকিত করতেই হবে। প্রথমতঃ তাঁকে একজন মুসলমান উপপত্নীর সন্তান বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁদের বক্তব্য এই যে, আসলে তিনি হিন্দুই ছিলেন না ছিলেন জারজ (?) সন্তান।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ইতিহাসে এ সময়ের একটি চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর ইতিহাসের (বাংলার ইতিহাস ২য় খন্ড) ১৩৭ পৃষ্ঠায় বলেন—

"গণেশ অথবা যদু যাহা করিতে পারেন নাই, অথবা করিতে ভরসা করেন নাই আর একজন বাঙালী হিন্দুরাজা কর্তৃক তাহা স্বচ্ছন্দে সম্পাদিত হইয়াছিল। তাহার নাম দনুজমর্দন দেব।"

অতঃপর তিনি উক্ত গ্রন্থের ১৩৯ পৃষ্ঠায় উক্ত কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন—

"গণেশ অথবা যদু যাহা করিতে পারেন নাই, আর্যাবর্তে কোনও হিন্দু রাজা যাহা করিতে পারেন নাই, তাহাই সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া দনুজমর্দন দেব ও মহেন্দ্র দেবের নাম ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকিবে।"

মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, গণেশ-যদু কি করতে পারেননি, আর দনুজমর্দন দেব কি করেছেন তার কোন উল্লেখ ই তাঁর গ্রন্থে নেই।

এ সম্পর্কে স্যার যদুনাথ সরকার বলেন—

"In this very year we find coins with Bengali lettering issued from Pandua and Chatgaon by a King named Mahendra Dev—exactly resembling those of Danujmardan Dev. He was most probably the younger son of Ganesh, who has remained a Hindu and to whom his elder brother Jadusen Jalaluddin had offered to leave the paternal throne in case he was not permitted to embrace Islam. Mahendra was evidently set up on the throne by Hindu ministers just after the death of Ganesh . . .I believe that Mahendra (then not more than 12 years old) was a mere puppet in the hands of a selfish ministerial faction . . .The attempt of the Kingmakerswas shortlived and ended in their speedy defeat, as no coin was struck in Mahendra's name after that one year 1418 A.D.

"ঠিক এ বৎসরেই পান্ডুয়া ও চাটগাঁও থেকে বাংলা অক্ষরে মহেন্দ্র দেবের নামাংকিত মুদ্রা আমরা দেখতে পাই। এগুলো দেখতে অবিকল দনুজমর্দন দেবের মুদ্রার ন্যায়। খুব সম্ভব তিনি ছিলেন গণেশের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি হিন্দুই রয়ে গিয়েছিলেন এবং যদুসেন জালালউদ্দীন তাঁকে বলেছিলেন যে, যদি তাঁকে মুসলমান হতে দেয়া না হয় তাহলে যেন পিতার সিংহাসন ছেড়ে দেন। গণেশের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু মন্ত্রীবর্গ মহেন্দ্রকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। আমার

বিশ্বাস মহেন্দ্র (যার বয়স বার বছরের বেশী ছিলনা) একটা স্বার্থান্ধ মন্ত্রীচক্রের কাষ্ঠপুত্তলিকা ছিলেন মাত্র। এ সকল মন্ত্রীবর্গের রাজা বানাবার প্রচেষ্টা বেশীদিন চলতে পারেনি এবং অচিরেই তাঁদের পরাজয় ঘটেছে। কারণ এই একটি বছর ১৪১৮ খৃষ্টাব্দের পর মহেন্দ্রের নামে আর কোন মুদ্রা অংকিত হয়নি।"

যদুনাথ সরকার আরও বলেন–

"Ganesh placed his son, a lad of twelve only, under protective watch in his harem and ruled in his own account under the proud title of Danujmardan Dev.

"গণেশ তাঁর বার বৎসর বয়স্ক পুত্রকে হারেমের মধ্যে প্রতিরক্ষামূলক পাহারায় রেখে স্বয়ং গৌরবজনক 'দনুজমর্দন দেব' উপাধি ধারণ করে ইচ্ছামতো শাসন চালান।"

এর থেকে বুঝা গেল গণেশই আসলে ছিলেন দনুজমর্দন দেব। অথবা দনুজমর্দন ছিল তাঁর উপাধি যা তিনি তাঁর জন্যে এবং গোটা হিন্দুজাতির জন্যে গৌরবজনক মনে করতেন।

রাখালদাস এখানেই ভুল করেছেন। তিনি দনুজমর্দনকে ভিন্ন ব্যক্তি মনে করে তাঁর অসীম গুণগান গেয়েছেন।

এখন আসুন, আমরা দেখি দনুজমর্দন শব্দের অর্থ কি। দনুজমর্দন শব্দের অর্থ 'দৈত্যদলন'। উগ্র হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠাকামী গণেশ মুসলমান ও মুসলিম শাসন কিছুতেই বরদাশত করতে পারেননি। তাঁর একান্ত বাসনা ছিল মুসলমানদেরকে বাংলাদেশ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে উগ্র হিন্দুরাজ কায়েম করা। বহিরাগত মুসলমানদেরকে গণেশের ন্যায় হিন্দুগণ 'যবন-ম্লেচ্ছ' মনে করতেন। কিন্তু মুসলমানগণ হিন্দুদের তুলনায় শারীরিক গঠন ও শৌর্যবীর্যে বলিষ্ঠতর ছিলেন। তাই তাঁদেরকে যবন ও ম্লেচ্ছ দৈত্যের মতো মনে করা হতো। এই দৈত্য স্বরূপ যবন ও ম্লেচ্ছদের দলন ও নিধনই ছিল গণেশের ব্রত। ইব্রাহিম শার্কীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর গণেশ পূর্ব থেকে শতগুণে এ দলন ও নিধন কার্য চালিয়েছেন। দনুজমর্দনের মুসলিম নিধন কার্যকলাপের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে রাখালদাস বলেছেন, "আর্যাবর্তে কোনও হিন্দু রাজা যাহা করিতে পারেন নাই তাহাই সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া দনুজমর্দন দেব ও মহেন্দ্র দেবের নাম ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকিবে।"

গণেশের মৃত্যুর পর পরই তাঁর নিযুক্ত হিন্দু মন্ত্রীবর্গ তাঁর বার বৎসর বয়স্ক পুত্র মহেন্দ্রকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে গণেশেরই পদাংক অনুসরণে মুসলিম-দলন কার্য অব্যাহত রাখেন। তাই দনুজমর্দন গণেশ ও তদীয় পুত্র মহেন্দ্রের ক্রিয়াকলাপে আনন্দে গদগদ হয়ে রাখালবাবু তাঁদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। কিন্তু মহেন্দ্রের শাসন ছিল অল্প দিনের জন্যে।

গণেশের বংশ

গণেশ দনুজমর্দন

- যদুসেন ওরফে জালালউদ্দীন মুহাম্মদ শাহ (১৪১৪–৩১ খৃঃ)
  - শামসুদ্দীন আহমদ শাহ (১৪৩১–৪২ খৃঃ)
- মহেন্দ্র

ইলিয়াস শাহী বংশের পুনরুত্থান

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গণেশ ইলিয়াস শাহী বংশের দু'জন সুলতানকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন। গণেশ পৌত্র শামসুদ্দীন আহমদ শাহকে হত্যা করে পুনরায় ইলিয়াস শাহী বংশ বাংলার মসনদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহ (১৪৪২–৫৯ খৃঃ)
রুকন উদ্দীন বারবাক শাহ (১৪৫৯–৭৪ খৃঃ)
শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪–৮২ খৃঃ)
দ্বিতীয় সিকান্দর শাহ (১৪৮২ খৃঃ)
জালালউদ্দীন ফতেহ শাহ (১৪৮২–৮৬ খৃঃ)

বাংলার মসনদে হাবশী সুলতান

কিছুকাল যাবত আবিসিনিয়াবাসীগণ বাংলায় আগমন করতে থাকে। বারবাক শাহ ও ইউসুফ শাহ তাঁদেরকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। এদের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে ফতেহ শাহ তাঁদেরকে দমন করার চেষ্টা করলে তিনি নিহত হন এবং জনৈক হাবশী সুলতান শাহজাদা বাররাক নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সুলতান শাহজাদা বাররাক (১৪৮৬–৮৭ খৃঃ)
সাইফুদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৪৮৭–৯০ খৃঃ)
নাসীরুদ্দীন মাহমুদ শাহ (১৪৯০–৯১ খৃঃ)
শামসুদ্দীন মুজাফফর শাহ (১৪৯১–৯৩ খৃঃ)
আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩–১৫১৯ খৃঃ)

উপরে বর্ণিত চতুর্থ হাবশী সুলতান শামসুদ্দীন মুজাফফর শাহ, হোসেন নামে এক অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তিকে তাঁর সরকারের অধীনে চাকুরীতে নিযুক্ত করেন। ক্রমশঃ তাঁর পদোন্নতি হতে থাকে এবং অবশেষে মুজাফফর শাহের প্রধানমন্ত্রীর পদে তিনি বরিত হন। পরবর্তীকালে নানান ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী হোসেন আপন প্রভুকে নিহত করে বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি বাংলার ইতিহাসে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ শরীফ মক্কী নামে পরিচিত। পরে তিনি 'খলিফাতুল্লাহ' উপাধিও ধারণ করেন।

হোসেন শাহ

ইতিহাসের এক অতি বিস্ময় এ হোসেন শাহ। তাঁর পঞ্চমুখ প্রশংসায় বিরাট বিরাট গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান কালে ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু ছাত্রের মনে তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন জাগে। সেসব জবাব ইতিহাস থেকে খুঁজে বের করতে হবে।

মওলানা আকরাম খাঁ তাঁর 'মুসলেম বংগের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে হোসেন শাহের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন–

"সুলতান হোসেন শাহ নামে পরিচিত এই ভদ্রলোকটির জাতি, ধর্ম, পূর্বাসন এবং তাঁহার উপাধি সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ বহু অনুসন্ধান সত্ত্বেও আমরা এ পর্যন্ত খুঁজিয়া পাই নাই।"

প্রকৃতপক্ষে তাঁর সম্পর্কে কিছু ইতিহাস, কিছু কিংবদন্তী এবং কিছু অলীক কাহিনীর জগাখিঁচুড়ি তৈরী হয়ে আছে।

স্যার যদুনাথ সরকার তাঁর 'দি হিষ্ট্রী অব বেঙল'–এ বলেন—

"প্রায় সব ঐতিহাসিক বিবরণে তাঁকে একজন আরব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি তাঁর পিতাসহ বাংলায় এসে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর প্রথম জীবনের ঘটনাবলী বহু লোককাহিনী ও উপাখ্যানের বিষয়বস্তু হয়ে পড়েছে। তার

অধিকাংশের ঘটনাকেন্দ্র হচ্ছে মুর্শিদাবাদ জেলার জংগীপুর মহকুমার একটি গ্রাম যাকে বলা হয়—'একআনি চাঁদপাড়া'। বেশ কিছু প্রাচীন ভগ্নাবশেষ আছে এ গ্রামে। জনশ্রুতি ও শিলালিপি অনুযায়ী এগুলোকে হোসেন শাহের আমলের বলা হয়ে থাকে।" (উক্ত গ্রন্থ, ২য় খন্ড ১৪২–৪৩)

তাঁর সম্পর্কে আরও প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, সাইয়েদ আশরাফ তাঁর দুই পুত্রসহ গৌড় যাবার কালে চাঁদপাড়া নামে একটি রাঢ় গ্রামে স্থানীয় মুসলমান কাজীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। কাজী অতিথির বংশ পরিচয় জানতে পেরে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র হোসেনের সাথে আপন কন্যার বিয়ে দেন। অতঃপর বিদ্যাশিক্ষা করার পর হোসেন গৌড়ে হাবশী সুলতান মুজাফফর শাহের অধীনে একটি সামান্য চাকুরী গ্রহণ করেন। এ ধরনের কাহিনী সলিম লিপিবদ্ধ করেন একটি বেনামী পুস্তিকার বরাত দিয়ে।

এ ধরনের গল্পও তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত আছে যে, বাল্যকালে হোসেন একজন স্থানীয় ব্রাহ্মণের অধীনে রাখালের চাকুরী করতেন। এ বালক ভবিষ্যতে এক বিরাট ব্যক্তি হবে এরূপ অলৌকিক লক্ষণ তাঁর মধ্যে দেখতে পেয়ে উক্ত ব্রাহ্মণ তাঁকে গৌড়ে নিয়ে যান।

পরবর্তীকালে হোসেন বাংলার সুলতান হলে সেই ব্রাহ্মণকে মাত্র এক আনা খাজনার বিনিময়ে চাঁদপাড়া গ্রাম দান করেন। এ গল্পটি হুবহু হাসান গাংগু রাহমনীর বাল্যজীবনের কাহিনীর অনুরূপ। তবে বিনা বিচারে একে সত্য বলে গ্রহণ করা যেতে পারে না। সামান্য ব্যক্তি থেকে কেউ একটি রাজ্যের মালিক মোখতার হয়ে বসলে তার সম্পর্কে নানান ধরনের আজগুবি কাহিনী তৈরী করা হয়ে থাকে। হোসেন শাহ সম্পর্কেও তা–ই হয়েছিল বলে আমাদের ধারণা।

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, হোসেনের পিতা সাইয়েদ আশরাফ মক্কার শরীফ ছিলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল তিরমিজে বাস করেন। বুকানন হ্যামিল্টন বলেন, হোসেন রংপুর জেলার অধিবাসী ছিলেন বলেও জনশ্রুতি আছে। গোবিন্দগঞ্জ থেকে ষোল মাইল দূরে অবস্থিত দেবনগর গ্রামে তাঁর জন্ম। কোন কোন ঐতিহাসিক আবার তাঁকে গৌড়ের সুলতান ইব্রাহীম শাহের প্রপৌত্র বলেও উল্লেখ করেছেন। অতএব দেখা যাচ্ছে তাঁর বংশপরিচয় ও জন্মস্থান নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যেও যথেষ্ট মতানৈক্য রয়েছে।

ঐতিহাসিকগণের কেউ কেউ বলেন, তিনি শুধু আরবই ছিলেন না, ছিলেন

সাইয়েদ বংশীয়। তারপর কিছুটা কল্পনার রং দিয়ে হোসেনের বংশমর্যাদা রঞ্জিত করার চেষ্টা করে বলা হয়েছে যে, তাঁর পিতা সাইয়েদ আশরাফ ছিলেন মক্কার শরীফ। ভাগ্য অন্বেষণের জন্যে তিনি তাঁর দুই পুত্রসহ বাংলায় আগমন করেন।

এখন অতি ন্যায়সংগতভাবেই প্রশ্ন জাগে যে, হোসেনের পিতা মক্কার শরীফ হওয়াতো দূরের কথা, মোটেই আরববাসী ছিলেন কিনা। হোসেনের সাইয়েদ হওয়া কেন, মুলসমান হওয়াটাও সন্দেহমুক্ত নয় বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁর আচরণ ও কার্যকলাপই তার সাক্ষ্য দান করে।

প্রথমতঃ তাঁর বংশ পরিচয়ের কথাই ধরা যাক। তাঁর পিতা সাইয়েদ আশরাফ মক্কার অধিবাসী ও শরীফ ছিলেন—এর কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ ইতিহাস থেকে পাওয়া যায় না। উপরন্তু মক্কার শরীফ তাঁর দুই পুত্রসহ ভাগ্য অন্বেষণের জন্যে বাংলায় আগমন করেন, এ এক অলীক কল্পনা মাত্র। তিনি কি কোন কারণে শরীফের পদমর্যাদা থেকে অপসারিত হয়ে স্থাবর অস্থাবর সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন যার জন্যে তাঁকে বাংলায় আসতে হয়েছিল অন্ন বস্ত্রের অনুসন্ধানে? কেউ কেউ আবার তাঁকে তিরমিজের অধিবাসীও বলেছেন। তাহলে কোন্‌টাকে সত্য বলে গ্রহণ করা যাবে?

উল্লেখ্য যে, মক্কার শরীফ ছিলেন সেকালে হেজাজের সর্বময় কর্তা, একচ্ছত্র বাদশাহ, বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক, অতুলনীয় রাজপ্রাসাদের ভোগদখলকারী। ইতিহাসে এমন কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় না যে, মক্কার কোন শরীফ কোন কালে তাঁর মসনদ ত্যাগ করে ভাগ্যোন্নয়নের জন্যে স্ত্রীপুত্রসহ বাংলায় এসে অপরের আশ্রয়প্রার্থী হয়েছেন। সম্ভবতঃ সুচতুর ও প্রতারক হোসেন নিজকে সাইয়েদ বংশীয় ও শরীফপুত্র বলে পরিচয় দিয়ে মুসলমানদের ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন।

তারপর মজার ব্যাপার এই যে, সিংহাসন লাভের পর হোসেন চাঁদপাড়া গ্রামের কাজী সাহেবকে (তাঁর শ্বশুর), মতান্তরে তাঁর বাল্যজীবনের প্রভু জনৈক ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে মাত্র একআনা রাজস্বের বিনিময়ে গোটা গ্রাম দান করলেন, পরে সে গ্রাম বা মৌজা 'একআনি চাঁদপাড়া' নামে অভিহিত হয়। কিন্তু হতভাগ্য পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অন্ন সংস্থানের কোন ব্যবস্থা হোসেন করেছেন কিনা, তাঁর বিবরণ ইতিহাসে কোথাও নেই।

তারপর আবার লক্ষ্য করুন, হোসেনের কথিত পিতা সাইয়েদ আশরাফ মুর্শিদাবাদের জংগীপুর মহকুমার চাঁদপুর গ্রামের জনৈক কাজীর বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কাজী সাহেব সাইয়েদ বংশীয় লোক দেখে তাড়াতাড়ি হোসেনকে তাঁর কন্যা দান করে বসেন। আবার একথা সমানভাবে প্রচলিত আছে যে, হোসেন চাঁদপাড়া গ্রামের জনৈক ব্রাহ্মণের অধীনে রাখালের চাকুরী করেন। এ সময়ে একদিন কোন গুরুতর অপরাধে ব্রাহ্মণ তাঁকে বেদম বেত্রাঘাত করেন। আবার কখনো হোসেনকে বলা হচ্ছে রংপুর জেলার দেবনগর গ্রামের অধিবাসী। এসব বিপরীতমুখী বিবরণ থেকে একথাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, হোসেন প্রকৃতপক্ষে ছিলেন অজ্ঞাত কুলশীল। একজন অজ্ঞাত কুলশীলের স্বার্থের খাতিরে সুযোগ বুঝে মুসলমান না হলেও মুসলমান বলে পরিচয় দেয়াটাও আশ্চর্যের কিছু নয়। মোটকথা ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার মাধ্যমে বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁর বংশ পরিচয় ও বাল্যজীবন সম্পর্কে নানান কল্পিত কাহিনী রচনা করা হয়। কল্পনাবিলাসী গল্পকারগণ হয়তো হোসেনের কথিত পিতার কোন সমাধি আবিষ্কার করে তৎপার্শ্বে হোসেন কর্তৃক বিরাট মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপনের উল্লেখ করতে পারতেন, কিন্তু তাঁরা বাংলার পরম পরাক্রমশালী বাদশাহ হোসেনের কাহিনী রচনায় এত মশগুল ছিলেন যে, হতভাগ্য পিতা ও ভ্রাতার কথা তাঁরা বেমালুম ভুলে গেছেন।

কিভাবে হোসেন ক্ষমতা লাভ করেন এবং ক্ষমতা লাভের পর তাঁর কার্যকলাপ কি ছিল তারও বিশদ আলোচনা করে দেখা যাক।

হাবশী শাসক মুজাফফর শাহ হোসেনকে প্রথমতঃ সামান্য চাকুরীতে নিযুক্ত করেন। অতঃপর প্রখর বুদ্ধি বলে হোসেন তাঁর প্রভুকে প্রীত ও সন্তুষ্ট করে অবশেষে প্রধানমন্ত্রীত্বের পদ লাভ করেন। সুচতুর হোসেন বুঝতে পেরেছিলেন হাবশী শাসকগণ বাংলার লোকের কাছে ছিলেন অনভিপ্রেত। অতএব আপন প্রভুকে সেনাবাহিনী, অমাত্যবর্গ ও জনসাধারণের কাছে অধিকতর অপ্রিয় করে তুলে হোসেন স্বয়ং ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তিনি তাঁর প্রভু মুজাফ্‌ফর শাহকে নানাভাবে কুপরামর্শ দিতে থাকেন।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন— "সৈয়দ হোসেন শরীফ মক্কী মুজাফ্‌ফর শাহের উজির ও প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরামর্শ অনুসারে মুজাফ্‌ফর শাহ সৈনিকদিগের বেতন হ্রাস করিয়া অর্থ সঞ্চয়ে মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন।" (বাংলার ইতিহাস, ২য় খন্ড পৃঃ ১৮৭)।

রিয়াযুস সালাতীন ও তারিখে ফেরেশতায় বলা হয়েছে যে, হোসেন উজির হওয়ার পর জনসাধারণের সাথে সদ্ব্যবহার করতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে একথাও বলতে থাকেন যে, মুজাফ্‌ফর শাহ অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির লোক এবং বাদশাহ হওয়ার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। হোসেন শাহের পরামর্শে মুজাফ্‌ফর শাহ অবাঞ্ছিত কাজ করতেন। ফলে হোসেন তাঁকে জনসাধারণের কাছে দোষী ও হেয় প্রতিপন্ন করার সুযোগ পেতেন। এভাবে তিনি সেনাবাহিনী, আমীর-ওমরা ও জনগণকে মুজাফ্‌ফর শাহের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে তোলেন। অবশেষে তাঁর নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী মুজাফ্‌ফর শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ঐতিহাসিকগণ বলেন, যুদ্ধে উভয়পক্ষের এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য নিহত হয়। সেকালে এতবড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ পৃথিবীর অন্য কোথাও হয়েছে বলে জানা যায় না।

যুদ্ধে মুজাফ্‌ফর শাহ নিহত হন। কেউ বলেন, হোসেন প্রাসাদ রক্ষীকে হাত করার পর প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে স্বহস্তে আপন প্রভুকে হত্যা করেন।

মওলানা আকরাম খাঁ তাঁর 'মুসলেম বংগের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে বিশ্বকোষের বরাত দিয়ে বলেন,

"সকল শ্রেণীর মুসলমান সামন্ত এবং হিন্দুরাজগণ তাঁহাকেই (সৈয়দ হোসেন) রাজ সিংহাসনের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া রাজপদে অভিষিক্ত করেন। তিনিও তাঁহাদের মনোরঞ্জনার্থ নির্দিষ্ট সময়মত গৌড় রাজধানী লুণ্ঠনের আদেশ দেন। ঐ সময়ে গৌড় নগরে অনেক ধনশালী হিন্দু প্রজা সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন।"

মজার ব্যাপার এই যে, হোসেনেরই আদেশে যারা লুণ্ঠন করেছিল, তাদেরকে আবার হোসেনের আদেশেই হত্যা করা হয়। এদের সংখ্যা ছিল বার হাজারেরও বেশী। হোসেন তাঁর আপন হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে লক্ষ লক্ষ লোকের রক্তে নিজের হাত রঞ্জিত করেন। হয়তো লুণ্ঠনের আদেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান হত্যার বাহানা মাত্র।

এত গণহত্যার পর, যার মধ্যে ছিল সেনাবাহিনীর লোক, আমীর ওমরা, অমাত্যবর্গ, জ্ঞানীগুণী প্রভৃতি, হোসেনের বিরুদ্ধে টু শব্দ করার আর কেউ রইলো না। ফলে তিনি হয়ে পড়েন দেশের সর্বময় কর্তা।

সাইয়েদ হোসেন মক্কী (?) সিংহাসন লাভের পর কোন্ ভূমিকা পালন করেন তা পাঠকগণের কৌতূহল সঞ্চার না করে পারবে না। রাজপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি তাঁর মন্ত্রীপরিষদ নতুন করে ঢেলে সাজালেন। তাঁর উজির ও প্রধান

কর্মকর্তা হলেন— গোপীনাথ বসু ওরফে পুরন্দর খান, রাজ চিকিৎসক মুকুন্দ দাস, প্রধান দেহরক্ষী কেশব ছত্রী, টাকশাল প্রধান অনুপ। নানা শাস্ত্র বিশারদ ও বৈষ্ণব চূড়ামনী শ্রীরূপ ও সনাতনও তাঁর মন্ত্রী হলেন। স্যার যদুনাথ সরকার বৈষ্ণব লেখকদের বরাত দিয়ে বলেন যে, শ্রীচৈতন্য যে অবতার ছিলেন, হোসেন শাহ তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। চৈতন্য গৌড় নগরে আগমন করলে হোসেন তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং রাজকর্মচারীগণের প্রতি ফরমান জারী করেন যেন প্রভু চৈতন্যকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় ও তাঁর ইচ্ছামত যত্রতত্র ভ্রমণের সুযোগ-সুবিধা করে দেয়া হয়।

শ্রদ্ধেয় আকরাম খাঁ তাঁর উপরোক্ত গ্রন্থের ৯৮ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ

"হিন্দু লেখকগণের মতে হোসেন শাহের সিংহাসন আরোহণের পর হইতে গৌড় দেশে 'রামরাজ্য' আরম্ভ হইয়া গেল। মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এ বিষয়ের ভূমিকা হিসাবে বলিতেছেন ঃ মুসলমান ইরান, তুরান প্রভৃতি স্থান হইতেই আসুন না কেন, এদেশে আসিয়া সম্পূর্ণ বাঙালী হইয়া পড়িলেন। মসজিদের পার্শ্বে দেব মন্দিরের ঘন্টা বাজিতে লাগিল, মহরম, ঈদ, শবে বরাত প্রভৃতির পার্শ্বে দুর্গোৎসব, রাম, দোল উৎসব চলিতে লাগিল। ... এহেন পরিস্থিতির মধ্যে সুলতান হোসেনের অভ্যুদয় ঘটিল। তিনি রাজকীয় ঝামেলা হইতে মুক্ত হইয়া খুব সম্ভব সর্বপ্রথমে চৈতন্যদেবের খেদমতে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার ভক্ত শ্রেণীভুক্ত হইয়া গেলেন। 'চৈতন্য চরিতামৃতে' লিখিত আছে যে, ইনি (হোসেন) শ্রীচৈতন্যের একজন ভক্ত হইয়াছিলেন।"

সুলতান হোসেন ও শ্রীচৈতন্য ছিলেন সমসাময়িক এবং চৈতন্যের সাথে হোসেনের গভীর সম্পর্ক এক ঐতিহাসিক সত্য। অতএব শ্রীচৈতন্যের কিঞ্চিৎ আলোচনা এখানে অপ্রাসংগিক হবেনা নিশ্চয়।

শ্রীচৈতন্য

শ্রী চৈতন্যকে বৈষ্ণব সমাজ শ্রীকৃষ্ণের অবতার রূপে, এমনকি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। গোটা হিন্দু সমাজের মধ্যে শ্রীচৈতন্য এক নব জাগরণ সৃষ্টি করেন।

স্যার যদুনাথ সরকার বলেন ঃ

" ...এ এমন এক সময় যখন প্রভু গৌরাংগের প্রতীক স্বরূপ বাংগালীর

মনের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। তাঁর প্রেম ও ক্ষমার বাণী সমগ্র ভারতকে বিমোহিত করে। বাংগালীর হৃদয়মন সকল বন্ধন ছিন্ন করে রাধাকৃষ্ণের লীলা গীতিকার দ্বারা সম্মোহিত হয়। বৈষ্ণব ধর্মের আবেগ অনুভূতিতে, কাব্যে, গানে, সামাজিক সহনশীলতা এবং ধর্মীয় অনুরাগে মনের উচ্ছ্বাস পরবর্তী দেড় শতাব্দী যাবত অব্যাহত গতিতে চলে। এ হিন্দু রেনেসাঁ এবং হোসেন শাহী বংশ ওতপ্রোত জড়িত। এ যুগে বৈষ্ণব ধর্মের এবং বাংলা সাহিত্যের যে উন্নতি অগ্রগতি হয়েছিল তা অনুধাবন করতে গেলে গৌড়ের মুসলমান প্রভুর উদার ও সংস্কৃতি সম্পন্ন শাসকের কথা অবশ্যই মনে পড়ে।"

(যদুনাথ সরকার, দি হিষ্ট্রী অব বেঙল, ২য় খন্ড পৃঃ ১৪৭)

প্রকৃতপক্ষে চৈতন্যের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য কি ছিল, তা তাঁর নিজের কথায় আমরা সুস্পষ্টরূপে জানতে পারি। চৈতন্য চরিতামৃত আদি লীলা, ১২০ পৃষ্ঠায় তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন–

"পাষন্ডি সংহারিতে মোর এই অবতার।
পাষন্ডি সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার।"

এখন বুঝা গেল পাষন্ডি সংহার করাই তাঁর জীবনের আসল লক্ষ্য। ইতিহাস আলোচনা করলে জানা যায়, মুসলমানগণ বাংলা অধিকার করার সময় বৌদ্ধ মতবাদ দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়েছিল। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের যে বিপুলসংখ্যক লোক এদেশে বাস করতো, ব্রাহ্মণগণ তাঁদেরকে ধর্মের আশ্রয়ে আনতে অস্বীকার করেন। তার ফলে তারা বৈষ্ণব সমাজে প্রবেশ করতে থাকে। তাহলে এদেশে হিন্দু, বৈষ্ণব সমাজ ও মুসলমান ব্যতীত সে সময়ে আর কোন ধর্মাবলম্বীর অস্তিত্ব ছিল না। তাহলে পাষন্ডি ছিল কারা যাদের সংহারের জন্যে চৈতন্যের আবির্ভাব হয়েছিল?

মওলানা আকরাম খাঁ তাঁর উপরে বর্ণিত গ্রন্থে বলেন ঃ

"মনুর মতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী অহিন্দু মাত্রই এই পর্যায়ভুক্ত (সরল বাংলা অভিধান)। আভিধানিক সুবল চন্দ্র মিত্র তাঁহার Beng-Eng Dictionary তে পাষন্ডি শব্দের অর্থে বলিতেছেন— "Not conforming himself to the tenets of Vedas : Atheistic, Jaina or Buddha, a non-Hindu— বেদ অমান্যকারী, অন্য বর্ণের চিহ্নধারী এবং অহিন্দু— পাষন্ডির এই তিনটি বিশ্লেষণ সর্বত্র প্রদত্ত হইয়াছে।"

এখন পাষন্ডি বলতে যে একমাত্র মুসলমানদেরকেই বুঝায়, তাতে আর সন্দেহের অবকাশ রইলো না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, সত্য সত্যই–কি চৈতন্য পাষন্ডি তথা মুসলমানদেরকে এদেশ থেকে উচ্ছেদ করতে পেরেছিলেন? আপাতঃ দৃষ্টিতে দেখা যায়, চৈতন্যের সমসাময়িক সুলতান হোসেন শাহের পরেও এদেশে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু হোসেন শাহ কর্তৃক চৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ ও বৈষ্ণব সমাজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর সাহায্য সহযোগিতার দ্বারা মুসলমানদের আকীদাহ বিশ্বাসের মধ্যে শির্ক বিদয়াতের যে আবর্জনা জমে উঠেছিল তা–ই পরবর্তী যুগে মুসলিম সমাজের অধঃপতনের কারণ হয়।

'মুসলেম বংগের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থ প্রণেতা বলেন—

"প্রকৃত কথা এই যে, বৌদ্ধ সমাজ ও বৌদ্ধ ধর্মকে তাহাদের মাতৃভূমি হইতে সমূলে উৎখাত করার পর তাঁহাদের নেকনজর পড়িয়াছিল মুসলমান সমাজের উপর। তাই যুগপৎভাবে তাঁহারা চেষ্টা করিতে লাগিলেন 'যবন' রাজাদিগকে রাজনৈতিক কৌটিল্যের মাধ্যমে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিতে। পক্ষান্তরে ধর্মের নামে একটা মোহজাল বিস্তার করিয়া মুসলমান সমাজকে আত্মবিস্মৃত ও সম্মোহিত করিয়া রাখিতে। পূর্বে বলিয়াছি, ইহাই তৎকালের অবতার ও তাঁহার ভক্ত ও সহকারীদের চরম ও পরম উদ্দেশ্য।"

সত্য নারায়ণের পূজা পদ্ধতির উল্লেখ হিন্দু পুরাণে আছে। হিন্দুর প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে এই পূজার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। কিন্তু মুসলমানকে দিয়ে এ সত্য নারায়ণের পূজা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। তাই হিন্দু মুসলমানের বিভেদ মিটাবার মহান (?) উদ্দেশ্যে সুলতান হোসেন সত্যপীরের প্রতিষ্ঠা ও তাঁর পূজা পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। প্রকৃতপক্ষে সত্যপীরের দরগাহ প্রতিষ্ঠা, সত্যপীরের নামে মানৎ ও শির্ণি বিতরণ, ঢাক–ঢোলের বাদ্য–বাজনাসহ সত্যপীরের দরগায় অনুষ্ঠানাদি পালন প্রকৃতপক্ষে সত্যনারায়ণ পূজারই মুসলিম সংস্করণ যার প্রবর্তক ছিলেন হোসেন শাহ। এসব কারণেই হোসেন শাহকে অবতার বলে মান্য করে হিন্দু সমাজ।

নৃপতি হুসেন শাহ হয়ে মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি।।
অস্ত্রশস্ত্রে সুপন্ডিত মহিমা অপার।

কলিকালে হবু যেন কৃষ্ণ অবতার।।
('বংগভাষা ও সাহিত্য' দীনেশ চন্দ্র সেন)।

দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর 'বংগভাষা ও সাহিত্যে' বলেন ঃ

"কবীন্দ্র পরমেশ্বর ইঁহাকে (হোসেন শাহ) কৃষ্ণের অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।... চৈতন্য চরিতামৃত ও চৈতন্য ভাগবতে দৃষ্ট হয়, তিনি চৈতন্যপ্রভুকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।... যে গুণে আকবর ভারত ইতিহাসের কণ্ঠে কণ্ঠহার হইয়া আছেন, সেই গুণে হোসেন শাহ বংগের ইতিহাসে উজ্জ্বল রত্ন বলিয়া গণ্য হইবেন।"

হিন্দুদের সাধারণ ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের অবতার। অথবা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। এজন্যে তাঁর ভক্তবৃন্দ অতি মারাত্মকভাবে কৃষ্ণলীলায় আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ধর্মের নামে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের মধ্যে যে অতি জঘন্য ধরনের যৌন অনাচার চলে, তা পুরাণে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের যৌন আবেদনমূলক প্রেমলীলার পরিপূর্ণ অনুকরণ। এসবের পূর্ণ বিবরণ বহু হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থে দেখা যায়। বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসারের ফলে হিন্দু সমাজের মধ্যে যৌন অনাচারের মাধ্যমে যে সর্বনাশটা হয়েছে তা হিন্দু সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ স্বীকার করেন। পরম পরিতাপের বিষয় এই যে, বাংলার একজন শক্তিশালী মুসলিম শাসক হোসেন শাহের এ বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি অনুরাগের কারণে মুসলিম বাংলার লক্ষ লক্ষ লোকও এ সমস্ত নোংরা ও অশ্লীল আচার অনুষ্ঠানকে তাদের জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করে মুসলিম সমাজকে অভিশপ্ত ও অধঃপতিত করেছে। এভাবেই শ্রীচৈতন্য পাষন্ডি সংহারে পূর্ণ সফলতা অর্জন করেছেন বল্লে অত্যুক্তি হবে না।

এখানে আমরা রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের উক্তির পুনরাবৃত্তি করে তার মধ্যে কিছু সংশোধনীসহ বলতে চাই—

'দনুজমর্দন দেব-গণেশ যাহা করিতে পারেন নাই, আর্যাবর্তের কোনও হিন্দু রাজা যাহা করিতে পারেন নাই তাহাই সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া সুলতান হোসেন শাহের নাম ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকিবে।"

এত আলোচনার পর এখন হোসেন শাহের বংশ ও জাতিধর্ম সম্বন্ধে সন্দেহ অধিকতর ঘনীভূত হচ্ছে। হতে পারে যে, হোসেন শাহ আদৌ মুসলমান ছিলেন না। একজন সাইয়েদ বংশীয় মুসলমান হিসাবে পরিচয় দিয়ে মুসলমানদের ভক্তি

শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে প্রতারণার মাধ্যমে ক্রমশঃ উচ্চতম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। অথবা বাংলারই অজ্ঞাত কুলশীল হিন্দু অথবা মুসলমান কোন নিরাশ্রয় বালককে মুর্শিদাবাদের চাঁদপাড়া গ্রামের জনৈক ব্রাহ্মণ আশ্রয় দান করে রাখালের কাজে নিযুক্ত করেন। উক্ত ব্রাহ্মণ এ বালকের মধ্যে এক বিরাট প্রতিভা দেখতে পান এবং 'পাষন্ডি সংহার নিমিত্ত' তাঁকে প্রশিক্ষণ দিয়ে মুজাফ্ফর শাহের দরবারে অন্নসংস্থানের অজুহাতে প্রেরণ করেন। এখানেই সাইয়েদ ও মক্কী বলে তাঁর পরিচয় দেয়া হয়। মুজাফ্ফর শাহের অনুগ্রহে তাঁর ভাগ্যের দ্রুত পরিবর্তন শুরু হয়। তাঁর গোটা জীবন, তাঁর সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের পরস্পর বিরোধী বিবরণ, তাঁর পরবর্তীকালের ধর্মবিশ্বাস, কার্যকলাপ ও আচার-আচরণ, অসংখ্য প্রতিভাবান মুসলমান হত্যা করে হিন্দু ও বৈষ্ণব সমাজের লোকদের দ্বারা তাঁর মন্ত্রীসভা ও রাজদরবারের শোভাবর্ধন, প্রভৃতি লক্ষ্য করার পর তাঁর জাতিধর্ম সম্পর্কে উপরোক্ত ধারণা পোষণ করলে কি ভুল হবে?

মোটকথা, হোসেন শাহ মুসলমানই হন, আর যা-ই হন, অসংখ্য অগণিত মুসলমান সৈন্য, আমীর ওমরা ও সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের হত্যার পর শক্তিশালী হিন্দু সামন্ত প্রভুদের তুষ্টি সাধন করে মুসলিম সমাজের কোন্ সর্বনাশটা করেছেন, তা চিন্তা করার অবকাশ তাঁর ছিল কোথায়? ইতিহাসের বিভিন্ন সময়কালে এমনি এক একজন মুসলমানকে কাষ্ঠপুত্তলিকা সাজিয়ে ইসলাম বৈরীগণ তাঁদের অভীষ্ট সিদ্ধ করেছেন। সেজন্যে অমুসলিম ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকগণকে আমরা হোসেন শাহের প্রশংসায় পঞ্চমুখ দেখতে পাই।

তাঁর আমলে বাংলা ভাষার মাধ্যমে হিন্দু জাতির রেনেসাঁ আন্দোলন জোরদার হয়েছিল। বাংলা গ্রন্থ প্রণেতা মালাধর বসু, বিপ্রদাস, বিজয়গুপ্ত এবং যশোরাজ খান তাঁদের সাহিত্যে হোসেন শাহের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাসহ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। মালাধর বসু ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ বাংলায় অনুবাদ করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়লীলা বিষয়ক 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' নামক একখানি বাংলা মহাকাব্য রচনা করেন। হোসেন প্রীত হয়ে তাঁকে 'গুণরাজ খান' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি বলেন—

"নিগুর্ণ অধম মুঞি নাহি কোন ধাম
গৌড়েশ্বর দিল নাম গুণরাজ খান।"

মালাধর বসুর ভ্রাতা গোপীনাথ বসু ওরফে পুরন্দর খান শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়লীলা

বিষয়ে কৃষ্ণমংগল নামক একখানি মহাকাব্য রচনা করেন। ব্রাহ্মণ বিপ্রদাস মনসামংগল কাব্য রচনা করেন। পরাগল খাঁকে হোসেন শাহ চট্টগ্রামে বিরাট ভূসম্পত্তি দান করেন।

এসব গ্রন্থাদি ও মহাকাব্য রচনায় হোসেন শাহ ও তাঁর পুত্র নসরৎ শাহের সাহায্য সহযোগিতা ছিল বলে মুসলিম সমাজে তার বিরাট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

উপরে বর্ণিত বিপ্রদাস রচিত মনসামংগল কাব্য মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর এতখানি প্রভাব বিস্তার করে যে পরবর্তীকালে মুসলিম সমাজে মনসাপূজা প্রচলিত হয়। পাঠকগণের অবগতির জন্যে মওলানা আকরাম খাঁ'র গ্রন্থের কিঞ্চিৎ এখানে সন্নিবেশিত করছি।

"মহাভারত ও দেবী ভাগবতে আমরা মনসার আংশিক বিবরণ দেখিতে পাই। তাহার জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে মতভেদ থাকিলেও আমরা তাহাকে শিবের কন্যা বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। ভাষার শালীনতা রক্ষা করিয়া মনসার কাহিনী বর্ণনা করা সম্ভব নহে। মোদ্দাকথা, জন্মের পর মুহূর্তেই তিনি পরিপূর্ণ যৌবনবতী হইয়া উঠেন এবং শিব বা মহাদেব তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া যান। শিবের পত্নী চন্ডী বা দুর্গা যে কারণেই হউক তাঁহাকে দেখা মাত্র আক্রোশে ফাটিয়া পড়েন। ফলে দুই দেবীর মধ্যে যে সংঘর্ষ বাধে তাহাতে মনসা তাঁহার একটি চক্ষু হারান। মনসা দুর্গার প্রতি ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। শিবও তাঁহার রোষ হইতে বাদ পড়িলেন না। (সাপ নাচানো বর্ণনা এখানে আমরা বাদ দিতেছি- মনসা কিন্তু সাপের দেবী হিসাবে পূজিত হন)। মনসা প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তাঁহার এই অপমানের প্রতিশোধ না লইয়া ছাড়িবেন না। তাঁহার সহচরী নেত্রবতীর সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি শিব ও দুর্গা-ভক্তদের মনসা পূজায় বাধ্য করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। এই উদ্দেশ্য লইয়া বাংলাদেশে তিনি এক বিশেষ রূপে আবির্ভূত হইলেন এবং অতি অল্পায়াসে ধীরে ধীরে রাখাল, জেলে ও গরীব মুসলমানদের তাহার পূজায় প্রবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন। (বাংলা সাহিত্যের কথা-১৬ পৃষ্ঠা)

চাঁদ সওদাগরের স্ত্রী একজন মনসাভক্ত নারী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বামী কোনক্রমেই মনসার পূজা করিতে রাজী হইলেন না। রাগান্বিত হইয়া মনসা তাঁহাকে নানা বিপদ ও ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে ফেলিতে লাগিলেন। কিন্তু সাতটি সন্তান ও প্রচুর ধনসম্পদসহ তাঁহার সমুদয় জাহাজ সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়া সত্ত্বেও

সওদাগর নিজের মতে অটল রহিলেন। অবশেষে কঠোর সতর্কতা সত্ত্বেও তাঁহার একমাত্র জীবিত পুত্র লখিন্দর সর্পাঘাতে নিহত হয় এবং লখিন্দরের স্ত্রী বেহুলা তাহার প্রগাঢ় ভক্তি ও মনসার দয়ায় তাহাকে পুনর্জীবিত করিতে সক্ষম হয়। চাঁদ সওদাগরের হারানো সকল পুত্র ও ধনৈশ্বর্য পুনরায় তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। এই মনসা পূজা এবং ইহার সহিত সম্পর্কযুক্ত বেহুলার ভাসান বিংশতি শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত যশোহর, খুলনা ও চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।" (মুসলেম বংগের সামাজিক ইতিহাস-পৃঃ ৭৮-৭৯)

শুধু দক্ষিণ বংগেরই নয় বাংলার প্রায় সকল অঞ্চলের একশ্রেণীর মুসলমান উপরোক্ত শির্ক ও কুফরী ধারণা পোষণ করে গ্রামে গ্রামে বেহুলার ভাসান বা ভাসান যাত্রা উৎসাহ উদ্যম সহকারে অনুষ্ঠিত করতো।

এখন আমরা স্পষ্টই দেখতে পাই যে, হোসেন শাহ ও তাঁর বংশধরগণের সাহায্যে কিভাবে পৌত্তলিকতার বিষবাষ্প মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে সংক্রমিত করেছিল। যার ফলে পরবর্তীকালে হিন্দু মুসলমান সমাজ ও সংস্কৃতিকে এক ও অভিন্ন করার হাস্যকর প্রচেষ্টা চলেছে।

হোসেন শাহী বংশ

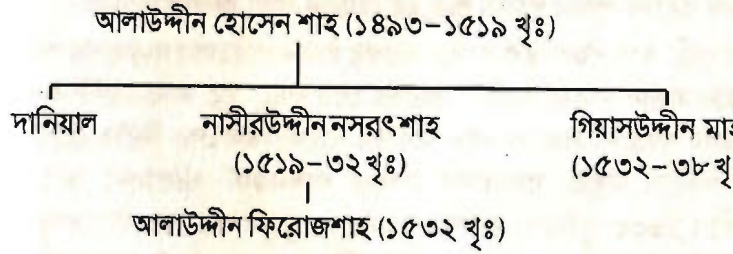

বাংলার ইতিহাস আলোচনা করলে জানা যায় যে, সর্বপ্রথম হোসেন শাহী আমলেই মুসলমানদের আচার-আচরণ ও ধর্ম বিশ্বাসে পৌত্তলিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। শ্রীচৈতন্য ও বৈষ্ণব সমাজের বিরাট প্রভাব যে মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস কলুষিত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। হোসেন শাহ কর্তৃক লক্ষ লক্ষ সম্ভ্রান্ত মুসলমান আমীর-ওমরা, ধার্মিক ও পীর-অলী নিহত হওয়ায় এবং হোসেন শাহের স্বয়ং শ্রীচৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার কারণে মুসলিম সমাজে পৌত্তলিক ভাবধারার অনুপ্রবেশ সহজতর হয়েছিল।

এম আর তরফদার তাঁর Husain Shahi Bengal গ্রন্থে বলেন ঃ .... "Some of the influential Muslims used to worship the snake goddess, Manasa, out of fear for snake bite. It is probably the result of the Hindu influence on the Muslims. Nasrat Shah constructed a building in order to preserve therein the Qadam Rasul or the footprint of the Prophet. But the preservation of the Prophet's footprint does not find support in Orthodox Islam . . ." (Husain Shahi Bengal, M.R. Tarafdar, p. 164, 166, 167, 89-91)

"কোন কোন প্রভাবশালী মুসলমান মনসা দেবীর পূজা করতো সর্পদংশনের ভয়ে। এ ছিল সম্ভবতঃ মুসলমানদের উপর হিন্দু প্রভাবের ফল। নসরৎ শাহ (হোসেন শাহের পুত্র) কদম রসূল বা নবীর পদচিহ্ন রক্ষণের জন্যে একটি অট্টালিকা নির্মাণ করেন। নবীর পদচিহ্নের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন সত্যিকার ইসলাম সমর্থন করেনা।"

ডাঃ জেমস্ ওয়াইজ বলেন, গয়ার ব্রাহ্মণগণ তীর্থ যাত্রীদেরকে বিষ্ণুপদ (বিষ্ণুর পদচিহ্ন) দেখিয়ে প্রচুর রোজগার করে। তাদের অনুকরণে মুসলমান সমাজে কদম রসূলের পূজার প্রচলন শুরু হয় হোসেন শাহী বাংলায়।

হোসেন শাহী বংশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর বাংলার শাসন পরিচালন করার পর আর তাদের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। তারপর শের শাহ, সুর ও কররাণী বংশ ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত থাকে। অতঃপর দিল্লীর মোগল সাম্রাজ্যের অধীনে নিযুক্ত গভর্ণরগণ বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। তবে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর কর্তৃক মানসিংহ দ্বিতীয়বারের জন্যে বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শান্তির সঙ্গে বাংলায় শাসনকার্য পরিচালনা সম্ভব হয়নি। বাংলার মোগল আধিপত্য বার বার প্রতিহত ও বিপন্ন হয়। মানসিংহের পর জাহাঙ্গীর কুতুবউদ্দীন খান কোকাকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর কুলী খান এবং ১৬৩৯ সাল পর্যন্ত আরও নয়জন বাংলার সুবাদার গভর্ণর হিসাবে শাসন পরিচালনা করেন। ১৬৩৯ সালে যুবরাজ সুজা বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত হওয়ার পর সর্বপ্রথম ইংরেজগণ ব্যবসায়ীর বেশে বাংলায় আগমন করে এবং ১৭৫৭ সালে

তারা চিরতরে মুসলিম শাসনের মূলোৎপাটন করে বাংলা বিহারের হর্তাকর্তা বিধাতা হয়ে পড়ে।

যুবরাজ মুহাম্মদ সুজার পর ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত যাঁরা বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁরা হলেন ঃ

যুবরাজ মুহাম্মদ সুজা—১৬৩৯-৬০ খৃঃ
মুয়াজ্জাম খান মীর জুমলা—১৬৬০-৬৩ খৃঃ
দিলির খান-দাউদ খান—১৬৬৩-৬৪খৃঃ
শায়েস্তা খান (মুমতাজ মহলের ভ্রাতা)—১৬৬৪-৭৮ খৃঃ
ফিদা খান আজম খান কোকা—১৬৭৮ খৃঃ
যুবরাজ মুহাম্মদ আজম—১৬৭৮-৭৯ খৃঃ
শায়েস্তা খান—১৬৭৯-৮৮ খৃঃ
খানে জাহান—১৬৮৮-৮৯খৃঃ
ইব্রাহিম খান—১৬৮৯-৯৮ খৃঃ
যুবরাজ আজীম উদ্দীন—১৬৯৮-১৭১৭খৃঃ
মুর্শিদ কুলী খান—১৭১৭-২৭খৃঃ
সুজাউদ্দীন মুহাম্মদ খান—১৭২৭-৩৯ খৃঃ
সরফরাজ খান—১৭৩৯-৪০ খৃঃ
আলীবর্দী খান—১৭৪০-৫৬খৃঃ
সিরাজদ্দৌলা—১৭৫৬-৫৭ খৃঃ

তৃতীয় অধ্যায়

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাংলায় আগমন

যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে ইংরেজগণ শতাধিক বৎসরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সাধ্য সাধনায় ব্যবসায়ী থেকে শাসকে পরিণত হয়েছিল, সাড়ে পাঁচশত বৎসরব্যাপী প্রতিষ্ঠিত মুসলিম শাসনের মূলোৎপাটন করে এ দেশবাসীকে গোলামীর শৃংখলে আবদ্ধ করেছিল, তাদের এ দেশে আগমন ও পরবর্তী কার্যকলাপ আমাদের ভালো করে জেনে রাখা দরকার।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে (১৫৯৯ খৃঃ) কতিপয় ব্যবসায়ীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় লন্ডনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর জন্ম হয়। রাণী এলিজাবেথের অনুমোদনক্রমে তারা ভারতের সাথে ব্যবসা শুরু করে। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নিকট থেকে সনদ লাভ করে এ কোম্পানী সর্বপ্রথম সুরাট বন্দরে তাদের বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে।

প্রথম প্রথম তাদেরকে খুব ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে চলতে হয় বলে ব্যবসা বাণিজ্যে বেশী সুবিধা করতে পারে না। ১৬৪৪ সালে বাদশাহ শাহজাহান দাক্ষিণাত্যে অবস্থানকালে তাঁর কন্যা আগুনে দগ্ধিভূত হয়। তার চিকিৎসার জন্যে সুরাটের ইংরেজ–কুঠির অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রেরিত সুদক্ষ সার্জন ডাঃ গ্যাব্রিল বাউটন তাকে নিরাময় করেন। তাঁর প্রতি বাদশাহ শাহজাহান অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে পড়েন এবং বাউটনের অনুরোধে ইংরেজ বণিকগণ বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে। ১৬৪৪ সালে তারা যখন বাদশাহর ফরমানসহ বাংলায় উপস্থিত হয়, তখন বাংলা বিহার উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন যুবরাজ মুহাম্মদ শাহসুজা।

কোম্পানীর পরম সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, শাহ সুজার পরিবারের জনৈক সদস্যের চিকিৎসার ভার ডাঃ বাউটনের উপর অর্পিত হয় এবং এখানেও তিনি চিকিৎসায় সুনাম অর্জন করেন। অতএব শাহ সুজা মাত্র তিন হাজার টাকা সালামীর বিনিময়ে ইংরেজদেরকে বাংলায় অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ দান করেন। বাদশাহ শাহজাহান ও তদীয় পুত্র ইংরেজদের প্রতি যে চরম উদারতা প্রদর্শন

করেছিলেন সেই উদারতা ও অনুগ্রহ প্রদর্শনকে অকৃতজ্ঞ ইংরেজ বণিকগণ পরবর্তীকালে মোগল সাম্রাজ্যের ও বাংলা বিহারের স্বাধীনতার মৃত্যুপরোয়ানা হিসাবে ব্যবহার করে।

শাহ সুজার ফরমানবলে ইংরেজ বণিকগণ হুগলীতে তাদের বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে এবং পাটনায় এজেন্সি স্থাপন করে।

মীর জুমলা থেকে সিরাজদ্দৌলা

শাহ সুজার পর আওরংজেবের সেনাপতি মীর জুমলা বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। বিচক্ষণ মীর জুমলা ইংরেজদের গতিবিধির প্রতি তিক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। একবার পাটনা থেকে হুগলীগামী কয়েকখানি মাল বোঝাই নৌকা মীর জুমলা আটক করেন। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য হুগলীর ইংরেজ কুঠিয়াল জনৈক মুসলমানের মাল বোঝাই নৌকা আটক করে পণ্যদ্রব্যাদি হস্তগত করে। তার এ ঔদ্ধত্যের জন্যে মীর জুমলা হুগলীর কুঠি অধিকার করার আদেশ জারী করেন। কুঠিয়াল বেগতিক দেখে আটক নৌকা ও মালপত্র মালিককে ফেরৎ দিয়ে মীর জুমলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

নবাব শায়েস্তা খান

মীর জুমলার পর শায়েস্তা খান বাংলার নবাব সুবাদার পদে নিযুক্ত হন। শায়েস্তা খানের জন্যে ইংরেজগণ সর্বত্র সন্ত্রস্ত থাকতো। তাদের ঔদ্ধত্যের জন্যে শায়েস্তা খান পূর্ববর্তী ফরমানগুলি বাতিল করে দেন। তারা তাদের আচরণের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী হলে এবং সততার সাথে ব্যবসা করার প্রতিশ্রুতি দিলে পূর্বতন ফরমানগুলি পুনর্বহাল করা হয়। অতঃপর শায়েস্তা খান বাংলা ত্যাগ করেন।

ফিদা খান ও যুবরাজ মুহাম্মদ আজম

শায়েস্তা খানের পর ফিদা খান ও সম্রাট আওরংজেবের পুত্র যুবরাজ মুহাম্মদ আজম পর পর বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৬৭৮ সালে মুহাম্মদ আজম সুবাদার নিযুক্ত হওয়ার পর কোম্পানী তাদের হীনস্বার্থ সিদ্ধির জন্যে মুহাম্মদ আজমকে একুশ হাজার টাকা ঘুষ প্রদান করে। সম্রাট আওরংজেব তা জানতে

পেরে তাকে পদচ্যুত করে পুনরায় শায়েস্তা খানকে বাংলায় প্রেরণ করেন। এ সময়ে ইংরেজদের ঔদ্ধত্য চরমে পৌঁছে। আকবর নামক জনৈক ব্যক্তি সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং ইংরেজগণ তাকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে। শায়েস্তা খান এ ষড়যন্ত্র জানতে পেরে পাটনা কুঠির অধিনায়ক মিঃ পিকক্‌কে কারারুদ্ধ করেন। কোম্পানীর ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় লন্ডন থেকে ক্যাপ্টেন নিকলসনের নেতৃত্বে কয়েকখানি যুদ্ধ জাহাজ ভারতে প্রেরণ করা হয় এবং চট্টগ্রাম অধিকারের নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু ক্যাপ্টেন নিকলসন বিফল মনোরথ হন। ইংরেজদের এহেন দুরভিসন্ধির জন্যে নবাব শায়েস্তা খান তাদেরকে সুতানটি থেকে বিতাড়িত করেন। ১৬৮৭ সালে কাশিমবাজার কুঠির প্রধান জব চার্ণক নবাব প্রদত্ত সকল শর্ত স্বীকার করে নিলে পুনরায় তাদেরকে ব্যবসার অনুমতি দেয়া হয়। নবাব কর্তৃক প্রদত্ত শর্তগুলি জব চার্ণক কর্তৃক মেনে নেয়ার কথা ইংলন্ডে পৌঁছলে কোম্পানীর কর্মকর্তাগণ এটাকে অবমাননাকর মনে করে। অতঃপর তারা ক্যাপ্টেন হীথ্ নামক একজন দুর্দান্ত নাবিকের পরিচালনাধীনে 'ডিফেন্স' নামক একটি রণতরী বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে ভারতে প্রেরণ করে। হীথ্ সুতানটি পৌঁছে মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে কোম্পানীর লোকজনসহ বালেশ্বর গমন করে। এখানে তারা জনগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে এবং তাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে। অতঃপর হীথ্ বালেশ্বর থেকে চট্টগ্রাম গমন করে আরাকান রাজের সাহায্য প্রার্থনা করে। এখানেও সে ব্যর্থ হয় এবং নিরাশ হয়ে মাদ্রাজ চলে যায়। তাদের এসব দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্র জানতে পেরে বাদশাহ আওরংজেব ইংরেজদের মসলিপট্টম ও ভিজেগাপট্টমের বাণিজ্য কুঠিসমূহ বাজেয়াপ্ত করেন। এভাবে কোম্পানী তাদের দুষ্কৃতির জন্যে চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

সুবাদার ইব্রাহীম খান

শায়েস্তা খানের পর অল্পদিনের জন্যে খানে জাহান বাংলার সুবাদার হন এবং ১৬৮৯ সালে ইব্রাহীম খান বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হন। এ দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারকল্পে কোম্পানীর বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা হয়। অতঃপর উড়িষ্যার বন্দী ইংরেজদেরকে মুক্তিদান করে জব চার্ণককে পুনরায় বাংলায় বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের অনুমতি দেয়া হয়। জব চার্ণক পলায়ন করে মাদ্রাজ

অবস্থান করছিল। ধূর্ত জব চার্ণক অনুমতি পাওয়া মাত্র ১৬৯১ সালে ইংরেজ বণিকদেরকে নিয়ে বাংলায় প্রত্যাবর্তন করে এবং কোলকাতা নগরীর পত্তন করে নিজেদেরকে এমনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে যে, এর সুদূরপ্রসারী ফলস্বরূপ ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ইংরেজগণ বাংলা তথা সমগ্র ভারতভূমিতে তাদের আধিপত্য ও সাম্রাজ্যবাদ অক্ষুণ্ন রাখে।

এ সময়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটি গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়। কনস্টান্টিনোপলের শায়খুল ইসলাম বাদশাহ আওরংজেবকে জানান যে, ইংরেজরা ভারত থেকে যে বিপুল পরিমাণ যবক্ষার সংগ্রহ করে তা ইউরোপে রপ্তানী করা হয় এবং তাই দিয়ে গোলাবারুদ তৈরী করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। আওরংজেব যবক্ষার ক্রয় নিষিদ্ধ করে দেন। কিন্তু গোপনে তারা যবক্ষার পাচার করতে থাকে। অতঃপর ইউরোপীয়দের সাথে ব্যবসা নিষিদ্ধ করে বাদশাহ আওরংজেব এক ফরমান জারী করেন। হুগলী কুঠির অধ্যক্ষ বাংলার সুবাদারের কৃপাপ্রার্থী হলে তিনি এ নিষেধাজ্ঞার কঠোরতা হ্রাস করে দেন।

সুবাদার আজিমুশ্‌শান

ইব্রাহীম খানের অযোগ্যতার কারণে সম্রাট আওরংজেব তাঁর স্থলে স্বীয় পৌত্র আজিমুশ্‌শানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন।

আজিমুশ্‌শান ছিলেন অত্যন্ত আরামপ্রিয় ও অর্থলোভী। তার সুযোগে ইংরেজগণ তাঁকে প্রভূত পরিমাণে উপঢৌকনাদি নজর দিয়ে সুতানটি বাণিজ্যকুঠি সুরক্ষিত করার অনুমতি লাভ করে। তারপর পুনরায় ষোল হাজার টাকা নজরানা ও মূল্যবান উপহারাদি দিয়ে সুতানটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা গ্রাম তিনটি লাভ করে।

১৭০৭ সালে আওরংজেবের মৃত্যুর পর আজিমুশ্‌শানের পিতা বাহাদুর শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফলে পুনরায় আজিমুশ্‌শান বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হন। অযোগ্য, অকর্মণ্য ও আরামপ্রিয় সুবাদারকে রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যে মুর্শিদ কুলী খানকে দেওয়ান নিযুক্ত করে বাংলায় পাঠানো হয়।

মুর্শিদ কুলী খান

বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর সিংহাসন লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে ফরোখশিয়ার কর্তৃক আজিমুশ্‌শান নিহত হন এবং ফরোখশিয়ার মুর্শিদ কুলী খানকেই বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। মুর্শিদ কুলী খান ইংরেজদের হাতের পুতুল সাজার অথবা অর্থদ্বারা বশীভূত হবার পাত্র ছিলেন না। অতএব তাঁর কাছ থেকে অবৈধ সুযোগ সুবিধা লাভে ইংরেজগণ ব্যর্থ হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে তারা সম্রাটের নিকট একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে। তাদের মধ্যে হ্যামিল্টন নামে একজন সুদক্ষ চিকিৎসক ছিল। বাংলার সুবাদার ছিলেন ইংরেজদের প্রতি বিরাগভাজন। তাঁর মতের বিরুদ্ধে কিছু করতে সম্রাট ছিলেন নারাজ। কিন্তু এখানে একটি প্রেমঘটিত নাটকের সূত্রপাত হয় যার ফলে ইংরেজদের ভাগ্য হয় অত্যন্ত সুপ্রসন্ন।

উদয়পুরের মহারাণা অজিৎ সিংহের এক পরম রূপসী কন্যার প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েন যুবক সম্রাট ফরোখশিয়ার। বিবাহ স্থিরীকৃত হওয়ার পর হঠাৎ তিনি ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হন। বিবাহ অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত হয়ে যায়। কোন চিকিৎসায়ই কোন ফল হয় না। অবশেষে সম্রাট হ্যামিল্টনের চিকিৎসাধীন হন। তাঁর চিকিৎসায় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের পর মহারাণার কন্যার সাথে বিবাহ সম্পন্ন হয়।

প্রিয়তমাকে লাভ করার পর সম্রাট ফরোখশিয়ার ডাঃ হ্যামিল্টনের প্রতি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে পড়েন এবং ইংরেজ বণিকদিগকে কোলকাতার দক্ষিণে হুগলী নদীর উভয় তীরবর্তী আটত্রিশটি গ্রাম দান করেন। তার নামমাত্র বার্ষিক খাজনা নির্ধারিত হয় মাত্র আট হাজার একশ' একুশ টাকা। সম্রাটের নিকটে এতকিছু লাভ করার পরও মুর্শিদ কুলী খানের ভয়ে তারা বিশেষ কোন সুবিধা করতে পারেনি।

সুজাউদ্দীন

১৭২৫ সালে মুর্শিদ কুলীর মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা সুজাউদ্দীন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদারের পদ অলংকৃত করেন। তাঁর আমলে ইংরেজরা ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতি করে এবং তাদের ঔদ্ধত্যও বহুগুণে বেড়ে যায়। হুগলীর ফৌজদার একবার ন্যায়সংগত কারণে ইংরেজদের একটি মাল বোঝাই নৌকা

আটক করেন। একথা জানতে পেরে ইংরেজরা একদল সৈন্য পাঠিয়ে প্রহরীদের কাছ থেকে নৌকা কেড়ে নিয়ে যায়। তাদের এ ঔদ্ধত্যের জন্যে সুবাদার তাদেরকে শাস্তিদানের কথা চিন্তা করছিলেন। কোম্পানীর ধূর্ত কুঠিয়াল তা জানতে পেরে তাড়াতাড়ি অপরাধ স্বীকার করে মোটা রকমের জরিমানা দিয়ে ক্ষমাপ্রার্থী হয়। এভাবে তারা রক্ষা পায়।

সরফরাজ খান

সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সরফরাজ খান সুবাদার নিযুক্ত হন। নাদির শাহের ভারত আক্রমণ তাঁর সময়ে হয়েছিল।

আলীবর্দী খান

সরফরাজ খান ছিলেন অযোগ্য ও দুর্বলচিত্ত। তাঁর সেনাপতি আলীবর্দী খানের সংগে সংঘর্ষে নিহত হন এবং আলীবর্দী খান ১৭৪১ সালে বাংলার সুবাদার হন।

আলীবর্দী খানের সময় বার বার বাংলার উপর আক্রমণ চলে বর্গী দস্যুদের। তাদের দৌরাত্ম্য থেকে দেশকে রক্ষার জন্যে তিনি কয়েকবার ইংরেজ ও অন্যান্য বিদেশী বণিকদের কাছ থেকে মোটা অংকের অর্থ আদায় করেন। দেশের আর্থিক উন্নতিকল্পে তিনি ব্যবসা বাণিজ্যে উৎসাহ দান করতেন।

বহু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও বর্গীদস্যুরা একবার প্রবেশ করে লুঠতরাজ ও হত্যাকান্ড চালায়। জলপথে আগমনকারী বর্গীদস্যুদের দমন করার জন্যে আলীবর্দী খান ইংরেজদের সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজনবোধ করছিলেন। কারণ নৌশক্তি বলতে বাংলার কিছুই ছিলনা। পক্ষান্তরে ইংরেজদের ছিল শক্তিশালী নৌবহর। আলীবর্দীর প্রধান সেনাপতি একবার ইংরেজদের মতো ক্রমবর্ধমান এক অশুভ শক্তিকে দেশ থেকে বিতাড়িত করার পরামর্শ দেন। তদুত্তরে বৃদ্ধ আলীবর্দী বলেন যে, একদিকে বর্গীরা স্থলপথে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে। আবার ইংরেজদের ক্ষুব্ধ করলে তারা সমুদ্রপথে আগুন জ্বালাবে যা নির্বাপিত করার ক্ষমতা বাংলার নেই। আলীবর্দীর বার্ধক্য এবং পরিস্থিতির নাজুকতার সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা পাকাপোক্ত হয়ে বসে এ দেশে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠালাভের পরিকল্পনা গ্রহণ করে, যার পরিসমাপ্তি ঘটে পনেরো বৎসর পরে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে।

সিরাজদ্দৌলা

সতেরোশত ছাপ্পান্ন খৃষ্টাব্দে সুদীর্ঘকাল শয্যাশায়ী থাকার পর আলীবর্দী মৃত্যুবরণ করেন এবং সিরাজদ্দৌলা তাঁর উত্তরাধিকারী হন। তাঁর সিংহাসন অরোহণের পর আলীবর্দী-কন্যা ঘেসেটি বেগম ও তাঁর অপর দৌহিত্র পুর্ণিয়ার শাসনকর্তা শওকত জং-এর সকল ষড়যন্ত্র তিনি দক্ষতার সাথে বানচাল করে দেন। আলীবর্দী খানের মৃত্যুর পর সিরাজদ্দৌলার সিংহাসন আরোহণ করার সাথে সাথেই ঘেসেটি বেগম বিশ হাজার সৈন্যকে তাঁর দলে ভিড়াতে সক্ষম হন এবং মুর্শিদাবাদ অভিমুখে রওয়ানা হন। সিরাজদ্দৌলা ক্ষিপ্রতার সাথে ঘেসেটি বেগমের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করেন ও বেগমকে রাজপ্রাসাদে বন্দী করেন। অপরদিকে শওকত জং নিজেকে বাংলার সুবাদার বলে ঘোষণা করলে যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলা কর্তৃক নিহত হন।

ঘেসেটি বেগম ও শওকত জং-এর বিদ্রোহে নওয়াজেশ মুহাম্মদের দেওয়ান রাজবল্লভ ইন্ধন যোগাচ্ছিল। সিরাজদ্দৌলা তা জানতে পেরে রাজবল্লভের কাছে হিসাবপত্র তলব করেন। ঢাকার শাসনকর্তা নওয়াজেশ মুহাম্মদের অধীনে দেওয়ান হিসাবে রাজস্ব আদায়ের ভার তার উপরে ছিল। আদায়কৃত বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করেছিল বলে হিসাব দিতে অপারগ হওয়ায় নবাব সিরাজদ্দৌলা রাজবল্লভের ঢাকাস্থ ধনসম্পদ আটক করার আদেশ জারী করেন। অবস্থা বেগতিক দেখে রাজভল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ আদায়কৃত রাজস্ব ও অবৈধভাবে অর্জিত যাবতীয় ধনসম্পদসহ গঙ্গাস্নানের ভান করে পালিয়ে গিয়ে ১৭৫৬ সালে কোলকাতায় ইংরেজদের আশ্রয় গ্রহণ করে। সিরাজদ্দৌলা ধনরত্নসহ পলাতক কৃষ্ণবল্লভকে তাঁর হাতে অর্পণ করার জন্যে কোলকাতার গভর্ণর মিঃ ড্রেককে আদেশ করেন। ভারতের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ধনকুবের ও রাজ্যের মধ্যে অতি প্রভাবশালী হিন্দুপ্রধান মাহতাব চাঁদ প্রমুখ অন্যান্য হিন্দু বণিক ও বেনিয়াদের পরামর্শে ড্রেক সিরাজদ্দৌলার আদেশ পালন করতে অস্বীকার করে। তারপর অকৃতজ্ঞ ক্ষমতালিপ্সু ইংরেজগণ ও তাদের দালাল হিন্দু প্রধানগণ সিরাজদ্দৌলাকে ক্ষমতাচ্যুত করে চিরদিনের জন্যে মুসলিম শাসন বিলুপ্ত করার যে ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করে তা চূড়ান্তভাবে কার্যকর হয়— পলাশীর ময়দানে। পলাশীর যুদ্ধ, তার পটভূমি ও সিরাজদ্দৌলার পতন সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমাদের জানা দরকার তৎকালে বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা কি ছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলার মুসলিম শাসন বিলুপ্তির পশ্চাৎ পটভূমি

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর ভারতীয় মুসলমানদের জীবনে নেমে এসেছিল চরম দুর্যোগ। নামেমাত্র একটি কেন্দ্রীয় শাসন দিল্লীতে অবশিষ্ট থাকলেও তা ছিল অত্যন্ত দুর্বল যার সুযোগে বিভিন্ন স্থানে মুসলমান শাসকগণ একপ্রকার স্বাধীনতা ভোগ করছিলেন। তাঁরা তাঁদের এ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনসাধারণ, জমিদার-জায়গীরদার ও ধনিক-বণিক শ্রেণীর সন্তুষ্টি সাধনের আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ফলে তাঁরা হয়ে পড়েছিলেন স্বভাবতঃই হীনমন্যতার শিকার। সুযোগ সন্ধানী বিজিত জাতি এ সুযোগে মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস ও তামাদ্দুনিক ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের সাহস পায়। বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের অনুবাদ, প্রচার ও প্রসার, শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তন, বৈষ্ণব সমাজের নোংরা, অশ্লীল ও যৌন উত্তেজনামূলক ক্রিয়াকলাপ মুসলমান সমাজকে অধঃপতনের অতল তলে নিমজ্জিত করে দেয়। শত্রুকে সম্মুখ সমরে পরাজিত করার উপায় না থাকলে তার ধর্মবিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারলে তাকে সহজেই পরাজিত করা যায়। ভারতের এবং বিশেষ করে বাংলার সুচতুর হিন্দুজাতি তাদের কয়েক শতাব্দীর পুঞ্জিভূত বিক্ষোভের প্রতিশোধ এভাবেই নিয়েছে। উপরন্তু ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে তারা মুসলিম জাতির অধঃপতন ত্বরান্বিত করে তাদের অভীষ্ট সাধনের জন্যে তাদেরই একান্ত মনঃপূত নামধারী একজন মুসলমানকে নির্বাচন করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছে। এই কাঠপুত্তলিকার দ্বারা তারা তাদের স্বার্থ ষোলআনা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। তার সাথে ইসলামী ঈমান আকীদাহ্‌র মধ্যে কুফর ও পৌত্তলিকতার অনুপ্রবেশ এবং মুসলিম সংস্কৃতির উপর হিন্দুজাতির প্রাধান্য মুসলমানদেরকে তাদের মানসিক গোলামে পরিণত করেছে। তার অতি স্বাভাবিক পরিণাম যা হবার তাই হয়েছে।

ডঃ এ, আর, মল্লিক তাঁর গ্রন্থে মন্তব্য করেন ঃ

"Thus long years of association with a non-Muslim people

who far outnumbered them, cut off from original home of Islam, and living with half converts from Hinduism, the Muslims had greatly deviated from the original faith and had become Indianised. This deviation from the faith apart, the Indian Muslims in adopting the caste system of the Hindus, had given a disastrous blow to the Islamic conception of brotherhood and equality in which their strength had rested in the past and presented thus in the 19th century the picture of a disrupted society, degenerate and weakened by division and sub-division to a degree, it seemed, beyond the possibility of repair. No wonder, Sir Mohammad Iqbal said, surely we have out-Hindued the Hindu himself,—we are suffering from a double caste system—religious caste system, sectarian and social caste system—which we have either learned or inherited from the Hindus. This is one of the quiet ways in which the conquered nation revenged themselves on their conquerors." (British Policy and the Muslims in Bengal— A. R. Mallick)

—"মুসলমানগণ ইসলামের মূল উৎসকেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতের আধা ধর্মান্তরিত মুসলমানসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলমানদের সাথে বহু বৎসর যাবত একত্রে বসবাস করে মূল ধর্মবিশ্বাস থেকে সরে পড়েছিল এবং হয়ে পড়েছিল ভারতীয়। অধিকন্তু এই ভারতীয় মুসলমানগণ হিন্দুদের বর্ণপ্রথা অবলম্বন করে— অতীতে যে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের মধ্যে তাদের শক্তি নিহিত ছিল— তার প্রতি চরম আঘাত হানে। ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে তারা বহু ভাগে বিভক্ত, ছিন্নভিন্ন ও অধঃপতিত জাতি হিসাবে চিত্রিত হয়, যার সংশোধনের কোন উপায় থাকে না। তাই স্যার মুহাম্মদ ইকবালের এ উক্তিতে বিস্ময়ের কিছু নেই ঃ নিশ্চিতরূপে আমরা হিন্দুদেরকে ছাড়িয়ে গেছি। আমরা দ্বিগুণ বর্ণপ্রথার রোগে আক্রান্ত—ধর্মীয় বর্ণপ্রথা, ফের্কা-উপফের্কা এবং সামাজিক বর্ণপ্রথা, যা আমরা শিক্ষা করেছি, অথবা হিন্দুদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। যেসব নীরব পন্থায় বিজিতগণ বিজেতাদের প্রতিশোধ গ্রহণ করে থাকে, এ হলো তার একটি।"

এ এক অনস্বীকার্য সত্য যে, বাংলা তথা ভারতের হিন্দুজাতি মুসলিম শাসন কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। তাই তারা মুসলিম সংহতি সমূলে ধ্বংস করার জন্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নীরবে কাজ করে গেছে। তাদের প্রচেষ্টায় তারা পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে। মুসলমানদেরকে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে ও তাদের তাহ্জিব তামাদ্দুনে পৌত্তলিকতার কলুষ কালিমা লেপন করেছে। তাদেরকে হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত না করে হিন্দু ভাবাপন্ন মুসলমান বানিয়ে তাদের দ্বারা হিন্দুস্বার্থ চরিতার্থ করা যে অতিসহজ– এ তত্ত্বজ্ঞান তাদের ভালো করেই জানা ছিল এবং এ কাজে তারা সাফল্য অর্জন করেছে পুরাপুরি।

মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

বাংলার মুসলমানদের অধঃপতন কোন্ কোন্ পথে নেমে এসেছিল এবং রংগমঞ্চের অন্তরাল থেকে কোন্ অশুভ শক্তি ইন্ধন যোগাচ্ছিল, তা সম্যক উপলব্ধি করতে হলে আমাদের জানতে হবে তৎকালে তাদের ধর্মবিশ্বাস, সমাজ ও সংস্কৃতি কতখানি বিকৃত হয়ে পড়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে বাংলার মুসলমানদের আকীদাহ্ বিশ্বাস, সমাজ ও সংস্কৃতিতে পৌত্তলিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল বাংলার শাসনকর্তা আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সময় থেকে। হিন্দু রেনেসাঁ আন্দোলনের ধারক ও বাহকদের দ্বারা পরিপূর্ণ ও পরিবেষ্টিত মন্ত্রীসভার দ্বারা পরিচালিত হোসেন শাহ শ্রীচৈতন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ঐতিহাসিকগণের বর্ণিত এ কথা সত্য হলে অতঃপর হোসেন শাহের তৌহিদের প্রতি বিশ্বাস কতটুকু ছিল তা সহজেই অনুমেয়। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় বৈষ্ণববাদের প্রবল প্লাবন বাংলার মানব সমাজকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমানকে সহজেই আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করেছিল হিন্দু তান্ত্রিকদের অপরাধমূলক অশ্লীল ও জঘন্য সাধন পদ্ধতি, বামাচারীদের পঞ্চতত্ত্ব অর্থাৎ যৌনধর্মী নোংরা আচার অনুষ্ঠান, বৈষ্ণবদের প্রেমলীলা প্রভৃতি। এসব আচার অনুষ্ঠান ও প্রেমলীলা হিন্দু সমাজের পবিত্রতা, রুচিবোধ ও নৈতিক অনুভূতি বহুলাংশে বিনষ্ট করলেও নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রা ভংগের এ অস্ত্র দ্বারাই মুসলমানের ধর্ম ও তামাদ্দুনকে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে। মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসে ঘুণ ধরিয়েছিল এ সময়ের মুসলিম নামধারী কবি-সাহিত্যিকগণ

যাদেরকে কাষ্ঠপুত্তলিকা হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন, বাংলা ভাষার উন্নয়নের নামে প্রকৃতপক্ষে হিন্দু রেনেসাঁ আন্দোলনের ধ্বজাবাহীগণ। দ্বিতীয় যুগের হিন্দু কবিগণকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে এসব মুসলিম কবিগণ হিন্দু দেব-দেবীর স্তুতিমূলক কবিতা, পদাবলী ও সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়। তারা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়লীলা, যৌন আবেদনমূলক কীর্তন, মনসার ভাসান সংগীত, দুর্গা ও গঙ্গার স্তোত্র ও হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে বহু পুঁথিপুস্তক রচনা করে।

শেখ ফয়যুল্লাহ 'গোরক্ষ বিজয়' নামক একখানি মহাকাব্য রচনা করে বাংলার নাথ সম্প্রদায় ও কোলকাতা কালীমন্দির প্রতিষ্ঠাতা গোরক্ষ নাথ ও তার নাথ মতবাদের স্তুতি কীর্তন করে। জাফর খান অথবা দরাফ খান হিন্দুধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়ে সংস্কৃত ভাষায় গঙ্গাস্তোত্র রচনা করে- (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ঃ দীনেশ চন্দ্র সেন)। অনুরূপভাবে আবদুস শুকুর ও সৈয়দ সুলতান শৈব ও তান্ত্রিক মতবাদে আকৃষ্ট হয়ে সাহিত্য রচনা করে। (গোলাম রসূল কর্তৃক প্রকাশিত শুকুর মাহমুদের পাঁচালি দ্রষ্টব্য)

কবি আলাউল ও মীর্জা হাফেজ যথাক্রমে শিব ও কালীর স্তবস্তুতি বর্ণনা করে কবিতা রচনা করে (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ঃ দীনেশ চন্দ্র সেন)। সৈয়দ সুলতান নবী বংশের তালিকায় ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শিব এবং কৃষ্ণকে সন্নিবেশিত করে— (ব্রিটিশ পলিসি ও বাংলার মুসলমান ঃ এ আর মল্লিক)। হোসেন শাহের আমলে সত্য নারায়ণকে সত্যপীর নাম দিয়ে মুসলমানগণ পূজা শুরু করে। পূর্বে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরোক্ত কবি-সাহিত্যিকগণের ধর্মমত ও জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে কিছু জানবার উপায় নেই। সাহিত্যক্ষেত্রে শুধু তাদের নাম পাওয়া যায়। হয়তো তারা ধর্মান্তরিত মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে মাত্র এবং পরিপূর্ণ হিন্দু পরিবেশে তাদের জীবন গড়ে উঠেছে। অথবা মুসলমান থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে হরিদাসের ন্যায় মুরতাদ হয়ে গেছে। তবে তাদের কবিতা, সাহিত্য, পাঁচালী, সংগীত প্রভৃতি তৎকালীন মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

পরবর্তীকালে ইসলাম-বৈরীগণ বাদশাহ আকবরকে তাদের অভীষ্ট সাধনে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। জয়পুরের রাজা বিহারীমলের সুন্দরী রূপসী কন্যা যোধবাই আকবরের মহিষী হিসাবে মোগল হারেমের শোভাবর্ধন করে। আকবরের একাধিক হিন্দু পত্নী ছিল বলে জানা যায়। তৎকালে হিন্দু রাজাগণ

আকবরের কাছে তাদের কন্যা সম্প্রদান করে তাঁকে তাঁদের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। এসব হিন্দু পত্নীগণকে রাজপ্রাসাদের মধ্যে মূর্তিপূজা ও যাবতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়। মুসলমান মোগল বাদশাহের শাহী মহল মূর্তিপূজা ও অগ্নিপূজার মন্দিরে পরিণত হয়। এভাবে আকবরের উপরে শুধু হিন্দু মহিষীগণই নয়, হিন্দু ধর্মেরও বিরাট প্রভাব পড়েছিল। এসব মহিষীর গর্ভে যেসব সন্তান জন্মগ্রহণ করে এহেন পরিবেশে জ্ঞানচক্ষু খুলেছে, পালিত-বর্ধিত হয়েছে, তাদের মনমানসিকতার উপরে পৌত্তলিকতার প্রত্যক্ষ প্রভাব কতখানি ছিল তা অনুমান করা কঠিন নয়। এর স্বাভাবিক পরিণাম হিসাবে আমরা দেখতে পাই, হিন্দু মহিষীর গর্ভজাত সম্রাট জাহাঙ্গীর দেওয়ালী পূজা করতেন এবং শিবরাত্রিতে ব্রাহ্মণ পন্ডিত ও যোগীদেরকে তাঁর সাথে একত্রে নৈশভোজে নিমন্ত্রিত করতেন। তাঁর শাসনের অষ্টম বৎসরে আকবরের সমাধি সৌধ সেকেন্দ্রায় হিন্দু মতানুসারে পিতার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান পালন করেন।

শাহজাহান পুত্র দারা শিকোহ্ তাঁর রচিত গ্রন্থ 'মাজমাউল বাহ্‌রাইনে' হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আলীবর্দী খানের ভ্রাতুষ্পুত্র শাহামত জংগ এবং সাওলাত জং মতিঝিল রাজপ্রাসাদে সাতদিন ধরে হোলিপূজার অনুষ্ঠান পালন করেন। এ অনুষ্ঠানে আবির ও কুমকুম স্তূপীকৃত করা হয়। মীর জাফরও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ হোলির অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন। কথিত আছে যে, মীর জাফর মৃত্যুকালে কীরিটেশ্বরী দেবীর পদোদক (মূর্তি ধোয়া পানি) পান করেন। ('ব্রিটিশ পলিসি ও বাংলার মুসলমান' ঃ এ আর মল্লিক; 'মুসলেম বংগের সামাজিক ইতিহাস' ঃ মওলানা আকরাম খাঁ)

হোলি বলতে গেলে শ্রীকৃষ্ণের দোল উৎসব। শ্রীকৃষ্ণের অবতার শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণববাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। তাদের পূজা অনুষ্ঠানের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের দোলউৎসব অন্যতম। অতএব বৈষ্ণববাদের প্রভাব যে মুসলিম সমাজের মূলে তখন প্রবেশ করেছিল, উপরের বর্ণনায় তা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়।

মুসলিম সমাজের এহেন ধর্মীয় অধঃপতনের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, মুসলিম সমাজে পৌত্তলিক ভাবধারা অনুপ্রবেশের প্রধানতম কারণ হলো ভারতীয় নও-মুসলিমদের পৌত্তলিক থেকে অর্ধমুসলমান. (Half-Conversion) হওয়া। অর্থাৎ একজন পৌত্তলিক ইসলামকে না বুঝেই

মুসলমান হয়।অতঃপর তার কোন ইসলামী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়নি। হয়নি তার চিন্তাধারার পরিশুদ্ধি। পৌত্তলিকতার অসারতা ও তার বিপরীত ইসলামের সত্যতা ও সৌন্দর্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভের সুযোগ তার হয়নি। ইসলামী পরিবেশের মধ্যে জীবনযাপন করে আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র ও মনমানসিকতার পরিবর্তন ও সংশোধন হয়নি। তাই এ ধরনের মুসলমান হিন্দুর দুর্গোৎসবের অনুকরণে মহররমের অনুষ্ঠান পালন, দেওয়ালী-কালী পূজার অনুকরণে শবে বরাতে আলোকসজ্জা ও বাজীপোড়ানো প্রভৃতির মাধ্যমে হয়তো কিছুটা আনন্দ লাভের চেষ্টা করে। আকবর, জাহাঙ্গীর ও বাংলার পরবর্তী শাসকগণ প্রকাশ্যে হিন্দু পূজার অনুষ্ঠানে যোগদান করতে দ্বিধাবোধ করেননি।

ঐতিহাসিক এম. গ্রাসিন ডি ট্যাসিন বলেন, মহররমের তাজিয়া অবিকল হিন্দু দুর্গাপূজার অনুকরণ। দুর্গোৎসব যেমন দশ দিন ধরে চলে এবং শেষ দিন ঢাক-ঢোল বাদ্যবাজনাসহ পূজারিগণ প্রতিমাসহ মিছিল করতঃ তাকে নদী অথবা পুকুরে বিসর্জন দেয়, মুসলমানগণও অনুরূপভাবে দশ দিন ধরে মহররমের উৎসব পালন করে। শেষ দিন দুর্গা বিসর্জনের ন্যায় ঢাক-ঢোল বাজিয়ে মিছিল করে তাজিয়া পানিতে বিসর্জন দেয়া হয়।

ডাঃ জেমস্ ওয়াইজ মহররম উৎসবকে হিন্দুদের রথযাত্রা উৎসবের অনুরূপ বলে বর্ণনা করেছেন। মিসেস্ এইচ্ আলী বলেন, দীর্ঘদিন হিন্দুদের সংস্পর্শে থেকে মুসলমানগণ তাদের ধর্মীয় উৎসবগুলিকে হিন্দুদের অনুকরণে মিছিলের আকারে বাহ্যিক জাঁক-জমকপূর্ণ করে তুলেছে। ইউরোপীয়দের ন্যায় বিদেশী মুসলমানগণ বাংলার মুসলমানদের এ ধরনের ধর্মীয় উৎসবাদিকে ইসলামের বিকৃতকরণ ও অপবিত্রকরণ মনে করেছেন। (বৃটিশ পলিসি ও বাংলার মুসলমান ঃ এ আর মল্লিক)।

ইসলাম ও মুসলমানদের এহেন পতন যুগে পীরপূজা ও কবরপূজার ব্যাধি মুসলমান সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক এম. টি. টিটাসের মতে এ কুসংস্কার আফগানিস্তান, পারস্য ও ইরাক থেকে আমদানী করা হয়। হিন্দুদের প্রাচীন গুরু-চেলা পদ্ধতি এবং স্থানীয় বহু দেব-দেবীর পূজায় তাদের অদম্য বিশ্বাস মুসলিম সমাজকে এ কুসংস্কারে লিপ্ত হতে প্রেরণা যোগায়। তিনি বলেন, ইসলামের বাধ্যতামূলক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান অপেক্ষা বহুগুণ উৎসাহ উদ্যম সহকারে তারা পীরপূজা করে। অতীতে যে সকল অলীদরবেশ ইসলামের মহান

বাণী প্রচার করে গেছেন, পরবর্তীকালে অজ্ঞ মুসলমান তাঁদেরই কবরকে পূজার কেন্দ্র বানিয়েছে।

একমাত্র বাংলায় যেসব অলীদরবেশের কবরে মুসলমানগণ তাদের মনস্কামনা পূরণের জন্য ফুলশির্ণি ও নজর-নিয়াজ দিত, তার সংখ্যা ডাঃ জেমস ওয়াইজ নিম্নরূপ বলেন ঃ

সিলেটের শাহ জালাল, পাঁচ পীর, মুন্নাশাহ্ দরবেশ, সোনার গাঁয়ের খোন্দকার মুহাম্মদ ইউসুফ, মীরপুরের শাহ আলী বাগদাদী, চট্টগ্রামের পীর বদর, ঢাকার শাহ জালাল এবং বিক্রমপুরের আদম শহীদ। চট্টগ্রামে বায়েজিদ বুস্তামীর দরগাহ বলে কথিত, হয়তো একেবারে কল্পিত একটি দরগাহ আছে তা সম্ভবতঃ ডাঃ জেমস ওয়াইজের পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হয়েছে।

বাংলা বিহারে এ ধরনের বহু দরগার উল্লেখ—ব্লক্‌ম্যানের গ্রন্থে আছে।

সোনার গাঁয়ের হিন্দু মুসলমান উভয়ে পূজাপার্বণ করতো বলে কথিত আছে। কৃষক ভালো ধান্য-ফসল লাভ করলে কয়েক আঁটি ধান দরগায় দিয়ে আসতো। সকল প্রকার ব্যাধি ও বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে দরগায় চাউল ও বাতাসা দেয়া হতো।

ঢাকা শহরের পূর্বে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে একটি দরগায় কালো রঙ্গের একটি প্রস্তর রাখা ছিল যাকে বলা হতো কদম রসূল [নবীর (সা) পদচিহ্ন]। অদ্যাবধি তা বিদ্যমান আছে বলে বলা হয়। ডাঃ জেমস ওয়াইজ বলেন, গয়ার ব্রাহ্মণগণ তীর্থযাত্রীদেরকে বিষ্ণুপদ (বিষ্ণুর পদচিহ্ন) দেখিয়ে প্রচুর অর্থ রোজগার করে। অনুরূপভাবে দরগার মুতাওয়াল্লী গ্রামের অজ্ঞ ও বিশ্বাসপ্রবণ লোকদেরকে কদমরসূল দেখিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে।

আজমীরে খাজা মুঈনউদ্দীন চিশতীর (রহ) মাজারের গিলাফ সরিয়ে বেহেশতের দরজা (?) দেখিয়ে মাজারের দালালগণ জিয়ারতকারীদের নিকট থেকে প্রচুর অর্থ রোজগার করে।

এ ধরনের অসংখ্য অগণিত কবর ও দরগাহ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানে বিদ্যমান আছে, যেখানে আজো এক শ্রেণীর মুসলমান পূজাপার্বণ তথা শিরক বিদ্‌আত করে থাকে।

মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতিতে পৌত্তলিকতা ও বিধর্মী ভাবধারার অনুপ্রবেশ যতটুকু অবশিষ্ট ছিল, তা পরিপূর্ণ করে দেয় এক শ্রেণীর ভন্ড পীর-ফকীরের

দল। এমনকি ধর্মের নামে তারা বৈষ্ণব ও বামাচারী তান্ত্রিকদের অনুকরণে যৌন অনাচারের আমদানীও করে। মুসলমান নামে তারা যে মত ও পথ অবলম্বন করে তার উৎস যেহেতু বাংলার বৈষ্ণববাদ, সেজন্যে বৈষ্ণবদের আচার অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির কিঞ্চিৎ উল্লেখ এখানে প্রয়োজন মনে করি। মওলানা আকরাম খাঁ তাঁর 'মুসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থ থেকে কিঞ্চিৎ পাঠকগণকে পরিবেশন করছি।

"চৈতন্যদেব হইতেছেন বাংলার বৈষ্ণবদের চৈতন্য সম্প্রদায়ের পূজিত দেবতা। হিন্দুদের সাধারণ বিশ্বাস অনুযায়ী চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের একজন অবতার অথবা পরিপূর্ণ অর্থেই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। এই কারণেই তাঁহার ভক্তগণ, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সত্তা হইতে মানুষ চৈতন্যকে বাদ দিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণচৈতন্যে উন্নীত করে এবং অতি মারাত্মকভাবে কৃষ্ণের প্রেমলীলার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। ধর্মের নামে নেড়া–নেড়ী তথা মুন্ডিত কেশ বৈষ্ণব–বৈষ্ণবীদের মধ্যে যে জঘন্য যৌন অনাচারের স্রোত বহিয়া চলে, তাহা পুরাণে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের যৌন আবেগমূলক প্রণয়লীলার পুনরাবৃত্তি বা প্রতিরূপ ব্যতীত কিছুই নহে।

তান্ত্রিক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নির্দেশনা দিতেছেন যে, কলিকালে (বর্তমান যুগে) মদ্যপান শুধু সিদ্ধই নহে বরং অপরিহার্য্যভাবে তাহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সত্য, ত্রেতা ও দাপর যুগে মদ্যপানের রীতি প্রচলিত ছিল, তেমনি এই কলি যুগেও বর্ণধর্ম নির্বিশেষে তোমরা ইহা পান করিবে– (মহানির্বাণতন্ত্র, ৪র্থ উল্লাস, ৫৬ শৎ শ্লোক)।'

'মহাদেব গৌরীকে বলিতেছেন ঃ পাথরে বীজ বপন করিলে তাহার অংকুরিত হওয়া যেমন অসম্ভব, পঞ্চতত্ত্ব ব্যতীত পূজা উপাসনাও তেমনি নিষ্ফল। অধিকন্তু পঞ্চতত্ত্ব ব্যতীত পূজা উপাসনা করিলে পূজারীকে নানা বিপদ আপদ ও বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হয়— (মহানির্বাণতন্ত্র, ৫ম উল্লাস, ২৩–২৪ শ্লোক)।'

মহাদেবের নিজমুখে এ পঞ্চতত্ত্ব রহস্যের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে আমরা পাঠকগণকে আমন্ত্রণ জানাইতেছি ঃ

'হে আদ্যে, শক্তিপূজা পদ্ধতিতে অপরিহার্য্য করণীয় হিসেবে মদ্যপান মাংস, মৎস্য ও মুদ্রাভক্ষণ এবং সংগমের নির্দেশ দেয়া যাইতেছে।'

(মদ্যং মাংসং ততো মৎস্যং মৈথুনে মেরচ শক্তিপূজা বিবাবাদ্যে পঞ্চতত্ত্বং প্রকৃতিতম—মহানির্বাণতন্ত্র, ৫ম উল্লাস, ২২ শ্লোক।)

"আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ বামাচারী তান্ত্রিকদের এই পূজা পদ্ধতি সম্পর্কে লিখিতেছেন ঃ বামাচারীগণ বেদবিরুদ্ধ এই সকল মহা অধর্মের কার্যকে পরম ধর্মরূপে গ্রহণ করিয়াছে। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও যৌন সংগমের এক বিস্বাদ মিশ্রণকে তাহারা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করে। পঞ্চতত্ত্ব অর্থাৎ যৌন সংগমের ব্যাপারে প্রত্যেক পুরুষ নিজেকে শিব ও প্রত্যেক নারীকে পার্বতী কল্পনা করিয়া এবং প্রত্যেক নারী নিজেকে পার্বতী ও প্রত্যেক পুরুষকে শিব কল্পনা করিয়া. . . মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসাবেই সংগমে লিপ্ত হইতে পারে। ঋতুবতী স্ত্রীলোকের সহিত সংগম শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে। কিন্তু বামাচারীগণ তাহাদিগকে অর্থাৎ রজস্বলা স্ত্রীলোকদিগকে অতি পবিত্র জ্ঞান করে . . .।

"বামাচারীদের শাস্ত্র রুদ্রমংগলতন্ত্রে বলা হইয়াছে ঃ রজস্বলার সহিত সংগম পুষ্করে স্নানতুল্য, চন্ডালী সংগম কাশীযাত্রার তুল্য, চর্মকারিনীর সহিত সংগম প্রয়াগে স্নানের তুল্য, রজকী সংগম মথুরা যাত্রার তুল্য এবং ব্যাধ কন্যার সহিত সংগম অযোধ্যা তীর্থ পর্যটনের তুল্য।"

"যখন বামাচারীরা ভৈরবী চক্রে (নির্বিচারে অবাধে যৌনসম্ভোগের জন্য মিলিত নরনারীদের একটি চক্র) মিলিত হয়, তখন ব্রাহ্মণ–চন্ডালের কোন ভেদ থাকেনা। একদল নরনারী অন্যলোকের অগম্য একটি নির্জনস্থানে মিলিত হইয়া ভৈরবীচক্র নামে একটি চক্র রচনা করিয়া উপবেশন করে অথবা দন্ডায়মান হয়। এই কামুকদের সকল পুরুষ একজন স্ত্রীলোককে বাছিয়া লইয়া তাহাকে বিবস্ত্র করিয়া তাহার পূজা করে। অনুরূপ সকল নারী একজন পুরুষকে বাছিয়া বাহির করে এবং তাহাকে উলংগ করিয়া পূজা করে। পূজাপর্ব শেষ হওয়ার পর শুরু হয় উদ্দাম মদ্যপানের পালা। মদ্যপানের ফলে যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইলে পরিধানের সকল বস্ত্র ছুড়িয়া ফেলিয়া তাহারা সম্পূর্ণ উলংগ হইয়া পড়ে এবং যাহাকে যাহার ইচ্ছা তাহার সহিত এবং যতজনের সংগে সম্ভব ততজনের সংগে অবাধ যৌন সংগমে মাতিয়া উঠে— যৌন সংগী যদি মাতা, ভগ্নি অথবা কন্যাও হয় তাহাতেও তাহাদের কিছু যায় আসেনা। বামাচারীদের তন্ত্রশাস্ত্রে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, একমাত্র মাতা ব্যতীত যৌন সংগম হইতে অবশ্যই অন্য কোন নারীকে বাদ দিবেনা এবং কন্যা হউক অথবা ভগ্নি হউক আর সকল নারীর সংগেই যৌন কার্য করিবে। (জ্ঞান সংকলনীতন্ত্র ঃ মাতৃং

যোনিং পরিত্যজ্য বিহারেৎ সর্বযোনীষু)।—এসব বৈষ্ণবতান্ত্রিক বামাচারীদের আরও এত জঘন্য অশ্লীল ক্রিয়াকলাপ আছে যে তা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।" – (মুসলেম বংগের সামাজিক ইতিহাস, মওলানা আকরাম খাঁ।)

উপরে বর্ণিত জঘন্য ও নোংরা পরিবেশের প্রভাবে বাংলার তৎকালীন মুসলিম সমাজ ধর্মীয় ও নৈতিক অধঃপতন এবং সামাজিক ও তামাদ্দুনিক বিশৃংখলার এক অতি শোচনীয় স্তরে নেমে আসে। এ অধঃপতনের চিত্র পাঠক সমাজে পরিসফুট করে তুলে ধরতে হলে এখানে মুসলমান নামধারী মারফতী বা নেড়ার পীর–ফকীরদের সাধন পদ্ধতির উল্লেখ প্রয়োজন। এ ভন্ড ফকীরের দল বিভিন্ন সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। যথা আউল, বাউল, কর্তাভজা, সহজিয়া প্রভৃতি। এগুলি হচ্ছে হিন্দু বৈষ্ণব ও চৈতন্য সম্প্রদায়ের মুসলিম সংস্করণ যাতে করে সাধারণ অজ্ঞ মুসলমানদেরকে বিপথগামী করা যায়।

এদের মধ্যে বাউল সম্প্রদায় মনে হয় সর্বাপেক্ষা জঘন্য ও যৌনপ্রবণ। মদ্য পান, নারীপুরুষে অবাধ যৌনক্রিয়া এদের সকল সম্প্রদায়েরই সাধনপদ্ধতির মধ্যে অনিবার্যরূপে শামিল। তবে বাউলগণ উপরে বর্ণিত তান্ত্রিক বামাচারীদের ন্যায় যৌনসংগমকে যৌনপূজা বা প্রকৃতি পূজা রূপে জ্ঞান করে। তাদের এ যৌনপূজার মধ্যে 'চারিচন্দ্র ভেদ' নামে একটি অনুষ্ঠান পালন করতে হয়। একে তারা একটি অনিবার্য পবিত্র অনুষ্ঠান মনে করে। তাদের মতে মানুষ এ চারিচন্দ্র বা মানব দেহের নির্যাস যথা রক্ত, বীর্য, মল ও মুত্র পিতার অন্ডকোষ ও মাতার গর্ভ থেকে লাভ করে থাকে। অতএব এ চারিচন্দ্র বাইরে নিক্ষেপ না করে দেহে ধারণ করা কর্তব্য। বাউল বা নেড়ার ফকীরগণ এ চারিচন্দ্র সাধনের সাথে 'পঞ্চরস সাধন'ও করে থাকে। পঞ্চরস হচ্ছে তাদের ভাষায় কালো সাদা লাল হলুদ ও মুর্শিদবাক্য। এ চারবর্ণ যথাক্রমে মদ, বীর্য, রজঃ ও মলের অর্থজ্ঞাপক। আপন স্ত্রী অথবা পরস্ত্রীর সাথে সংগমের পর তারা মুর্শিদবাক্য পালনে এ চারবর্ণের পদার্থ ভক্ষণ করে থাকে।

শ্রদ্ধেয় মওলানা আকরাম খাঁ তাঁর উপরে বর্ণিত গ্রন্থে এসব বাউলদের সম্পর্কে বলেন ঃ

"কোরআন মজিদের বিভিন্ন শব্দ ও মূলতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা এই সমস্ত শয়তান নেড়ার ফকীরের দল দিয়াছে, তাহাও অদ্ভুত। 'হাওজে কাওসার' বলিতে তাহারা বেহেশতী সঞ্জীবনী সুধার পরিবর্তে স্ত্রীলোকের রজঃ বা ঋতুস্রাব বুঝে। যে

পূজাপদ্ধতিতে এ ঘৃণ্য ফকীরের দল বীর্য পান করে, তাহার সূচনায় বীজ মে আল্লাহ (মায়াযাল্লাহ, মায়াযাল্লাহ) অর্থাৎ বীর্যে আল্লাহ অবস্থান করেন— এই অর্থে 'বিসমিল্লাহ' শব্দ উচ্চারণ করে থাকে।....

"এই মুসলিম ভিক্ষোপজীবী নেড়ার ফকীরের দলের পুরোহিত বা পীরেরা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গোপিনীদের বস্ত্র হরণের অনুরূপ এক অভিনয়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। যখন পীর তাহার মুরীদানের বাড়ী তশরিফ আনে, তখন গ্রামের সকল যুবতী ও কুমার উত্তম বসনে সজ্জিত হইয়া, বৃন্দাবনের গোপিনীদের অনুকরণে একটি গৃহকক্ষে পীরের সহিত মিলিত হয়। নাটকের প্রথম অংকে এই সকল স্ত্রীলোক নৃত্যগীত শুরু করে। নিম্নে এই সখীসংগীতের গদ্যরূপ প্রদত্ত হইল ঃ

ও দিদি যদি শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসিতে চাও,
আর আত্মপ্রতারণা না করিয়া শীঘ্র আস,
দেখ, প্রেমের দেবতা আসিয়াছে।
আঁখি তোল, তাহার প্রতি তাকাও
গুরু আসিয়াছে তোমাদের উদ্ধারের জন্য
এমন গুরু আর কোথাও পাইবে না।
হ্যাঁ, গুরুর যাহাতে সুখ
তাহা করিতে লজ্জা করিও না–।

'গানটি গীত হইলে পর এ সমস্ত নারী তাহাদের গাত্রাবরণ খুলিয়া ফেলিয়া, সম্পূর্ণ উলংগ হইয়া পড়ে এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। পীর এখানে কৃষ্ণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং শ্রীকৃষ্ণ যেমন গোপিনীদের বস্ত্র হরণ করিয়া বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেও তদ্রূপ এই সমস্ত উলংগ নারীর পরিত্যক্ত বস্ত্র তুলিয়া লইয়া গৃহের একটি উঁচু তাকে রক্ষা করে। এই পীর–কৃষ্ণের যেহেতু বাঁশী নাই, তাই সে নিম্নোক্তভাবে মুখে গান গাহিয়াই এইসব উলংগ রমণীদিগকে যৌনভাবে উত্তেজিত করিয়া তোলে ঃ

'হে যুবতীগণ। তোমাদের মোক্ষের পথ ভক্তকুলের পুরোহিতকে অর্ঘস্বরূপ দেহদান কর।'

কোনরূপ সংকোচ বোধ না করিয়া পীরের যৌন লালসা পরিতৃপ্ত করাই ইহাদের প্রধান ধর্মীয় কর্তব্য, তাহা বলাই বাহুল্য।" (মুসলেম বংগের সামাজিক ইতিহাস)

যৌনক্রিয়া, আনন্দদায়ক ও সুখকর বস্তু সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষ অবৈধ যৌনসংগমে ভীত শংকিত হয়, লজ্জাসংকোচ অনুভব করে— পাপের ভয়ে, ধর্মের ভয়ে। কিন্তু ধর্ম স্বয়ং যদি ঘোষণা করে যে, এ কাজ পাপের নয়, পুণ্যের এবং এতেই মোক্ষলাভ হয়ে থাকে, তাহলে মানুষ এ পথে আকৃষ্ট হবে না কেন? একশ্রেণীর লম্পট পাপাচারী লোক ধর্মের নামে এভাবে অজ্ঞমূর্খ মানুষকে ফাঁদে ফেলে প্রতারিত ও বিপথগামী করেছে।

উপরে বর্ণিত ভন্ড পীর-ফকীর দলের আরও বহু অপকীর্তি ও অশ্লীল ক্রিয়াকান্ড আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উপরে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হলো। এর থেকে তৎকালীন মুসলিম সমাজের ধর্মীয় ও নৈতিক অধঃপতন পাঠকবর্গ উপলব্ধি করতে পারবেন সন্দেহ নেই। যদিও গোটা মুসলিম সমাজের অধঃপতন এতটা হয়েছিল না, কিন্তু সমাজে পৌত্তলিক ও বৈষ্ণব মতবাদের প্রবল বন্যা-যে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিকে ভাসিয়ে নিয়ে তাদের সাথে একাকার করে দিচ্ছিল, তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা মুসলিম সমাজের ছিল না। কারণ, তৎকালীন মুসলিম শাসকদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন ছিল পৌত্তলিকতাবাদ ও বৈষ্ণববাদের প্রতি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এসবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ-প্রাচীর গড়ে তুলেছিল সাইয়েদ আহমদ শহীদের (রহ) ইসলামী আন্দোলন, ইতিহাসে যার ভ্রান্ত নাম দেয়া হয়েছে 'ওহাবী আন্দোলণ'। যথাস্থানে সে আলোচনা আসবে। সাইয়েদ তিতুমীর এবং হাজী শরিয়তুল্লাহও ওসবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। তথাপি ওসব গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার বিষক্রিয়া বিংশতি শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশক পর্যন্ত মুসলিম সমাজের একটা অংশকে জর্জরিত করে রেখেছিল। এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় ঈসায়ী ১৯১১ সালের আদমশুমারীর রিপোর্টে। এ রিপোর্টে বলা হয় যে, লোক গণনার সময় এমন কিছু সম্প্রদায়ের দেখা পাওয়া গেছে, যারা নিজেরা স্বীকারোক্তি করেছে যে, তারা হিন্দুও নয় এবং মুসলমানও নয়। বরঞ্চ উভয়ের সংমিশ্রণ। (Census of India Report, 1911 A.D.)

কিন্তু কিছু সংখ্যক মুসলমানের পৌত্তলিক ভাবধারার রস এখনো সঞ্জীবিত রেখেছে বাংলা ভাষার কতিপয় বৈষ্ণববাদ ভক্ত ও পৌত্তলিক ভাবাপন্ন মুসলিম কবি। ভক্ত কবি লাল মামুদ তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি বৈষ্ণববাদের প্রতি এতটা বিশ্বাসী হয়ে পড়েন যে, একটি বট বৃক্ষমূলে তুলসী বৃক্ষ স্থাপন করে

রীতিমত সেবা-পূজা করতে থাকেন। যেদিন গোস্বামীপ্রভু লালুর আশ্রমে উপস্থিত হন, সেদিন নিম্নোক্ত গান গেয়ে প্রভুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

দয়াল হরি কই আমার
আমি পড়েছি ভব কারাগারে, আমায় কে করে উদ্ধার।
শত দোষের দোষী বলে, জন্ম দিলে যবন কুলে
বিফলে গেল দিন আমার।

তারপর আসে কবি লালন শাহের কথা। তাঁর কয়েকটি গান নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ 'পার কর, চাঁদ গৌর আমায়,বেলা ডুবিল
আমার হেলায় হেলায় অবহেলায় দিনত বয়ে গেল।
আছে ভব নদীর পাড়ি
নিতাই চাঁদ কান্ডারী। ....
ও চাঁদ গৌর যদি পাই, ও চাঁদ গৌর হে,
কুলে দিয়ে ছাই
ফকীর লালন বলে শ্রীচরণের দাসী হইব।'

উপরে কবি লাল মামুদ আক্ষেপ করে বলেন যে, মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করে তাঁর জীবন বিফল হলো। লালন শাহ বলেন, গৌর নিতাইকে পেলে মুসলমানী ত্যাগ করে তাঁর শ্রীচরণের সেবায় রত হবেন।

লালন শাহের কৃষ্ণপ্রেম সম্পর্কীয় গান ঃ

কৃষ্ণপ্রেম করব বলে, ঘুরে বেড়াই জনমভরে
সে প্রেম করব বলে ষোলআনা
এক রতির সাধ মিটল নারে।
রাধারাণীর ঋণের দায়
গৌর এসেছে নদিয়ায়
বৃন্দাবনের কানাই আর বলাই
নৈদে এসে নাম ধরেছে গৌর আর নিতাই।

মুসলিম সমাজের একশ্রেণীর পৌত্তলিকমনা লোক লালন শাহের মতবাদকে মুসলিম সমাজে সঞ্জীবিত রাখার চেষ্টায় আছে।

মুসলিম সমাজের এহেন অধঃপতনের কারণ বর্ণনা করে ঐতিহাসিকগণ মন্তব্য করেন ঃ

"পৃথিবীর অন্যান্য বিজয়ী জাতিসমূহ যেমন বিজিত জাতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে তেমন ভারতীয় মুসলমানগণও বিজিত হিন্দুজাতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। আচার-আচরণ, জীবনের দৃষ্টিভংগী এবং এমনকি বিশ্বাসের দিক দিয়েও এ প্রভাব এখনো সুস্পষ্ট। ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া গোটা মুসলিম শাসন আমলে চলেছে। বিভিন্ন সময়ে এ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বেগ মুসলিম শাসকদের উদারনীতির ফলে বর্ধিত হয়েছে। তার ফলস্বরূপ উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতে ইসলাম এমন এক রূপ ধারণ করে যার জন্যে ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ভারতীয় মুসলমানগণ, বিশেষ করে বাংলা ও বিহারের মুসলমান তাঁদের ধর্মবিশ্বাসের সাথে এমন সব কুফরী আচার-আচরণ অবলম্বন করেছে, তা ছিল অন্যান্য দেশের মুসলমানদের মধ্যে বিরল। বাংলা-বিহারে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল যেমন বিরাট, তাদের রীতিনীতি ও আচার-আচরণও ছিল তেমনি ধর্মহীন ও নীতি বিগর্হিত।"- ('ব্রিটিশ পলিসি ও বাংলার মুসলমান'ঃ এ আর মল্লিক)।

"ভারতীয় ইসলামের মধ্যে অনৈসলামিক রীতিপদ্ধতি অনুপ্রবেশের কারণ হচ্ছে এই যে, অমুসলমানদের ধর্মান্তরগ্রহণ ছিল অপূর্ণ।" ('ভারতের ইতিহাস'- ইলিয়ট ও ডাউসন) ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার এক চিত্র উপরে বর্ণনা করা হলো। তৌহিদের অনুসারী মুসলমান যখন এমনি বিকৃতির বেড়াজালে আবদ্ধ এবং তখন ভিতর ও বাইর থেকে যে বিরুদ্ধ শক্তি তাদেরকে পরাভূত ও নিশ্চিহ্ন করার জন্যে সাঁড়াশি আক্রমণ চালায়, সে আক্রমণ প্রতিহত করার কোন প্রাণশক্তি তখন বিদ্যমান ছিল না। যাদের মাত্র সতেরো জন এককালে বাংলার উপরে রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল, কয়েক শতাব্দী পরে তাদের লক্ষ লক্ষ জন মিলেও সে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা রক্ষা করতে পারলো না।

বাংলার পতনের রাজনৈতিক কারণ

অষ্টাদশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয় ও বাংলার পতন কোন একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার ফল নয়। যেসব রাজনৈতিক ঘটনাপুঞ্জের ফল স্বরূপ

পলাশীর বিয়োগান্ত নাটকের সমাপ্তি ঘটে, তা সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের অবশ্য জেনে রাখা উচিত। প্রকৃতপক্ষে মোগল সাম্রাজ্যের পতন গোটা উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের পতন ডেকে আনে। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ্ আওরংজেবের মৃত্যুর পর থেকে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত পঞ্চাশ বৎসরে কমপক্ষে সাত জন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাদের মধ্যে কারো এ যোগ্যতা ছিল না যে পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেন। অবশ্য কতিপয় অবিবেচক ঐতিহাসিক আওরংজেবকে মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের জন্যে দায়ী করেন। ইতিহাসের পুংখানুপুংখ যাচাই-পর্যালোচনা করলে এ সত্যটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ধ্বংসের বীজ বহু পূর্বেই স্বয়ং বাদশাহ আকবর কর্তৃক বপন করা হয়েছিল এবং তা ধীরে ধীরে একটি বিরাট বিশাল মহীরুহের আকার ধারণ করছিল। আওরংজেব সারাজীবন ব্যাপী তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে সে ধ্বংসকে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারীগণ যদি তাঁর মতো শক্তিশালী ও বিচক্ষণ হতেন— তাহলে সম্ভবতঃ ভারতের ইতিহাস অন্যভাবে রচিত হতো। শ্রদ্ধেয় আকরাম খাঁ তাঁর 'মুসলেম বংগের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে মন্তব্য করেন ঃ

"আকবরের রাজত্বকালের সকল অপকর্মের পরিণাম ভোগ তাঁহার মৃত্যুর সাথেই শেষ হইয়া যায় নাই। মোগল সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁহার সকল উত্তরাধিকারীকে জীবনের যথাসর্বস্ব দিয়া এই অপকর্মের ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল। ভারতের দশ কোটি মুসলমান আজ পর্যন্ত আকবরের অপকর্মের দরুন ক্ষতিপূরণের অবশিষ্ট উত্তরাধিকার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পায় নাই। মুসলমান পাঠকদের নিকট এই উত্তরাধিকারের প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত কোন আলোচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করিনা।"

বলতে গেলে আকবর ছিলেন নিরক্ষর অথবা অতি অল্প শিক্ষিত। পনেরো-ষোল বৎসর বয়সে তিনি সিংহাসন লাভ করেন। একটি নিরক্ষর বালক যুবরাজের পক্ষে শত্রু পরিবেষ্টিত দিল্লীর রাজশাসন পরিচালনা কিছুতেই সম্ভব হতো না, যদি অতি বিচক্ষণ ও পারদর্শী বাইরাম খান, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য না করতেন। সৎ সংসর্গ লাভের অভাবে আকবর বিরাট সাম্রাজ্য লাভের পর স্বভাবতঃই ভোগ বিলাস, উচ্ছৃংখলতা ও নৈতিক অধঃপতনের মধ্যে নিমজ্জিত হন। বাইরাম খান তাঁকে সকল প্রকার চেষ্টা করেও

সুপথে আনতে পারেননি। মদ্যপান ও তার স্বাভাবিক আনুষংগিক পাপাচার এবং তাঁর আশাতীত রাজনৈতিক সাফল্য তাঁর চরিত্র গঠন বা সংশোধনের কোন সুযোগই দেয়নি। কিন্তু তার এই ব্যাধিগ্রস্ত প্রতিভা তাঁর ভবিষ্যৎ বংশধর ও মুসলিম জাতির কোন কল্যাণ সাধন করার পরিবর্তে অকল্যাণ ও ধ্বংসের বীজ বপন করে গেছে। মুসলমানদের তামাদ্দুনিক ও রাজনৈতিক জীবনের সকল শক্তি নিঃশেষ করে দিয়ে তাদেরকে অপরের রাজনৈতিক ও মানসিক গোলামে পরিণত করার জন্যে ভারতের হিন্দু মানসিকতা নীরবে ও অব্যাহত গতিতে যে কাজ করে যাচ্ছিল, আকবরের তীক্ষ্ণ অথচ অসুস্থ প্রতিভা তার পূর্ণ সহায়ক হয়েছে। ভারতে তাঁর রাজনৈতিক শক্তি অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে আকবর হিন্দুদের সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়েই ক্ষান্ত হননি, বরঞ্চ তাদের মনস্তুষ্টির জন্যে 'দ্বীনে এলাহী' নামে এক উদ্ভট ধর্মীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলমানদের ধর্ম ও তামাদ্দুনকে ধ্বংস করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। আকবরনামায় এর বিস্তারিত বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়।

মজার ব্যাপার এই যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রয়োজনে আকবরের জীবনের বৃহত্তম স্বপ্নসাধ এই স্বকপোলকল্পিত 'দ্বীনে এলাহী' হিন্দু জাতিকে মোটেই আকৃষ্ট করতে পারেনি। একমাত্র বীরবল ব্যতীত কেউ এ নবধর্মমত গ্রহণে সম্মত হননি। তাঁর দরবারের নবরত্নের মধ্যে অন্যতম রত্নাবলী মানসিংহ ও তোডরমল এ ধর্মমত প্রত্যাখ্যান করেছেন। আকবর কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা জড়িত করে চন্দন চর্চিত দেহে হিন্দু সন্যাসীর বেশে দরবারে উপস্থিত হলে হিন্দুপন্ডিত ও সভাসদগণ 'দিল্লীশ্বরো' বা 'জগতীশ্বরো' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করতেন এবং ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত করে তাঁর প্রতি কৃত্রিম আনুগত্য প্রদর্শন ও শ্রদ্ধা নিবেদন করলেও তাঁর উদ্ভট ধর্মের প্রতি কণামাত্র আনুগত্য প্রকাশ করেননি। অতএব কোন এক চরম অশুভ শক্তি শুধুমাত্র মুসলমানদের তৌহিদী আকীদাহ্ বিশ্বাস ও ইসলামী তামাদ্দুন ধ্বংসের জন্যে আকবরের প্রতিভাকে ব্যবহার করেছে, তা বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই সহজে উপলব্ধি করতে পারেন। কিন্তু আকবর তাঁর জীবনের স্বপ্নসাধ বাস্তবায়িত করতে চরমভাবে ব্যর্থ হন।

এ তো গেল তাঁর জীবনের একদিক। তাঁর রাজনৈতিক জীবনেও এসেছিল চরম ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের গ্লানি।

আকবর ভারতের তদানীন্তন পাঠানশক্তি তথা দুর্ধর্ষ মুসলিম সামরিক শক্তি ধ্বংস করেছিলেন। এ বিধ্বস্ত সামরিক শক্তির বিকল্প কোন মুসলিম শক্তি গড়ে তোলা তো দূরের কথা, যা অবশিষ্ট ছিল তাও দুর্বল ও নিঃশেষ করে ফেলেন। বাইরাম খান, আহসান খান, মুয়াজ্জম খান প্রভৃতির হত্যাকান্ডের মধ্যে আকবরের এ ধ্বংসাত্মক নীতির প্রকাশ পাওয়া যায়। এমনকি বহিরাগত বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের বিরুদ্ধেও তিনি দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। এমনিভাবে শত্রুর ইংগিতে তিনি আপন গৃহ স্বহস্তে আগুন লাগিয়ে ভস্মীভূত করেন। মোগল সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ বিপদের সময় কাজে লাগতে পারে এরূপ সকল শক্তি ও প্রতিভাকে ধ্বংস করে দেয়ার ফলে তিনি ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, পাশ্চাত্যের খৃষ্টান জাতিগুলি দ্রুত তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তার করে চলেছিল এবং তাদের অশুভ তৎপরতার ঢেউ মোগল সাম্রাজ্যের সীমান্তে এসে আঘাত করছিল। যে ইসলামের প্রাণশক্তি এসব তৎপরতা সাফল্যের সাথে রুখে দাঁড়াতে পারতো, তা আগেই ধ্বংস করেছেন। অতএব খৃষ্টানদের রাজনৈতিক স্বার্থের সাথে অসম্মানকর সন্ধি স্থাপনে এবং তাদের ধর্মের প্রতি সশ্রদ্ধ আনুগত্য করেও মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পথ রুদ্ধ করতে পারলেন না।

বৈদেশিক বিধর্মী শক্তির ন্যায় দেশের অভ্যন্তরেও যে হিন্দুশক্তি দ্রুত মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল, তাও আকবরের দৃষ্টির অগোচর ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক দিক দিয়ে তিনি হয়ে পড়েছিলেন ভারতের হিন্দুশক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। অতএব তাদেরকে তুষ্ট করার বিভিন্ন পথ অবলম্বন করেন। হিন্দু নারীগণকে মহিষীরূপে শাহীমহলে এনে তথায় মূর্তিপূজা ও অগ্নিপূজার নিয়মিত অনুষ্ঠান করেও মোগল সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারলেন না। সর্বশক্তিমান সত্তা পৃথিবী ও আকাশমন্ডলীর খোদাকে পরিত্যাগ করে অন্যান্য বিভিন্ন খোদার আশ্রয়প্রার্থী হয়েও কোন লাভ হলোনা।

ইসলাম ধর্মকে পুরাপুরি পৌত্তলিকতার ছাঁচে ঢেলে এবং হিন্দুধর্ম অক্ষুণ্ন রেখে 'দ্বীনে এলাহী' নামে নতুন এক ধর্মের ছায়াতলে ভারতের হিন্দু মুসলমানকে একজাতি বানাবার হাস্যকর পরিকল্পনাও তাঁর ব্যর্থ হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি যে মনমানসিকতার সৃষ্টি করে অশুভ উত্তরাধিকার রেখে গেলেন তা শুধু তাঁর সুযোগ্য পুত্র জাহাঙ্গীরই আঁকড়ে ধরেননি বরঞ্চ বিংশতি শতাব্দীর

শেষার্ধেও এক শ্রেণীর মুসলমান সে উত্তরাধিকার দ্বারা লালিত পালিত হচ্ছেন। মুসলিম ধর্মীয়, জাতীয় ও সাংস্কৃতিক অধঃপতনের এ এক চরম বেদনাদায়ক নিদর্শন সন্দেহ নেই।

জাহাঙ্গীর মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস ত্বরান্বিত করেন। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন হকিন্স আগ্রায় আগমন করলে তাকে রাজকীয় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাকে ঘনিষ্ঠ সহচর হিসাবে গ্রহণ করেন, খেতাব ও বৃত্তিদান করেন। বিবাহ করে ভারতে বসবাস করার ইচ্ছা পোষণ করলে শাহী মহলের একজন শ্বেতাংগী তরুণীর সাথে বিবাহের প্রস্তাব দেন।

শাহী মহলে খৃষ্টধর্মের এতখানি প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, কয়েকজন শাহজাদা খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হন এবং হকিন্সের নেতৃত্বে অন্যান্য খৃষ্টান প্রবাসীদের সাথে পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী পরিবেষ্টিত মিছিল সহকারে গীর্জায় গমন করতেন। জাহাঙ্গীর তাঁর ইউরোপীয় বন্ধুবান্ধবসহ সারারাত্রি শাহী মহলে মদ্যপানে বিভোর হয়ে থাকতেন। মোগল সাম্রাজ্যের সমাধি রচনার কাজ আকবর নিজেই করেছিলেন, তা আগেই বলা হয়েছে। অতঃপর তাঁর আদর্শহীন মদ্যপায়ী পুত্র জাহাঙ্গীর, স্যার টমাস রো ও তাঁর উপদেষ্টা ও গুরু সুচতুর কূটনীতিবিদ রেভারেন্ড ই. ফেবী মিলে এ সমাধি রচনার কাজ ত্বরান্বিত করেন। টমাস রো তাদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া মঞ্জুর করে নিতে জাহাঙ্গীরকে সম্মত করেন। সুরাটে প্রতষ্ঠিত কারখানাটির দ্বারা ইংরেজগণ শুধু বাণিজ্যিক সুবিধা লাভেরই সুযোগ পায়নি, বরঞ্চ এ কারখানাটি তাদের একটি শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হয়। শাহী সনদের শর্ত অনুযায়ী শুধু সুরাটেই নয়, মোগল সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও, যথা আগ্রা, আহমদাবাদ ও ব্রুচে ইংরেজদের কারখানা তথা সামরিক ঘাঁটি গড়ে উঠে। এভাবে আকবর ও জাহাঙ্গীর মোগল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে খাল খনন করে দূরদেশ থেকে সর্বগ্রাসী কুম্ভীর আমদানি করেন।

একদিকে বিদেশী শক্তি ইংরেজ ভারতে উড়ে এসে জুড়ে বসলো, অপরদিকে ভারতের হিন্দুশক্তিও প্রবল হয়ে উঠলো। রাজপুত এবং মারাঠা শক্তি মোগল সাম্রাজ্যের পরম শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। আকবর যে মুসলিম শক্তির ধ্বংস সাধন করেছিলেন, আওরংজেব পাদ্‌শাহ্ গাজী সেই লুপ্ত শক্তির পুনরুদ্ধারের জন্যে আজীবন সংগ্রাম করেন। মারাঠা ও রাজপুত শক্তি দমনে তাঁকে দীর্ঘদিন ধরে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। তাঁর পর যদি তাঁর উত্তরাধিকারীগণ শক্তিশালী ও বিচক্ষণ

হতেন, তাহলে হয়তো পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করা যেতো। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় এই যে, তাঁর মৃত্যুর পর থেকে আরম্ভ করে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত যাঁরাই দিল্লীর সিংহাসন অলংকৃত করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন শাসন কার্য পরিচালনায় অযোগ্য, বিলাসী ও অদূরদর্শী।

একথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের জন্যে একমাত্র আওরংজেবকেই দায়ী করেন। বাংলার হোসেন শাহ ও সম্রাট আকবরের উচ্চ প্রশংসায় যতটা তাঁরা পঞ্চমুখ, ততটা আওরংজেবের চরিত্রে কলংক লেপনে তাঁরা ছিলেন সোচ্চার। তাঁকে চরম হিন্দু বিদ্বেষী বলে চিত্রিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, তাঁর অনুসৃত হিন্দু স্বার্থের পরিপন্থী শাসননীতি এবং বিশেষ করে জিজিয়া প্রথার পুনঃপ্রবর্তন ভারতের হিন্দুজাতিকে মোগলদের শত্রুতা সাধনে বাধ্য করে। কিন্তু এ অভিযোগগুলি নিছক কল্পনাপ্রসূত ও দুরভিসন্ধিমূলক। ইতিহাস থেকে এর কোন প্রমাণ পেশ করা যাবে না। সত্য কথা বলতে গেলে, রাজপুত এবং মারাঠাগণ ভারতের মুসলিম শাসনকে কিছুতেই মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেনি। তাদের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও শত্রুতার মনোভাব লক্ষ্য করে আকবর তাদেরকে তুষ্ট করার জন্যে অতিশয় উদারনীতি অবলম্বন করেও ব্যর্থ হয়েছেন। শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাগণ আওরংজেবের চরম বিরোধিতা করেন। তিনি জিজিয়া কর প্রবর্তিত করার এক বৎসর পূর্বে, ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে শিবাজী মৃত্যুবরণ করেন। অতএব জিজিয়া করই হিন্দুজাতির বিরোধিতার কারণ ছিল, একথা মোটেই ন্যায়সংগত নয়।

একথা অনস্বীকার্য যে, তৎকালীন ভারতের ইতিহাস যাঁরা লিখেছিলেন তাঁরা সকলেই বলতে গেলে ছিলেন মুসলমান। তাই সে সময়ের প্রকৃত ইতিহাস জানতে হলে অধ্যয়নের প্রয়োজন হবে বাদাউনী, আকবরনামা, কাফীখান, তারিখে ফেরেশতা, মা'য়াসিরে আলমগীরী প্রভৃতি। কিন্তু ইউরোপীয় খৃষ্টান ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসের বহু ঘটনাকে বিকৃত করে পেশ করেছেন। পরবর্তীকালে অর্ধপৃথিবী জুড়ে তাঁদের সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করেছিল। সর্বত্র তাঁদের সাম্রাজ্য জুড়ে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রচলিত ছিল ইংরেজী ভাষা। এ ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতার ছত্রছায়ায় মুসলমানদের ইতিহাসের এক বিকৃত ও কল্পিত রূপ তাঁরা তুলে ধরেছেন ইংরেজী ভাষার ইতিহাসের ছাত্রদের

সামনে। ভারতে ইংরেজদের দু'শ বছরের শাসনকালে এ বিকৃত ও ভ্রান্ত ইতিহাস ছাত্রদের মনমস্তিষ্কে বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছিল।

এ বিকৃতকরণের কারণও ছিল। বাদশাহ্ আওরংগজেবের কথাই ধরা যাক। বাদশাহ্ আকবর ও জাহাঙ্গীর কর্তৃক ইংরেজদেরকে অন্যায়ভাবে অতিমাত্রায় প্রশ্রয় দানের ফলে মোগল সাম্রাজের বিরুদ্ধে তারা একটা শক্তি হিসাবে গড়ে উঠছিল। বাদশাহ আওরংগজেব তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর আমলে বাংলার মীর জুমলা ও নবাব শায়েস্তা খান বার বার ইংরেজদের ঔদ্ধত্য দমিত ও প্রশমিত করেছেন। ব্যবসায় দুর্নীতি, চোরাচালান, মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র প্রভৃতির কারণে তাদেরকে বার বার শাস্তিও দেয়া হয়েছে, তাদের কুঠি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এক পর্যায়ে বাদশাহ আওরংগজেব ইউরোপীয়দের সাথে তাদের সকল ব্যবসা নিষিদ্ধ করে এক ফরমান জারী করেন। আকবর যে মুসলিম সামরিক শক্তি ধ্বংস করে মোগল সাম্রাজ্যকে শত্রুর মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন, বাদশাহ আওরংগজেব সেই মুসলিম সামরিক শক্তি পুনর্গঠনে আজীবন চেষ্টা করেন। খৃষ্টান ও হিন্দুজাতির কাছে উপরোক্ত কারণে আওরংগজেব ছিলেন দোষী। তাই তাঁর শাসনকালকে কলংকময় করে চিত্রিত করতে এবং তাঁর নানাবিধ কুৎসা রটনা করতে তাঁরা তৎপর হয়ে উঠেন। অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে আলমগীর আওরংগজেবের চরিত্রে যেসব কলংক আরোপ করেছেন, ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদির দ্বারা তার সবটাই খন্ডন করেছেন শিবলী নো'মানী তাঁর "আওরংগজেব আলমগীর পর এক নজর" গ্রন্থে। এ সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যবহুল গ্রন্থখানিতে তিনি আওরংগজেবের বিরুদ্ধে উথাপিত অভিযোগগুলির সমুচিত জবাব দিয়েছেন।

অতএব ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে একথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যেতে পারে যে, আওরংগজেবের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের মধ্যে সত্যতার লেশমাত্র নেই। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের জন্যে তাঁকে কণামাত্র দায়ী করা যেতে পারে না। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আকবর কর্তৃক দুর্ধর্ষ মুসলিম সেনাবাহিনীর বিলোপ সাধনের পর ভারতের হিন্দু মারাঠা রাজপুতদের উপর তাঁর নির্ভরশীলতা, বৈদেশিক ও বিধর্মী ইংরেজদের ব্যবসার নামে রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয়, মুসলিম শাসন উৎখাতের জন্যে হিন্দু ও ইংরেজদের মধ্যে অশুভ আঁতাত এবং তার সাথে মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধঃপতন প্রভৃতি বাংলা তথা ভারত থেকে

মুসলিম শাসনের বিলোপ সাধন করেছিল। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখি কিভাবে পলাশী ক্ষেত্রে বাংলা-বিহারের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়ে ইংরেজ শাসনের গোড়াপত্তন করে।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইংরেজদের ব্যবসাকেন্দ্র গড়ে তোলার পিছনে বিরাট রাজনৈতিক অভিসন্ধি লুক্কায়িত ছিল। ব্যবসা বাণিজ্য করতে এসে একটা বিরাট সাম্রাজ্যের মালিক মোখতার হয়ে পড়া কোন আকস্মিক বা অলৌকিক ঘটনার ফল নয়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ভৌগলিক আবিষ্কারের ফলে আন্তর্জাতিক ব্যবসার পথ উন্মুক্ত হয় এবং ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। ফলে আমেরিকায় স্পেন সাম্রাজ্য, মশলার দ্বীপে ওলন্দাজ সাম্রাজ্য, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ফরাসী সাম্রাজ্য এবং দক্ষিণ এশিয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলন্ডের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতে অগ্রগতির নীতি (Forward Policy) অবলম্বন করে এবং যেসব বাণিজ্যিক এলাকায় তাদের প্রতিনিধিগণ বাস করতো তারা একটা রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হোক এ ছিল তাদের একান্ত বাসনা। ১৬৮২ খৃষ্টব্দে ইংরেজগণ ওলন্দাজদের নিকটে ইন্দোনেশিয়ায় মার খেয়ে সেখান থেকে পাততাড়ি গুটায়। পর বৎসর (১৬৮৩ খৃঃ) ইংলন্ডের রাজদরবার থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে যে সনদ দান করা হয় তার বলে তারা ভারতের যেকোন শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, সন্ধি করতে অথবা যেকোন চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারতো। দ্বিতীয় জেম্‌স কর্তৃক প্রদত্ত সনদে তাদেরকে অধিকতর ক্ষমতা দান করা হয়। এর ফলে তারা ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে পরাজয় বরণ করে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ক্যাপ্টেন হীথের নেতৃত্বে 'ডিফেন্স' নামক রণতরী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে ভারতে পাঠানো হয়। হীথ্ সুতানটি থেকে যুদ্ধের জন্যে অগ্রসর হয়ে ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়। এর ফলে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ কিছুটা দমে গেলেও ভারতে অবস্থানকারী প্রতিনিধিগণ নতুন উৎসাহ উদ্যমে কাজ করে যায়। তাদের দৃষ্টি এবার ফরাসী বণিকদের উপর নিবদ্ধ হয়। ফরাসীদের প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র ছিল পন্ডিচেরী এবং তার অধীনে মুসলিপট্টম, কারিকল, মাহে, সুরাট প্রভৃতি স্থানে তাদের কারখানা প্রতিষ্ঠিত ছিল। পক্ষান্তরে ইংরেজদের বাণিজ্যিক হেড কোয়ার্টার ছিল মাদ্রাজে এবং তার অধীনে বোম্বাই ও কলকাতায়, তাদের

গুরুত্বপূর্ণ কারখানা ছিল। এদের মধ্যে শুরু হয় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং শেষ পর্যন্ত তা যুদ্ধের আকার ধারণ করে। ফরাসীগণ তাদের মনোনীত ব্যক্তি মুজাফফর জং ও চান্দা সাহেবকে যথাক্রমে হায়দরাবাদ ও কর্ণেটিকের সিংহাসন লাভে সাহায্য করে। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ কর্ণাটকের রাজধানী আরকট দখল করে। এভাবে ইংরেজ অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠে।

বাংলায় ইংরেজদের রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের উচ্চাভিলাষ

বাংলায় রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ইংরেজগণ কোলকাতায় দুর্গ নির্মাণের কাজ ব্যাপকভাবে চালাতে থাকে। বাংলার নবাব আলীবর্দী খান তখন অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন এবং এই দুর্বলতার সুযোগে সুচতুর ইংরেজগণ তাদের দুর্গ নির্মাণের কাজ দ্রুততার সাথে করে যাচ্ছিল। আর তাদের এ কাজে সাহস ও উৎসাহ যোগাচ্ছিল বাংলার হিন্দু শেঠ ও বেনিয়া শ্রেণী। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ পর্যন্ত বাংলায় ইংরেজদের যে ব্যবসা দানা বেঁধে উঠেছিল, তার দালাল ও কর্মচারী হিসাবে কাজ ক'রে একশ্রেণীর হিন্দু প্রভূত অর্থশালী ও প্রভাবশালী হয়ে পড়েছিল। উপরন্তু তারা নবাব আমলে রাজস্ব প্রশাসনের বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদেও অধিষ্ঠিত ছিল। সুদী মহাজনী ও ব্যাংক ব্যবসার মাধ্যমেও তারা অর্থনীতি ক্ষেত্রে ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। তারা মুসলিম শাসন মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেনি। এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহের সাহসও তাদের ছিলনা এবং এটাকে তারা অবস্থার প্রেক্ষিতে সংগতও মনে করতোনা। তাই মুসলিম শাসনের অবসান ঘটাতে হলে ইংরেজদের সাহায্য সহযোগিতা ব্যতীত গত্যন্তর ছিলনা। ইংরেজরা এ সুবর্ণ সুযোগ ভালোভাবেই গ্রহণ করে। প্রশাসন ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে হিন্দুদের এতটা প্রভাব হয়ে পড়েছিল যে, তারা হয়ে পড়েছিল বাংলার নবাবদের ভাগ্যবিধাতা (Kingmakers)। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খানের মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্র সরফরাজ খানকে উত্তরাধিকার মনোনীত করা হলে হিন্দু প্রধানগণ বাধা দান করে। কারণ তাঁকে তারা তাদের স্বার্থের পরিপন্থী মনে করতো। তারা সরফরাজ খানের পিতা সুজাউদ্দীনকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর শাসন কালে (১৭২৭–৩৯ খৃঃ) এ সকল হিন্দু শেঠ বেনিয়াগণ প্রকৃতপক্ষে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের প্রধান উদ্যোক্তা হয়ে পড়ে। তাদের দলপতি আলম চাঁদ ও জগতশেঠ হয়ে পড়েছিল দেশের প্রকৃত শাসক (De facto ruler)।

সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর এ ষড়যন্ত্রকারী দলটি উড়িষ্যার নায়েব নবাব আলীবর্দী খানকে বাংলার সিংহাসন লাভে সাহায্য করে। তাঁর আমলে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র চরমে পৌছে। এ অবস্থার সুযোগে মারাঠাগণ বার বার বাংলার উপর চড়াও করে। বেগতিক দেখে আলীবর্দী খান এসব প্রাসাদ ষড়যন্ত্রকারীদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। তিনি তাঁদেরকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেন। ফলে রায় দুর্লভ রায়, মাহতাব রায়, স্বরূপ চাঁদ, রাজা জানকী রায়, রাজা রাম নারায়ণ, রাজা মানিক চাঁদ প্রভৃতির নেতৃত্বে এ দলটি অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে পড়ে। মুর্শিদকুলী খানের পর সম্ভ্রান্ত মুসলিম রাজকর্মচারীর সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে পেতে শূন্যের কোঠায় পৌছে এবং এ সময়ে কার্যতঃ তাদেরকে যবনিকার অন্তরালে নিক্ষেপ করা হয়। জগতশেঠ–মানিকচাঁদ দলটি শুধু নবাবের অধীনে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভেই সন্তুষ্ট ছিল না। এ সময়ে সারা ভারতে হিন্দুজাতির পুনর্জাগরণের প্রাণবন্যা প্রবাহিত হচ্ছিল। মারাঠা এবং শিখদের ন্যায় তারা কোন সামরিক শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি যার দ্বারা তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করতে পারতো। অতএব ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সংগে যোগসাজসে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটাতে পারলেই মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিহিংসার বহ্নি নির্বাপিত হয়।

জগৎশেঠ–মানিকচাঁদ চক্রের নেতৃত্বে বাংলার হিন্দুজাতির দু'টি লক্ষ্য ছিল। একটিরাজনৈতিক—অপরটি অর্থনৈতিক। বাংলার শাসন পরিবর্তন বা হস্তান্তরের দ্বারা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থকরণ এবং ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা লাভ। এ দু'টি লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে কোম্পানীর সংগে মৈত্রীবদ্ধ হতে তারা ছিল সদাপ্রস্তুত ও অত্যন্ত আগ্রহশীল।

পক্ষান্তরে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীও তাদের ব্যবসার প্রসার ও উন্নতিকল্পে হিন্দুদের কাছে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ ছিল। কারণ, তাদের ব্যবসা বাণিজ্য হিন্দু দালাল গোমস্তা ও ঠিকাদারদের সাহায্য ব্যতীত কিছুতেই চলতে পারতো না। উপরন্তু ১৭৩৬–৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কোলকাতায় তাদের মূলধন বিনিয়োগে ৫২ জন স্থানীয় বণিকের অংশ ছিল এবং তারা সকলেই হিন্দু। কাশিমবাজারের কারখানা স্থাপনে ২৫ জন হিন্দু বণিকের সাথে ছিল তারা সংশ্লিষ্ট। শুধু ঢাকায় তাদের ১২ জন অংশীদারের মধ্যে দু'জন ছিল মাত্র মুসলমান। (সিরাজউদ্দৌলার পতন—ডঃ মোহর আলী)

কোলকাতা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের সামরিক ইঞ্জিনিয়ার কর্ণেল স্কটের নিকট লিখিত এক পত্রে চার্লস্ এফ. নোবল বলেন যে,—হিন্দু রাজাগণ ও অধিবাসীবৃন্দ মুসলিম শাসনের প্রতি ছিল অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ। এ শাসনের অবসান কিভাবে ঘটানো যায়—এ ছিল তাদের গোপন অভিলাষ। ইংরেজদের দ্বারা কোন বিপ্লব সংঘটন সম্ভব হলে তারা তাদের সাথে যোগদান করবে বলে অভিমত প্রকাশ করে।

নোবল বলেন,— "উর্মিচাঁদ আমাদের বিরাট কাজে লাগবে বলে আমি মনে করি। হিন্দু রাজা ও জনসাধারণের উপর পুরোহিত নিমু গোঁসাই-এর যথেষ্ট প্রভাব আছে। বিরাট সংখ্যার সশস্ত্র একটি দল তার একান্ত অনুগত। সন্যাসী দলকেও আমরা আমাদের কাজে লাগাতে পারি। নিমু গোঁসাই-এর দ্বারা এ কাজ হবে বলে আমার বিশ্বাস আছে।"

নিমু গোঁসাই কর্ণেল স্কটকে দেশের পরিস্থিতির গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর ও পরামর্শ দিত এবং বলতো যে—দরকার হলে ইংরেজদের সাহায্যে সে মাত্র চার দিনের মধ্যে এক হাজার সশস্ত্র লোক হাজির করতে পারবে। (সিরাজউদ্দৌলার পতন-ডঃ মোহর আলী, পৃঃ ১১)

মনে রাখতে হবে যে, হিন্দু জাতির পুনর্জাগরণ আন্দোলনের ফলে বাংলায় সন্যাসী আন্দোলনের নামে গোপনে একটি সশস্ত্র দলগঠন করা হয়েছিল এবং তারাও মুসলিম শাসন অবসানে সহায়ক হয়েছিল। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিল কোলকাতায় দুর্গ নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করে। অপরদিকে বাংলার নবাবের নিকটে যে জমিদারী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী লাভ করে তার উপরে সার্বভৌম অধিকারও তারা প্রতিষ্ঠিত করে। দেশের আইনে অপরাধীগণ শাস্তি এড়াবার জন্যে কোম্পানীর জমিদারীর অধীনে আশ্রয় লাভ করতে থাকে। এ সকল অপরাধী সকলেই ছিল হিন্দু। চোরাচালানের অপরাধে দোষী রামকৃষ্ণ শেঠ নামক জনৈক ব্যবসায়ীকে কোম্পানী আশ্রয় দান করে এবং নবাবের হাতে তাকে সমর্পণ করার নির্দেশ কোম্পানী অমান্য করে। এমনি নবাবের আরও বহু আইনসম্মত নির্দেশ তারা লংঘন করে। তাছাড়া তারা ব্যবসা সংক্রান্ত বহু চুক্তি লংঘন করে।

ইংরেজদের ষড়যন্ত্র, কুকর্ম ও হীন আচরণ নবাব আলীবর্দীর জানা ছিলনা তা নয়। তবে শয্যাশায়ী মরণোন্মুখ নবাবের কিছু করার ক্ষমতা ছিলনা। তাঁর ভাবী

উত্তরাধিকারী সিরাজদ্দৌলা ইংরেজদের ষড়যন্ত্র বানচাল করতে চেয়েছিলেন বলে তিনি তাদের বিরাগভাজন হয়ে পড়েন। আলীবর্দীর পর দু'জন বাংলার সিংহাসনের দাবীদার হয়ে পড়েন। আলীবর্দীর বিধবা কন্যা ঘেসেটি বেগম এবং পুর্ণিয়ার নবাব শওকত জং। ইংরেজগণ ঘেসেটি বেগমের দাবী সমর্থন করে। বেগম ও তার দেওয়ান রাজবল্লভ তাদের যাবতীয় ধনসম্পদ নিরাপদে সঞ্চিত করার জন্যে কোলকাতায় কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে রাখেন। রাজবল্লভ আত্মসাৎকৃত সরকারী অর্থ তিপ্পান্ন লক্ষ টাকাসহ তার পুত্র কৃষ্ণবল্লভকে কোম্পানীর আশ্রয়ে প্রেরণ করে। কৃষ্ণবল্লভকে আশ্রয় দিয়ে ইংরেজগণ নবাবের সংগে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং ঘেসেটি বেগমকে বিশ হাজার সৈন্যসহ সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার জন্যে উদ্বুদ্ধ ক'রে তারা রাষ্ট্রদ্রোহিতার কাজ করে। এ সবকিছুই জানার পর সিরাজ তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন না করে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে অগ্রসর হন। কিন্তু তাঁর কোন কথায় কর্ণপাত করতে ইংরেজগণ প্রস্তুত ছিলনা।

জনৈক ইংরেজ কারখানার মালিক William Tooke বলেন যে, প্রাচ্যের প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী নতুন রাজাভিষেকের পর বিদেশী নাগরিকগণ বিভিন্ন উপঢৌকনাদিসহ নতুন বাদশাহ বা নবাবের সাথে সাক্ষাৎ করে থাকে। কিন্তু এই প্রথমবার তারা এ প্রথা লংঘন করে। তিনি আরও বলেন, কৃষ্ণবল্লভকে আশ্রয় দান এবং তাকে নবাবের হাতে সমর্পণ করতে অস্বীকৃতি এটাই প্রমাণ করে, যে, সিরাজদ্দৌলার রাজনৈতিক শত্রুর সাথে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গভীর যোগসাজস ছিল যার জন্যে তারা এতটা ঔদ্ধত্য দেখাতে সাহস করে। (হিলের ইতিহাস, ১ম খন্ড ও সিরাজউদ্দৌলার পতন- ডঃ মোহর আলী)

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ বাংলা সরকারের একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সরকারের অনুরূপ। সিরাজদ্দৌলা তাদের সাথে একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়ার সকল প্রকার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অতঃপর তিনি তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত করেন। তিনি এ ব্যাপারে হুগলীর জনৈক প্রভাবশালী ব্যবসায়ী খাজা ওয়াজেদকে যে পত্র দেন (১লা জুন, ১৭৫৬) তার মর্ম নিম্নরূপ ঃ

প্রধানতঃ তিনটি কারণে ইংরেজদেরকে এ দেশে আর থাকার অনুমতি দেয়া যেতে পারেনা। প্রথম কারণ এই যে, তারা দেশের আইন লংঘন ক'রে

কোলকাতায় একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করেছে। দ্বিতীয়তঃ তারা ব্যবসার চুক্তি ভংগ করে অসদুপায় অবলম্বন করেছে এবং ব্যবসা–কর ফাঁকি দিয়ে সরকারের প্রভূত আর্থিক ক্ষতি সাধন করেছে। তৃতীয়তঃ একজন সরকারী তহবিল আত্মসাৎকারীকে আশ্রয় দিয়ে তারা রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ করেছে।

তেসরা জুন সিরাজদ্দৌলা কাশিমবাজারস্থ ইংরেজদের কারখানা দখল করে একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্যে চাপ দেন। কারখানা দখলের পর তিনি একটা উদারতা প্রদর্শন করেন যে, কারখানাটি তালাবদ্ধ করে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করেন যাতে করে তা লুণ্ঠিত হতে না পারে। উইলিয়ম ওয়াট্স্ এবং ম্যাথু কলেট ছিলেন এ কারখানার পরিচালক এবং তাঁরাই উপরোক্ত মন্তব্য করেন— (হিলের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড)

কাশিমবাজার কারখানার সমুদয় কর্মচারীকে সিরাজ মুক্ত করে দেন। শুধুমাত্র ওয়াট্স্ এবং কলেটকে সাথে করে কোলকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। যাত্রার পূর্বে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিলকে একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় আসার জন্যে বার বার পত্র লিখেন। কিন্তু তারা মোটেই কর্ণপাত করেনা। বরঞ্চ একটা সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার জন্যে তারা সদাপ্রস্তুত থাকে। দাক্ষিণাত্য থেকে সামরিক সাহায্য লাভের পর তাদের সাহস অনেকখানি বেড়ে যায়। নবাবের কোলকাতা পৌঁছবার এক সপ্তাহ পূর্বে হুগলী নদীর নিম্নভাগে অবস্থিত থানা দুর্গ এবং হুগলী ও কোলকাতার মধ্যবর্তী সুখ সাগর দখলের জন্যে ড্রেক সৈন্য প্রেরণ করে। নবাব কর্তৃক প্রেরিত অগ্রবর্তী দল উভয়স্থানে ইংরেজদের আক্রমণ প্রতিহত করে। ১৬ই জুন ত্রিশ হাজার সৈন্যসহ সিরাজ ফোর্ট উইলিয়ামের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হন। দু'দিন ধরে যুদ্ধের পর ড্রেক তার মূল সেনাবাহিনীসহ ফলতায় পলায়ন করে। পলায়নের সুবিধার জন্যে হলওয়েলকে যুদ্ধে নিয়োজিত রাখা হয় এবং বলা হয় যে— পরদিন সেও যেন তার মুষ্ঠিমেয় সৈন্যসহ ফলতায় আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু, হলওয়েল নবাবের সৈন্যের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। হাউস অব্ কমন্সের সিলেক্ট কমিটির সামনে উইলিয়ম টুক্ (William Tooke) যে সাক্ষ্য দান করে তাতে বলা হয় যে, আত্মসমর্পণকারী ইংরেজ সৈন্যদের প্রতি কোন প্রকার দুর্ব্যবহার করা হয়নি। (হিলের ইতিহাস ১ম খন্ড)। রাত্রি বেলায় প্রচুর মদ্যপানের পর কিছু সংখ্যক ইংরেজ সৈন্য হিংসাত্মক কার্যকলাপ শুরু করলে তাদেরকে ১৮' x ১৪' মাপের একটি কক্ষে আবদ্ধ রাখা হয়। অবাধ্য ও দুর্বিনীত

সৈন্যদের আবদ্ধ রাখার উদ্দেশ্যেই কক্ষটি তাদেরই দ্বারা নির্মিত হয়েছিল; চল্লিশ থেকে ষাট জনকে এতে আবদ্ধ রাখা হয়। যুদ্ধে অত্যধিক পরিশ্রান্ত হওয়ার কারণে জন বিশেক সৈন্য প্রাণত্যাগ করে। এ ঘটনাকে অতিমাত্রায় অতিরঞ্জিত করে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান দেয়া হয়েছে। এ কাল্পনিক ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে বিজয়ী শাসকগণ হলওয়েল মনুমেন্ট নামক একটি স্মৃতিস্তম্ভ কোলকাতায় ডাল্হাউসি স্কোয়ারে স্থাপন করে। এ স্তম্ভটি নবাব সিরাজদ্দৌলার কাল্পনিক কলংক–কালিমা বহন করে বিংশতি শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। উদ্দেশ্যমূলক ও নিছক বিদ্বেষাত্মক প্রচারণার উৎস এ স্তম্ভটি তীব্র প্রতিবাদের মুখে ১৯৩৭ সালের পূর্বেই ভেঙে দেয়া হয়।

যাহোক, হলওয়েল এবং অন্য তিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য সকলের মুক্তি দেয়া হয়। ২৪শে জুন মানিক চাঁদকে কোলকাতার শাসনকার্যে নিয়োজিত করে সিরাজদ্দৌলা হলওয়েল ও তার তিনজন সাথীসহ মুর্শিদাবাদ প্রত্যাবর্তন করেন। ২৬শে জুন অবশিষ্ট ইংরেজ সৈন্যগণ কোলকাতা থেকে ফলতা গমন করে।

৩০শে জুন সিরাজদ্দৌলা ফোর্ট সেন্টজর্জের গভর্ণর জর্জ পিগ্ট্কে পত্র লিখেন। তার মর্ম ছিল এই যে, ইংরেজগণ যদি একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় উপনীত হয় এবং রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের উচ্চাভিলাষ পরিত্যাগ করে ব্যবসার শর্তাবলী মেনে চলতে থাকে, তাহলে তাদেরকে বাংলায় ব্যবসার পূর্ণ সুযোগ দেয়া হবে।

ফল্তায় ইংরেজগণ

সিরাজদ্দৌলা আন্তরিকতার সাথে চেয়েছিলেন ইংরেজদের সংগে একটা ন্যায়সংগত মীমাংসায় উপনীত হতে। কিন্তু তাদের মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। ফল্তায় বসে স্থানীয় হিন্দু প্রধানদের সাথে যে ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করা হচ্ছিল তার থেকে তাদের মনোভাব ব্যক্ত হয়।

মাদ্রাজ থেকে যে সামরিক সাহায্য চাওয়া হয়েছিল, রজার ড্রেক তার প্রতীক্ষায় দিন গুণতে থাকে। এদিকে নবাবকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে ৬ই জুলাই একটা মীমাংসার জন্যে তারা কথাবার্তা শুরু করে। কিন্তু এর মধ্যে ছিলনা কোন আন্তরিকতা। মাদ্রাজ থেকে সামরিক সাহায্য এলেই তারা পুনরায় শক্তি পরীক্ষায় লেগে যাবে। এ ব্যাপারে স্থানীয় প্রধানগণ ও বণিকশ্রেণী সকল প্রকারে ইংরেজদেরকে উৎসাহিত করতে থাকে। বিশেষ করে খাজা ওয়াজেদের প্রধান

সহকারী শিব বাবু নামক জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তি সর্বদা ইংরেজদেরকে একথা বলতে থাকে যে, নবাব সিরাজদ্দৌলা আর তাদেরকে কিছুতে ব্যবসার সুযোগ সুবিধা দিবার পাত্র নন। কোলকাতায় পরাজয় বরণ করার পর কোন মীমাংসায় উপনীত হওয়া তাদের জন্যে কিছুতেই সম্মানজনক নয়। গোবিন্দরাম নামে অন্য একটি লোক সিরাজদ্দৌলার কোলকাতা অভিযানের সময় পথে বৃক্ষ উৎপাটন করে রেখে বাধার সৃষ্টি করেছিল। সে এখন ইংরেজদের পক্ষে গোপন তথ্য সরবরাহের কাজ শুরু করে। কোলকাতার শাসনভার যে মানিকচাঁদের উপর অর্পিত হয়েছিল, সে বিশ্বাসঘাতকতা করে ফল্‌তায় অবস্থিত ইংরেজদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করতে থাকে। সে নবাবের কাছে এ ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্য পেশ করতে থাকে যে ইংরেজরা একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় আসার জন্যে লালায়িত। অল্প সৈন্য নিয়ে কিছু করা যাবেনা চিন্তা করে মেজর কিল্‌প্যাট্রিক্ আপাততঃ যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকে এবং মাদ্রাজ থেকে বৃহত্তর সামরিক সাহায্য ও নৌবহর তলব করে। ১৭৫৬ সালের ১৫ই আগস্ট কিল্‌প্যাট্রিক নবাবকে জানায় যে, তারা তাঁর অনুগ্রহপ্রার্থী। অপরদিকে ইংরেজদেরকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য মানিক চাঁদ, জগতশেঠ ও অন্যান্য হিন্দু প্রধানদেরকে অনুরোধ করে পত্র লিখে।

মানিক চাঁদের মিথ্যা আশ্বাসবাণীতে নবাব বিভ্রান্ত হন এবং বলেন যে, ইংরেজরা যুদ্ধ করতে না চাইলে তাদেরকে ব্যবসায় সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা দেয়া হবে। নবাবের বলতে গেলে নৌশক্তি বলে কিছুই ছিলনা। বিদেশী বণিকদেরকে বাংলার ভূখন্ড থেকে বিতাড়িত করে দিলেও, সমুদ্র উপকূল থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করার ক্ষমতা নবাবের ছিলনা। ইংরেজগণ এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। দ্বিতীয়তঃ সিরাজদ্দৌলার সামনে নতুন এক বিপদ দেখা দেয়। পুর্ণিয়ার শওকত জং মোগল সম্রাটের নিকট থেকে এক ফরমান লাভ করতে সমর্থ হয়— যার বলে তাকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। ইংরেজগণ শওকত জং–এর পক্ষ অবলম্বন করে তার বিজয়ের আশা পোষণ করছিল। কিন্তু ৬ই আগস্টের যুদ্ধে শওকত জং নিহত হওয়ায় তাদের সে আশা আপাততঃ ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

আগস্টের মাঝামাঝি ড্রেক এবং কিল্‌প্যাট্রিক কর্তৃক কোলকাতার পতন সম্পর্কে লিখিত পত্রের জবাবে যথেষ্ট পরিমাণে সামরিক সাহায্য ইংলন্ড থেকে

মাদ্রাজ এসে পৌছে। সেপ্টেম্বরে কোম্পানীর দুটি জাহাজ চেষ্টারফিল্ড্ ও ওয়ালপোল মাদ্রাজ পৌছে যায়। অক্টোবরে ফোর্ট সেন্ট জর্জ কাউন্সিল রবার্ট ক্লাইভ্ এবং এডমিরাল ওয়াটসনের নেতৃত্বে একটি সামরিক অভিযান বাংলায় প্রেরণের সিদ্ধান্ত করে। বাংলায় পৌছাবার পরপরই প্রচন্ড যুদ্ধ শুরু করার জন্যে কর্ণেল ক্লাইভকে নির্দেশ দেয়া হয়। ফোর্ট সেন্ট্ জর্জ কাউন্সিলের পক্ষ থেকে ঢাকা, পুর্ণিয়া এবং কটকের ডিপুটি নবাবদেরকে ক্লাইভের সাথে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানিয়ে পত্র দেয়া হয়। অপরদিকে ইংরেজদের উপর নির্যাতন করা হয়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করে নবাবকেও পত্র দেয়া হয়। উক্ত কাউন্সিলের গভর্ণর জর্জ পিগ্‌টের পত্রে বলা হয় ঃ আমি একজন শক্তিশালী সর্দার পাঠাচ্ছি যার নাম ক্লাইভ। সৈন্য ও পদাতিক বাহিনীসহ সে যাচ্ছে এবং আমার স্থলে শাসন চালাবে। আমাদের যে ক্ষতি করা হয়েছে তার সন্তোষজনক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আপনি নিশ্চয় জেনে থাকবেন যে, আমরা যুদ্ধে সর্বত্রই জয়ী হয়েছি। (হিলের ইতিহাস, ১ম খন্ড)

এ পত্রের মর্ম পরিষ্কার যে, মীমাংসার আর কোন পথ রইলোনা। ১৫ই ডিসেম্বর ক্লাইভ্ ফল্‌তায় পৌছে। মানিকচাঁদ কোম্পানীর প্রতি যে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ ও সাহায্য সহযোগিতা করে, তার জন্যে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেইদিনই ক্লাইভ তাকে পত্র লিখে। ক্লাইভের নিরাপদে পৌছার আনন্দ প্রকাশ করে মানিকচাঁদ পত্রের জবাব দান করে। সে আরও জানায় যে, সে কোম্পানীর যথাসাধ্য খেদমতে আত্মনিয়োগ করবে। উপরন্তু গোপন তথ্য আদান প্রদানের জন্যে সে রাধাকৃষ্ণ নামক এক ব্যক্তিকে ক্লাইভের নিকটে প্রেরণ করে। বাংলার বিরুদ্ধে বাংগালীর এর চেয়ে অধিকতর বিশ্বাসঘাতকতা আর কি হতে পারে?

পঞ্চম অধ্যায়

ইংরেজদের আক্রমণ ও নবাবের পরাজয়

উনত্রিশে ডিসেম্বর ক্লাইভের রণতরী হুগলী নদী দিয়ে অগ্রসর হয়ে বজবজ দখল করে। তার চার দিন আগে ক্লাইভ মানিকচাঁদের মাধ্যমে নবাবকে যে পত্র লিখে তাতে বলা হয়, নবাব আমাদের যে ক্ষতি করেছেন, আমরা এসেছি তার ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্যে, আমরা ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে আসিনি তাঁর কাছে। আমাদের দাবী আদায়ের জন্যে আমাদের সেনাবাহিনীই যথেষ্ট। মানিকচাঁদ পত্রখানি নবাবকে দিয়েছিল কিনা জানা যায়নি। হয়তো দেয়নি। দিলে নবাব নিশ্চয়ই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। মানিকচাঁদ সর্বদা নবাবকে বিভ্রান্ত রেখেছে। তার ফলে বিনা বাধায় ক্লাইভ ৩১শে ডিসেম্বর থানা ফোর্ট এবং ১লা জানুয়ারী, ১৭৫৭ ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ পুনরুদ্ধার করে। মানিকচাঁদ ইচ্ছা করলে নবাবের বিরাট সৈন্য বাহিনীর সাহায্যে ইংরেজদের আক্রমণ সহজেই প্রতিহত করতে পারতো। সে তার কোন চেষ্টাই করেনি। কারণ ইংরেজদের দ্বারা তার এবং তার জাতির অভিলাষ পূর্ণ হতে দেখে সে আনন্দলাভই করছিল। এমনকি এ সকল স্থান ইংরেজ–কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার সংবাদটুকু পর্যন্ত সে নবাবকে দেয়া প্রয়োজন বোধ করেনি।

ইরেজদের হাতে বলতে গেলে, ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ তুলে দিয়ে সে হুগলী গমন করে এবং হুগলী ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়ার জন্যে পরিবেশ সৃষ্টি করতে থাকে। ক্লাইভ হুগলীতে তার নামে লিখিত পত্রে অনুরোধ জানায় যে, পূর্বের মতো সে যেন এখানেও বন্ধুত্বের পরিচয় দেয়। দু'দিন পর হুগলী আক্রমণ করে ক্লাইভ সহজেই তা হস্তগত করে। ইংরেজ কর্তৃক এতসব গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি অধিকৃত হওয়ার পর মানিকচাঁদ নবাবকে জানায় যে, ইংরেজদের মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে। হুগলী অধিকারের পর ইংরেজ সৈন্যগণ সমগ্র শহরে লুটতরাজ অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা বিরাট সন্ত্রাস সৃষ্টি করে।

হুগলীর পতন ও ধ্বংসলীলার সংবাদ পাওয়া মাত্র সিরাজদ্দৌলা বিরাট বাহিনীসহ ২০শে জানুয়ারী হুগলীর উপকণ্ঠে হাজির হন। ইংরেজগণ তখন তড়িৎগতিতে হুগলী থেকে পলায়ন করে কোলকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করে।

নবাব সিরাজদ্দৌলা একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্যে তাদেরকে বার বার অনুরোধ জানান। অনেক আলাপ আলোচনার পর ৯ই ফেব্রুয়ারী নবাব ও ইংরেজদের মধ্যে একটি সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতিহাসে তা আলীনগরের সন্ধি বলে খ্যাত। এ সন্ধি অনুযায়ী ১৭১৭ সালের ফরমান মুতাবেক সকল গ্রাম ইংরেজদেরকে ফেরত দিতে হবে। তাদের পণ্যদ্রব্যাদি করমুক্ত হবে এবং তারা কোলকাতা অধিকতর সুরক্ষিত করতে পারবে। উপরন্তু সেখানে তারা একটা নিজস্ব টাকশাল নির্মাণ করতে পারবে।

সিরাজদ্দৌলাকে এ ধরনের অসম্মানজনক চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হয়েছিল। তার প্রথম কারণ হলো মানিক চাঁদের মতো তাঁর অতি নির্ভরযোগ্য লোকদের চরম বিশ্বাসঘাতকতা। দ্বিতীয়তঃ আহমদ শাহ আবদালীর ভারত আক্রমণ এবং বাংলা অভিযানের সম্ভাবনা।

অপরদিকে ধূর্ত ক্লাইভের নিকটে এ সন্ধি ছিল একটা সাময়িক প্রয়োজন মাত্র। ইংরেজরা একই সাথে প্রয়োজনবোধ করেছিল নবাবকে ক্ষমতাচ্যুত করার এবং ফরাসীদেরকে বাংলা থেকে বিতাড়িত করার। এতদুদ্দেশ্যে ক্লাইভ ওয়াট্‌স্ এবং উমিচাঁদকে সিরাজদ্দৌলার কাছে পাঠিয়ে দেয় এ কথা বলার জন্যে যে, তারা ফরাসী অধিকৃত শহর চন্দরনগর অধিকার করতে চায় এবং তার জন্যে নবাবকে সাহায্য করতে হবে। এ ছিল তাদের এক বিরাট রণকৌশল (Strategy)। নবাব ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হন। তিনি তাঁর রাজ্যমধ্যে সর্বদা বিদেশী বণিকদের ব্যাপারে নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করে আসছিলেন। এ নীতি কি করে ভংগ করতে পারেন? কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, ইংরেজদের সাহায্য না করলে তারা এটাকে তাদের প্রতি শত্রুতা এবং ফরাসীদের প্রতি মিত্রতা পোষণের অভিযোগ করবে। শেষ পর্যন্ত তিনি নিরপেক্ষ নীতিতেই অবিচল থাকার সিদ্ধান্ত করেন। তদনুযায়ী তিনি সেনাপতি নন্দকুমারকে নির্দেশ দেন যে, ইংরেজরা যদি চন্দরনগর আক্রমণ করে তাহলে ফরাসীদের সাহায্য করতে হবে। অনুরূপভাবে ফরাসীরা যদি ইংরেজদেরকে আক্রমণ করে তাহলে ইংরেজদেরকে সাহায্য করতে হবে। ক্লাইভ দশ–বারো হাজার টাকা উৎকোচ দিয়ে নন্দকুমারকে হাত করে। সে একই পন্থায় নবাবের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানকেও বশ করে। এভাবে ক্লাইভ চারদিকে উৎকোচ ও বিশ্বাসঘাতকতার এমন এক জাল বিস্তার করে যে, সিরাজদ্দৌলা কোন বিষয়েই দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে পারেন না। উপরন্তু হিন্দু শেঠ

ও বেনিয়াগণ এবং তাঁর নিমকহারাম কর্মচারীগণ, যারা মনে প্রাণে মুসলিম শাসনের অবসান কামনা করে আসছিল, সিরাজদ্দৌলাকে হরহামেশা কুপরামর্শই দিতে থাকে। তারা বলে যে, ইংরেজদেরকে কিছুতেই রুষ্ট করা চলবে না। ওদিকে আহমদ শাহ আবদালীর বিহার সীমান্তে উপনীত হওয়ার মিথ্যা সংবাদ দিয়ে বাংলা-বিহার রক্ষার উদ্দেশ্যে বিরাট সেনাবাহিনী সেদিকে প্রেরণ করার কুপরামর্শ দেয়। এভাবে ইংরেজদের অগ্রগতির পথ সুগম করে দেয়া হয়।

ইতিমধ্যে ৫ই মার্চ ইংলন্ড থেকে সৈন্যসামন্তসহ একটি নতুন জাহাজ 'কাম্বারল্যান্ড' কোলকাতা এসে পৌছায়। ৮ই মার্চ ক্লাইভ চন্দরনগর অবরোধ করে। নবাব রায়দুর্লভ রাম এবং মীর জাফরের অধীনে একটি সেনাবাহিনী চন্দরনগর অভিমুখে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাদের পৌছাবার পূর্বেই ফরাসীগণ আত্মসমর্পণ করে বসে। তারা চন্দরনগর ছেড়ে যেতে এবং বাংলায় অবস্থিত তাদের সকল কারখানা এড্‌মিরাল ওয়াট্‌সন এবং নবাবের হাতে তুলে দিয়ে যেতে রাজী হয়। অতঃপর বাংলার ভূখন্ড থেকে ফরাসীদের মূলোচ্ছেদ করার জন্যে ক্লাইভ নবাবের কাছে দাবী জানায়। উপরন্তু পাটনা পর্যন্ত ফরাসীদের পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে কোম্পানীর দু'হাজার সৈন্য স্থলপথে অগ্রসর হওয়ার জন্যে নবাবের অনুমতি প্রার্থনা করে। নবাব এ অন্যায় অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে। এতে ফরাসীদের সাহায্য করা হয়েছে বলে নবাবের প্রতি অভিযোগ আরোপ করা হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিল কমিটি ২৩শে এপ্রিল নবাবকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রস্তাব গ্রহণ করে। তারা আরও ভিত্তিহীন অভিযোগ করে যে, নবাব আলীনগরের চুক্তি ভংগ করেছেন।

নবাবকে ক্ষমতাচ্যুত করার উদ্দেশ্যে ক্লাইভ পাকাপোক্ত ষড়যন্ত্র করে, সিরাজেরই তথাকথিত আপন লোক রায়দুর্লভ রাম, উমিচাঁদ ও জগৎশেঠ ভ্রাতৃবৃন্দের সাথে। তাদেরই পরামর্শে নবাবের বখ্‌শী (বেতনদাতা কর্মচারী) মীর জাফরকে নবাবের স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করা হয়। ইংরেজ ও মীর জাফরের মধ্যেও সকল বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। শুধু উমিচাঁদ একটু অসুবিধার সৃষ্টি করে। সে নবাবের যাবতীয় ধন-সম্পদের শতকরা পাঁচ ভাগ দাবী করে বসে। অন্যথায় সকল ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেয়ার হুমকি দেয়। ক্লাইভ উমিচাঁদকে খুশী করার জন্যে ওয়াটসনের জাল স্বাক্ষরসহ এক দলিল তৈরী করে। মীর জাফরের সংগে সম্পাদিত চুক্তিতে সে আলীনগরের চুক্তির সকল শর্ত পুরাপুরি পালন

করতে বাধ্য থাকবে বলে স্বীকৃত হয়। উপরন্তু সে স্বীকৃত হয় ক্ষতিপূরণ বাবদ কোম্পানীকে দিতে হবে এক কোটি টাকা, ইউরোপীয়ানদেরকে পঞ্চাশ লক্ষ, হিন্দু প্রধানদেরকে বিশ লক্ষ এবং আরমেনিয়ানদেরকে সাত লক্ষ টাকা। কোলকাতা এবং তার দক্ষিণে সমুদয় এলাকা চিরদিনের জন্যে কোম্পানীকে ছেড়ে দিতে হবে।

সুচতুর ক্লাইভ নবাবের সন্দেহ নিরসনের জন্যে চন্দরনগর থেকে সৈন্য অপসারণ করে। মীর জাফর পরিকল্পিত বিপ্লব ত্বরান্বিত করার জন্যে ক্লাইভকে অতিরিক্ত বায়ান্ন লক্ষ টাকা পুরস্কার স্বরূপ দিতে সম্মত হয়।

আহমদ শাহ আবদালীর ভারত ত্যাগের পর সিরাজদ্দৌলা মীর জাফরকে একটি সেনাবাহিনীসহ পলাশী প্রান্তরে ইংরেজদের প্রতিহত করার আদেশ করেন যদি তারা ফরাসীদের অনুসরণে উত্তরদিকে অগ্রসর হয়। ক্লাইভ সিরাজদ্দৌলাকে জানায় যে, যেহেতু আলীনগর চুক্তি পালনে ব্যর্থ হয়েছেন, সেহেতু ব্যাপারটির পর্যালোচনার জন্যে মীর জাফর, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ রাম, মীর মদন এবং মোহনলালকে দায়িত্ব দেয়া হোক। কিন্তু ওদিকে সংগে সংগে ক্লাইভ মুর্শিদাবাদ অভিমুখে তার সৈন্য প্রেরণ করে। সিরাজ পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজ সৈন্যদের সম্মুখীন হন। নবাবের সৈন্য পরিচালনার ভার ছিল মীর জাফর, রায়দুর্লভ রাম প্রভৃতির উপর। তারা চরম মুহূর্তে সৈন্য পরিচালনা থেকে বিরত থাকে। ফলে ক্লাইভ যুদ্ধ না করেও জয়লাভ করে। হতভাগ্য সিরাজ যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করেন, কিন্তু পথিমধ্যে মীর জাফরপুত্র মীরন তাকে হত্যা করে। এভাবে পলাশীর বেদনাদায়ক রাজনৈতিক নাটকের যবনিকাপাত হয়।

পলাশী যুদ্ধের পটভূমির বিশদ বিবরণ থেকে কয়েকটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

এক. বাংলার জমিদার প্রধান, ধনিক বণিক ও বেনিয়া গোষ্ঠী দেশের স্বাধীনতার বিনিময়ে হলেও মুসলিম শাসনের অবসানকল্পে ইংরেজদের সংগে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

দুই. ইংরেজগণ হিন্দুপ্রধানদের মনোভাব বুঝতে পেরে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্যে হিন্দুদেরকে পুরাপুরি ব্যবহার করে।

তিন. নবাবের সকল দায়িত্বপূর্ণ পদে যারা অধিষ্ঠিত ছিল তারা সকলেই ছিল হিন্দু এবং তাদের উপরেই তাঁকে পুরাপুরি নির্ভর করতে হতো। কিন্তু যাদের

উপরে তিনি নির্ভর করতেন তারাই তাঁর পতনের জন্যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

চার. পলাশীর যুদ্ধকে যুদ্ধ বলা যায় না। এ ছিল যুদ্ধের প্রহসন। ইংরেজদের চেয়ে নবাবের সৈন্যসংখ্যা ছিল অনেক গুণ বেশী। নবাবের সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ করলে ইংরেজ সৈন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো এবং ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হতো। অথবা সিরাজদ্দৌলা যদি স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করতেন, তাহলেও তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হতো না।

পাঁচ. ইংরেজদের আচরণ ছিল আগাগোড়া শঠতাপূর্ণ এবং হিন্দুদের সাহায্যে প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, মিথ্যা ও দুর্নীতির মাধ্যমে এক বিরাট ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করে তারা সিরাজদ্দৌলাকে ফাঁদে আবদ্ধ করে।

ছয়. যাদেরকে সিরাজ দেশপ্রেমিক ও তাঁর শুভাকাংখী মনে করেছিলেন— তারা যে দেশের স্বাধীনতা বিক্রয় করে তাদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করবে, একথা বুঝতে না পারা তাঁর মারাত্মক ভুল হয়েছে। অথবা বুঝতে পেরেও তাঁর করার কিছুই ছিল না। তাঁর এবং তাঁর পূর্ববর্তী শাসকদের দ্বারা দুধ-কলা দিয়ে পোষিত, বর্ধিত ও পালিত কালসর্প অবশেষে তাঁকেই দংশন করে জীবনের লীলা সাংগ করলো।

পলাশীর মর্মন্তুদ নাটকের পর

পলাশী প্রান্তরে সিরাজদ্দৌলার পরাজয় শুধুমাত্র এক ব্যক্তির পরাজয় নয়। বাংলা-বিহার তথা গোটা ভারত উপমহাদেশের পরাজয়। এ পরাজয় দ্বার উন্মোচন করে দেয় ভারতের উপরে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রভুত্বের। শুধু তাই নয়। এ পরাজয় সিরাজদ্দৌলার নয়, বাংলা বিহারের নয়, ভারতেরও নয়, এ পরাজয় এশিয়ার ইউরোপের কাছে, প্রাচ্যের প্রতীচ্যের কাছে। পরবর্তী ধারাবাহিক ঘটনাপুঞ্জ এ কথারই সাক্ষ্য দান করে। নিদেনপক্ষে ভারত উপমহাদেশের উপরে ব্রিটিশ আধিপত্য ও প্রভুত্ব চলেছিল একশ' নব্বই বছর ধরে।

পলাশীর এ বেদনাদায়ক রাজনৈতিক নাটকের পরিচালক কে বা কারা ছিল, বাংলা-বিহার তথা ভারত উপমহাদেশের গলায় দু'শ' বছরের জন্যে পরাধীনতার শৃংখল কে বা কারা পরিয়ে দিয়েছিল, ইতিহাস তাদেরকে খুঁজে বের করতে ভোলেনি। অতীব ঘৃণিত ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা, উৎকোচের মাধ্যমে মস্তক ক্রয় এবং কাল্পনিক অভিযোগের ভিত্তিতে প্রতিশোধ গ্রহণের হিংস্র নীতি অবলম্বনে,

যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র পরিচালনা না করেই, ক্লাইভ ও তার গোত্র-গোষ্ঠী সিরাজদ্দৌলাকে পরাজিত ও নিহত করে এ দেশে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য হয়েছিল।

সিরাজদ্দৌলার পতনের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে ইতিহাসকে বিকৃত করা হ'য়েছে। ১৭৫৭ সালের পর যাদের বিজয় নিনাদ প্রায় দু'শ' বছর পর্যন্ত ভারত তথা এশিয়ার বিশাল ভূখন্ডে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল এবং এ বিজয় লাভে সহায়ক শক্তি হিসেবে যাদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল, তাদেরই মনোপূত ও মনগড়া ইতিহাসে সিরাজদ্দৌলাকেই দায়ী করার হাস্যকর চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সত্যিকার ইতিহাস কি তাই?

বিরাট মোগল সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে পড়েছিল— ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্বাধীন আধা স্বাধীন শাসক মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। মারাঠাশক্তি উত্তর ও মধ্য ভারতকে গ্রাস করার পরিকল্পনা নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু আহমদ শাহ আবদালী পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১) তাদের শক্তি চূর্ণ বিচূর্ণ করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। বাদশাহ আকবর ভারতের দুর্ধর্ষ মুসলিম সামরিক শক্তির বিনাশ সাধন করেছিলেন। বিকল্প কোন সামরিক শক্তি গঠিত হ'তে পারেনি। নৌশক্তি বলতে মুসলমানদের কিছুই ছিলনা বল্লেও চলে। ইংরেজ বণিকগণ এদেশে এসেছিল দ্বিবিধ উদ্দেশ্য নিয়ে। ব্যবসা-বাণিজ্যের নামে রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে দুর্গ নির্মাণ, নৌবহর-স্থাপন, স্বদেশ থেকে সৈন্যবাহিনী আমদানী প্রভৃতির দ্বারা ক্রমশঃ শক্তিশালী হ'য়ে উঠেছিল। তাদের এ উদ্দেশ্য সাধনে সর্বতোভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছিল— বাংলার দেশপ্রেমিক (?) বাংগালী হিন্দু ধনিক বণিক শ্রেণী।

বাংলায় মুর্শিদকুলী খাঁর সময় থেকে সকল প্রশাসনক্ষেত্র থেকে মুসলমানদেরকে অপসারিত করে তথায় বাংলার হিন্দুদের জন্যে স্থান করে দেয়া হয়েছিল। এ ছিল অতীব স্বদেশপ্রীতি ও একদেশদর্শী উদারতার ফল। যদিও পরবর্তীকালে তার মাশুল দিতে হয়েছে কড়ায় গন্ডায়। আলীবর্দীর সময় থেকে তারাই হ'য়ে পড়ে রাজ্যের সর্বেসর্বা। বাংলার মসনদ লাভ ছিল তাদেরই কৃপার উপরে একান্ত নির্ভরশীল। তারা ছিল বাংলার রাজস্রষ্টা (King-Makers)।

সিরাজদ্দৌলা নবাব আলীবর্দীর স্থলাভিষিক্ত মনোনীত হওয়ার সময় জগৎশেঠ ভ্রাতৃবৃন্দ, মানিক চাঁদ, দুর্লভ রাম প্রভৃতি এমন শক্তিশালী ছিল যে, তাদের

বিরাগভাজন হয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকা সিরাজের পক্ষে ছিল অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু এসব শক্তিশালী রাজকর্মচারীবৃন্দ রাজকোষ দ্বারা লালিত-পালিত হওয়া সত্ত্বেও প্রভুর প্রতি কণামাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মনোভাব পোষণ করেনি। তারা সর্বদা সিরাজকে কুপরামর্শ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরঞ্চ ভিতরে ভিতরে কোম্পানীর সাথে একাত্মতাই পোষণ করেছে। তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছে সিরাজের পতনের মাধ্যমে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটিয়ে এদেশে ইংরেজ শাসন পত্তন করতে।

সিরাজদ্দৌলা শুধু একজন দেশপ্রেমিকই ছিলেন না। তিনি একজন অত্যন্ত সাহসী বীরপুরুষও ছিলেন। ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই তিনি যেরূপ ক্ষিপ্রতার সাথে ঘেসেটি বেগম ও শওকত জং-এর বিদ্রোহ দমন করেন, তাতে তাঁর সৎসাহস ও বিচক্ষণতারই পরিচয় পাওয়া যায়। কয়েকবার ইংরেজদের সাথে সংঘর্ষেও তাঁর বিজয় সূচিত হয়। আলম চাঁদ, জগৎশেঠ প্রভৃতি হিন্দু প্রধানগণ যদি চরম বিশ্বাসঘাতকতার ভূমিকা পালন না করতো, তাহলে বাংলার ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হতো। মীর জাফরের ভূমিকাও কম নিন্দনীয় নয়। কিন্তু পলাশী নাটকের সবচেয়ে ঘৃণিত ও অভিশপ্ত ব্যক্তি করা হয়েছে তাকে। কোলকাতা ফোর্ট উইলিয়মের যুদ্ধে ইংরেজদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করার পর নবাব সিরাজদ্দৌলা কোলকাতা শাসনের ভার অর্পণ করেন মানিক চাঁদের উপর। মানিক চাঁদ ইংরেজদেরকে কোলকাতা ও হুগলীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। নবাবকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত হয় রায় দুর্লভ রাম, উমিচাঁদ ও জগৎশেঠ ভ্রাতৃবৃন্দের পরামর্শে। এ কাজের জন্যে মীর জাফরকে বেছে নেয়া হয় শিখন্ডী হিসাবে অথবা 'শো বয়' হিসাবে। এদেরই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে পড়েছিল মীর জাফর। মীর জাফর যে দোষী ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ হীন ষড়যন্ত্রে তার অংশ কতটুকুই বা ছিল? বড়োজোর এক আনা। কিন্তু তার দুর্ভাগ্যের পরিহাসই বলতে হবে যে, ইতিহাসে তার চেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি আর কেউ নেই। তাই সকল সময়ে বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তির নামের পূর্বে 'মীর জাফর' শব্দটি বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়।

দেশপ্রেমিক সিরাজদ্দৌলা বাংলা বিহারের স্বাধীনতা বিদেশী শক্তির হস্তে বিক্রয় না করার জন্যে মীর জাফরসহ হিন্দু প্রধানগণের কাছে বার বার আকুল আবেদন জানান। কিন্তু তাঁর সকল নিবেদন আবেদন অরণ্যে-রোদনে পরিণত হয়।

বিশ্বাসঘাতকের দল তাদের বহুদিনের পুঞ্জিভূত আক্রোশের প্রতিশোধ গ্রহণ করে দেশের স্বাধীনতার বিনিময়ে। এতেও তাদের প্রতিহিংসা পুরাপুরি চরিতার্থ হয়নি। সিরাজদ্দৌলাকে পৈশাচিকভাবে হত্যা করেই তারা তাদের প্রতিহিংসার প্রজ্জ্বলিত অগ্নি নির্বাপিত করে।

সিরাজদ্দৌলাকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে অপসারিত করে অন্য কাউকে বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত করা— ইংরেজদের উদ্দেশ্য ছিল না। তারা চেয়েছিল এদেশে তাদের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে। মীর জাফরকে তারা কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ গদিতে প্রতিষ্ঠিত করে। মীর জাফর তাদের ক্রমবর্ধমান অন্যায় দাবী মিটাতে সক্ষম হয়নি বলে তাকেও অবশেষে সরে দাঁড়াতে হয়। হিন্দু প্রধানদের নিকটে শুধু সিরাজদ্দৌলাই অপ্রিয় ছিলেন না। যদি তাই হতো, তাহলে তাঁর স্থলে তাদেরই মনোনীত ব্যক্তি মীর জাফর এবং তারপর তাদেরই মনোনীত মীর কাসিম তাদের অপ্রিয় হতো না। তাদের একান্ত কামনার বস্তু ছিল মুসলিম শাসনের অবসান। তাই নিজের দেশের স্বাধীনতা জলাঞ্জলি দিয়ে মুসলিম শাসনের পরিবর্তে বিদেশী শাসনের শৃংখল স্বেচ্ছায় গলায় পরিধান করতে তারা ইতস্ততঃ করেনি। মীর জাফরের পর মীর কাসিম আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন দেশের প্রশাসন ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন করতে এবং তার সংগে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু তিনিও ইংরেজদের অদম্য ক্ষুধার খোরাক যোগাতে পারেননি বলে বাংলার রাজনৈতিক অংগন থেকে তাঁকেও বিদায় নিতে হয়। (হিল, যদুনাথ সরকার; ম্যালিসন, ডঃ মোহর আলী)

বাংলা বিহার তথা ভারতে ব্রিটিশ রাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দু'শ' বছরে এ দেশের জনগণের ভাগ্যে যা হবার তাই হয়েছে। অবশ্য কিছু বৈষয়িক মংগল সাধিত হলেও পরাধীনতার অভিশাপ, লাঞ্ছনা-অপমান জাতিকে জর্জরিত করেছে। সিরাজদ্দৌলার পতনের অব্যবহিত পরে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের বিশেষ করে মুসলমানদের উপরে যে শোষণ নিষ্পেষণ চলেছিল তার নজির ইতিহাসে বিরল। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দারিদ্র, দেশকে গ্রাস করে ফেলে। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হয়েছে পরবর্তী অধ্যায়ে।

সিরাজদ্দৌলার পতনের পর বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা

পলাশী ও বকসারের যুদ্ধের পর বাংলার স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর নামমাত্র মোগল সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী মঞ্জুর করার পর এ অঞ্চলের উপরে তাদের আইনগত অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বাংলার যে চিত্র ফুটে উঠে তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও নৈরাশ্যজনক। পলাশী যুদ্ধের পর মীর জাফর প্রভৃতি নামমাত্র নবাব থাকলেও সামরিক শক্তির নিয়ন্তা ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। ১৭৬৫ সালের পর দেশের অর্থনীতিও সম্পূর্ণ তাদেরই নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। ফলে বাংলার মুসলিম সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সর্বাপেক্ষা ও সর্বদিক দিয়ে।

সিরাজদ্দৌলাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্যে উমিচাঁদ–মীর জাফরের সাথে কোম্পানীর যে ষড়যন্ত্রমূলক চুক্তি সম্পাদিত হয়, তার অর্থনৈতিক দাবী পূরণ করতে গিয়ে বাংলার রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে। পূর্বে বলা হয়েছে যে, এ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী কোম্পানীকে ভূয়া ক্ষতিপূরণ বাবদ দিতে হয়একশ' লক্ষ টাকা। ইউরোপীয়দেরকে পঞ্চাশ লক্ষ, হিন্দু প্রধানকে বিশ লক্ষ এবং আরমেনীয়দেরকে সাত লক্ষ টাকা। বিপ্লব ত্বরান্বিত করার জন্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পূর্বেই ক্লাইভকে দিতে হয় বায়ান্ন লক্ষ টাকা (Fall of Sirajuddowla- Dr. Mohar Ali)।

মীর জাফরের ভূয়া নবাব হিসাবে বাংলার মসনদে আরোহণ করার পর কোম্পানীর দাবী উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। মীর জাফর, তাদেরকে প্রীত ও সন্তুষ্ট রাখতে বাধ্য হয়। রাজস্ব বিভাগ কোম্পানীর পরিচালনাধীন হওয়ার পর কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যে হিন্দু ও ইংরেজ আদায়কারীগণ অতিমাত্রায় শোষণ নিষ্পেষণের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় ক'রে কোম্পানীর রাজকোষ পূর্ণ করতে থাকে। ইতিপূর্বে প্রজাদের নিকট থেকে আদায়কৃত সকল অর্থ দেশের জনগণের মধ্যে তাদেরই জন্যে ব্যয়িত হতো। তখন থেকে ইংলন্ডের ব্যাংকে ও ব্যবসা কেন্দ্রগুলিতে স্থানান্তরিত হতে থাকে।

১৭৭৬ সালের দুর্ভিক্ষে বাংলার এক তৃতীয়াংশ লোক প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু রাজস্ব আদায়ের বেলায় কোন প্রকার অনুকম্পা প্রদর্শিত হয়নি। দুর্ভিক্ষ যখন চরম

আকার ধারণ করে, তখন পূর্বের বৎসরের তুলনায় ছয় লক্ষ টাকা অধিক রাজস্ব আদায় করা হয়, বাংলা ও বিহার থেকে পরবর্তী বছর অতিরিক্ত চৌদ্দ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। মানব সন্তানেরা যখন ক্ষুধা–তৃষ্ণা ও মৃত্যু যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছিল, তখন তাদের রক্ত শোষণ করে পৈশাচিক উল্লাসে নৃত্য করছিল ইংরেজ ও তাদের রাজস্ব আদায়কারীগণ। এসব রাজস্ব আদায়কারী ছিল কোলকাতার হিন্দু বেনিয়াগণ, সুদী মহাজন ও ব্যবসায়ীগণ। মানবতার প্রতি এর চেয়ে অধিক নির্মমতা ও পৈশাচিকতা আর কি হতে পারে? (Baden Powel- Land system etc.— British Policy & the Muslims in Bengal— A. R. Mallick)।

আর এক ঘৃণিত পন্থায় এদেশের অর্থসম্পদ লুণ্ঠন করা হতো। কোম্পানী এবং তাদের কর্মচারীগণ যাকে খুশী তাকে নবাবের পদে অধিষ্ঠিত করতে পারতো এবং যাকে খুশী তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতো। ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত মাত্র আট–ন' বছরে এ ব্যাপারে কোম্পানী ও তার দেশী–বিদেশী কর্মচারীদের পকেটে যায় কমপক্ষে ৬২,৬১,১৬৫ পাউন্ড। প্রত্যেক নবাব কোম্পানীকে বিভিন্ন বাণিজ্যিক সুযোগ–সুবিধা দানের পরও বহু মূল্যবান উপঢৌকনাদি দিয়ে সন্তুষ্ট রাখতো।

আবদুল মওদূদ বলেন ঃ

পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালে ষড়যন্ত্রকারী দল কী মহামূল্য দিয়ে ব্রিটিশ রাজদন্ড এ দেশবাসীর জন্য ক্রয় করেছিল, তার সঠিক খতিয়ান আজও নির্ণীত হয়নি। হওয়া সম্ভব নয়। কারণ— কেবল লিখিত বিবরণ থেকে তার কিছুটা পরিমাণ জ্ঞাত হওয়া সম্ভব। কিন্তু হিসাবের বাইরে যে বিপুল অর্থ সাগর পারে চালান হয়ে গেছে, কিভাবে তার পরিমাপ করা যাবে?

ব্রিটিশ আমলে বাংলার অর্থনীতি মানেই হলো— সুপরিকল্পিত শোষণের মর্মভেদী ইতিহাস। ঐতিহাসিকরা মোটামোটি হিসাব করে বলেছেন, ১৭৫৭ থেকে ১৭৮০ পর্যন্ত মাত্র তেইশ বছরে বাংলা থেকে ইংলন্ডে চালান গেছে প্রায় তিন কোটি আশি লক্ষ পাউন্ড অর্থাৎ সমকালীন মূল্যের ষাট কোটি টাকা। কিন্তু ১৯০০ সালের মূল্যমানের তিনশো কোটি টাকা। (I.O. Miller, quoted by Misra, p. 15)।

মুর্শিদাবাদের খাযাঞ্চিখানা থেকে পাওয়া গেল পনর লক্ষ পাউন্ডের টাকা, অবশ্য বহুমূল্য মণিমাণিক্য দিয়ে। ক্ষতিপূরণ হিসেবে ব্রিটিশ স্থলসেনা ও নৌসেনা পেলো চার লক্ষ পাউন্ড; সিলেক্ট কমিটির ছয়জন সদস্য পেলেন নয় লক্ষ পাউন্ড; কাউন্সিল মেম্বররা পেলেন প্রত্যেকে পঞ্চাশ থেকে আশি হাজার পাউণ্ড; আর খোদ ক্লাইভ পেলেন দু'লক্ষ চৌত্রিশ হাজার পাউণ্ড, তাছাড়া ত্রিশ হাজার পাউন্ড বার্ষিক আয়ের জমিদারীসহ বাদশাহ প্রদত্ত উপাধি 'সাবাত জং'। অবশ্য পলাশী বিজয়ী ক্লাইভের ভাষায় 'তিনি এতো সংযম দেখিয়ে নিজেই আশ্চর্য'। মীর কাসিম দিয়েছেন নগদ দু'লক্ষ পাউন্ড কাউন্সিলের সাহায্যের জন্যে। মীর জাফর নন্দন নজমদ্দৌলা দিয়েছেন এক লক্ষ উনচল্লিশ হাজার পাউন্ড। এছাড়া সাধারণ সৈনিক, কুঠিয়াল ইংরেজ কত লক্ষ মুদ্রা আত্মসাৎ করেছে, বলা দুঃসাধ্য। বিখ্যাত জরিপবিদ জেম্‌স্ রেনেল ১৭৬৪ সালে বাইশ বছর বয়সে বার্ষিক হাজার পাউন্ডে নিযুক্ত হন, এবং ১৭৭৭ সালে বিলাত ফিরে যান ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার পাউন্ড আত্মসাৎ করে। এ থেকেই অনুমেয়, কোম্পানীর কর্মচারীরা কী পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করতেন। তারা এ দেশে কোম্পানী রাজ্যের প্রতিভূ হিসেবে এবং চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর হোমে প্রত্যাগত হয়ে এরূপ রাজসিক হালে বাস করতেন যে, তাঁরা 'ইন্ডিয়ান নেবাব্‌স' রূপে আখ্যাত হতেন। . . . ক্লাইভ নিজেই স্বীকার করেছেন, "আমি কেবল স্বীকার করতে পারি, এমন অরাজকতা বিশৃংখলা, উৎকোচ গ্রহণ, দুর্নীতি ও বলপূর্বক ধনাপহরণের পাশব চিত্র বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোথাও দৃষ্ট হয়নি।" অথচ নির্লজ্জ ক্লাইভই এ শোষণ যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। (মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, আবদুল মওদূদ, পৃঃ ৬০–৬২)।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুসলিম সমাজের দুর্দশা

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক বাংলার স্বাধীনতা বিনষ্ট হওয়ার পর মুসলিম সমাজের যে সীমাহীন দুর্দশা হয়েছিল, তা নিম্নের আলোচনায় সুস্পষ্ট হবে।

পলাশী যুদ্ধের পূর্বে সামরিক ও বেসামরিক চাকুরীক্ষেত্রে সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল। কোম্পানী ক্ষমতা হস্তগত করার পর প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের প্রথম ধাপেই মুসলিম সেনাবাহিনী ভেঙে দেয়া হয়। তার ফলে কিছু উচ্চশ্রেণীর কর্মচারীই বেকার হয়ে পড়েনি, বরঞ্চ হাজার হাজার নিম্নবেতনভুক কর্মচারীও কর্মচ্যুত হয়ে পড়ে। ফলে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে বেকারত্ব ও দারিদ্রের মুখে ঠেলে দেয়া হয়।

দ্বিতীয়তঃ দেশের গোটা রাজস্ব বিভাগকে ইংলন্ডের পদ্ধতিতে পুনর্গঠিত করার ফলে বহুসংখ্যক মুসলমান কর্মচ্যুত হয়। সরকারের ভূমি রাজস্ব নীতি অনুযায়ী বহু মুসলমান জমিদার তাদের জমিদারী থেকে উচ্ছেদ হয়। ১৭৯৩ সালে গ্রাম্য পুলিশ প্রথা রহিতকরণের ফলেও হাজার হাজার মুসলমান বেকার হয়ে পড়ে। এভাবে এ দেশে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে উচ্চশ্রেণীর মুসলমান শুধু সরকারী চাকুরী থেকেই বঞ্চিত হয়নি, জীবিকার্জনের অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা থেকেও তারা বঞ্চিত হয়।

নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের পেশা ছিল সাধারণতঃ কৃষি ও তাঁতশিল্প। অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ থেকে মানচেস্টারের মিলজাত বস্ত্রাদি প্রচুর পরিমাণে আমদানীর ফলে, বাংলার তাঁতশিল্প ধ্বংস হয় এবং লক্ষ লক্ষ তাঁতীও ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। তারপর শুধু কৃষির উপর নির্ভর করে জীবন যাপন করা তাদের জন্যে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

কোম্পানী এ দেশে আগমনের পর থেকেই কোলকাতার হিন্দু বেনিয়াগণ তাদের অধীনে চাকুরী–বাকুরী করে অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে পড়ে। তাদেরকে বলা হতো 'গোমস্তা'। পলাশী যুদ্ধের পর নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এদের হয়েছিল পোয়াবারো। কোম্পানীর একচেটিয়া লবণ ব্যবসায় এবং আভ্যন্তরীণ অন্যান্য ব্যবসা–বাণিজ্যে এসব গোমস্তাগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ক'রে প্রভূত

অর্থ উপার্জন করে। কিন্তু এতদ্দেশীয় ব্যবসা ধ্বংস করে জনগণকে চরম, দুর্দশাগ্রস্ত ক'রে ফেলে। কোম্পানীর দেশী-বিদেশী কর্মচারীগণ ইংলন্ড থেকে আমদানীকৃত দ্রব্যাদি অত্যধিক উচ্চমূল্যে খরিদ করতে এবং দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদি অতি অল্পমূল্যে বিক্রয় করতে জনসাধারণকে বাধ্য করে। তাদের উৎপীড়ন-নির্যাতনের বিবরণ দিতে হলে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন। কোম্পানীর অত্যাচার-উৎপীড়নে পূর্ণ সহায়তা করে বাংলার হিন্দু কর্মচারীগণ। ১৭৮৬ সালে কালীচরণ নামে জনৈক গোমস্তার জুলুম-নিষ্পেষণে ত্রিপুরা অঞ্চলকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার অপরাধে তাকে সেখান থেকে অপসারিত ক'রে চট্টগ্রামে রাজস্ব বিভাগের দেওয়ান বা ম্যানেজার নিযুক্ত করা হয়। এক বৎসরে সে চট্টগ্রামের জমিদারের নিকট থেকে অন্যায়ভাবে ত্রিশ হাজার টাকা আদায় করে। লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিকটে বিষয়টি উপস্থাপিত করলে, চট্টগ্রামের রাজস্ব কন্ট্রোলার মিঃ বার্ড বলেন, কালীচরণকে চাকুরী থেকে অপসারিত ক'রে তার স্থলে তার গোমস্তা নিত্যানন্দকে নিয়োগ করা হবে। কিন্তু কোলকাতার অতি প্রভাবশালী গোমস্তা জয় নারায়ণ গোসাই-এর হস্তক্ষেপের ফলে বিষয়টির এখানেই যবনিকাপাত হয় এবং কালীচরণ তার পদে সসম্মানে বহাল থাকে।

এ একটি ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় যে, কোম্পানীর হিন্দু কর্মচারীগণ গ্রামবাংলার ধ্বংস সাধনে কোন্ সর্বনাশা ভূমিকা পালন করেছিল। জনৈক ইংরেজ মন্তব্য করেন ঃ ইংরেজ ও তাদের আইন-কানুন যে একটিমাত্র শ্রেণীকে ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা করেছিল তা হলো, তাদের অধীনে নিযুক্ত এতদ্দেশীয় গোমস্তা-দালাল প্রতিনিধিগণ। এসব লোক পংগপালের মতো যেভাবে দ্রুতগতিতে গ্রামবাংলাকে গ্রাস করতে থাকে তাতে করে তারা ভারতের অস্তিত্বের মূলেই আঘাত করছিল।—(Muinuddin Ahmad Khan, Muslim Struggle for Freedom in Bengal, pp. 8)।

ইংরেজদের পলিসি ছিল, যাদের সাহায্যে তারা এ দেশের স্বাধীনতা হরণ ক'রে এখানে রাজনৈতিক প্রভুত্ব লাভ করেছে, তাদেরকে সমাজের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত ক'রে মুসলমানদেরকে একেবারে উৎখাত করা, যাতে ক'রে ভবিষ্যতে তারা আর কখনো স্বাধীনতা ফিরে পাবার কোন শক্তি অর্জন করতে না পারে। হ্যাস্টিংসের ভূমি ইজারাদান নীতি ও কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে হিন্দুরা মুসলমান জমিদারদের স্থান দখল করে। নগদ সর্বোচ্চ মূল্যদাতার

নিকটে ভূমি ইজারাদানের নীতি কার্যকর হওয়ার কারণে প্রাচীন সম্ভ্রান্ত মুসলিম জমিদারগণ হঠাৎ সর্বোচ্চ মূল্য নগদ পরিশোধ করতে অপারগ হয়। পক্ষান্তরে হিন্দু বেনিয়া শ্রেণী, সুদী মহাজন, ব্যাংকার ও হিন্দু ধনিক-বণিক শ্রেণী এ সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। প্রাচীন জমিদারীর অধিকাংশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এসব ধনিক-বণিকদের কাছে অচিরেই হস্তান্তরিত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান জমিদারদের অধীনে নিযুক্ত হিন্দু নায়েব-ম্যানেজার প্রভৃতির স্বীকৃতি দান। ১৮৪৪ সালের Calcutta Review-তে যে তথ্য প্রকাশিত হয় তাতে বলা হয় এক ডজন জমিদারীর মধ্যে, যাদের জমিদারীর পরিধি ছিল একটি ক'রে জেলার সমান, মাত্র দু'টি পূর্বতন জমিদারদের দখলে রয়ে যায় এবং অবশিষ্ট হস্তগত হয় প্রাচীন জমিদারদের নিম্নকর্মচারীর বংশধরদের। এভাবে বাংলার সর্বত্র এক নতুন জমিদার শ্রেণীর পত্তন হয়, যারা হয়ে পড়েছিল নতুন বিদেশী প্রভুদের একান্ত অনুগত ও বিশ্বাসভাজন।

হান্টার তাঁর The Indian Mussalmans গ্রন্থে বলেন ঃ যেসব হিন্দু কর আদায়কারীগণ ঐ সময় পর্যন্ত নিম্নপদের চাকুরীতে নিযুক্ত ছিল, নয়া ব্যবস্থার বদৌলতে তারা জমিদার শ্রেণীতে উন্নীত হয়। নয়া ব্যবস্থা তাদেরকে জমির উপর মালিকানা অধিকার এবং সম্পদ আহরণের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। অথচ মুসলমানেরা নিজেদের শাসনামলে এ সুযোগ সুবিধাগুলো একচেটিয়াভাবে ভোগ করেছে। —(Hunter, The Indian Mussalmans:অনুবাদ আনিসুজ্জামান, পৃঃ ১৪১)।

মুসলিম শাসনামলে আইন ছিল যে, জমিদারগণ সমাজবিরোধী, দুষ্কৃতিকারী ও দস্যু-তস্করের প্রতি কড়া নজর রাখবে। ধরা পড়লে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদিসহ তাদেরকে সরকারের নিকটে সমর্পণ করবে। ১৭৭২ সালে কোম্পানী এ আইন রহিত করে। ফলে, নতুন জমিদারগণ দস্যু-তস্করকে ধরিয়ে দেয়ার পরিবর্তে তাদের প্রতিপালন করে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির অংশীদার হতে থাকে। এটা অনুমান করতে কষ্ট হাবার কথা নয় যে, এসব দস্যু-তস্কর কারা ছিল, এবং কারা ছিল গ্রামবাংলার লুণ্ঠিত হতভাগ্যের দল। ১৯৪৪ সালে Calcutta Review-তে প্রকাশিত তথ্যে বলা হয় যে, এসব নতুন জমিদারগণ দস্যু-তস্করদেরকে প্রতিপালন করতো ধন অর্জনের উদ্দেশ্যে। ১৭৯৯ সালে প্রকাশিত ঢাকা-

জালালপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্টেও এসব দুষ্কৃতি সত্য বলে স্বীকার করা হয়।

—(Muinuddin Ahmad Khan— Muslim Struggle for Freedom in India— pp. 10)।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মুসলমান জমিদারদের উৎখাত ক'রে শুধুমাত্র এক নতুন জমিদার শ্রেণীরই পত্তন করেনি, নতুনভাবে জমির খাজনা নির্ধারণেরও পূর্ণ অধিকার তাদেরকে দেয়া হয়। এ ব্যাপারে তারা চরম স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দেয়। এসব জমিদার সরকারী রাজস্বের আকারে অতি উচ্চহারে ঠিকাদার তথা পত্তনীদারদের নিকটে তাদের জমিদারীর ভারার্পণ করতো। তারা আবার চড়া খাজনার বিনিময়ে নিম্নপত্তনীদারদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করতো। অতএব সরকারের ঘরে যে রাজস্ব যেতো, তার চতুর্গুণ— দশগুণ প্রজাদের নিকটে জোর-জবরদস্তি করে আদায় করতো। বলতে গেলে, এ নতুন জমিদার শ্রেণী রায়তদের জীবন-মরণের মালিক-মোখতার হয়ে পড়েছিল।

ফরিদপুর জেলার ম্যাজিস্ট্রেট আপিস থেকে এমন কিছু সরকারী নথিপত্র পাওয়া যায়, যার থেকে এ তথ্য প্রকাশিত হয় যে, অন্ততঃপক্ষে তেইশ প্রকার 'অন্যায় ও অবৈধ' আবওয়াব রায়তদের নিকট থেকে আদায় করা হতো। বুকানন্ বলেন, "রায়তদেরকে বাড়ী থেকে ধরে এনে কয়েকদিন পর্যন্ত আবদ্ধ রেখে মারপিট করে খাজনা আদায় করা তো এক সাধারণ ব্যাপার ছিল। উপরন্তু নিরক্ষর প্রজাদের নিকট থেকে জাল রসিদ দিয়ে জমিদারের কর্মচারীগণ খাজনা আদায় করে আত্মসাৎ করতো।" (M. Martin— The History, Antiquities, Topography & Statistics of Eastern India, London-1838, Vol. II).

হিন্দু জমিদারদের অমানুষিক অত্যাচার কাহিনী, তিতুমীরের জমিদার বিরোধী আন্দোলন যথাস্থানে আলোচিত হবে।

সামগ্রিকভাবে বাংলার মুসলিম সমাজের অবস্থা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কেমন ছিল, তার একটা নিখুঁত চিত্র অংকন করতে হলে জানতে হবে এ সমাজের তিনটি প্রধান উপাদান বা অংগ অংশে কোন্ অবস্থা বিরাজ করছিল। সমাজের সে তিনটি অংগ অংশ হলো—নবাব, উচ্চশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়।

১। নবাব

পলাশী যুদ্ধের পর বাংলার নবাব হয়ে পড়েছিলেন কোম্পানীর হাতের পুতুল। চব্বিশ পরগণা, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম কোম্পানীকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। দেশের অভ্যন্তরে ব্যবসা-বাণিজ্যে তাদেরকে একচেটিয়া অধিকার দেয়া হয়। উপরন্তু কোম্পানী ও তাদের সাদা-কালো কর্মচারীদেরকে মোটা উপঢৌকনাদি দিতে হতো। মীর জাফর যেসব উপঢৌকনাদি দিয়েছিল, কোম্পানীর ১৭৭২ সালের সিলেক্ট কমিটির হিসাব অনুযায়ী তার মূল্য ছিল বার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড। ১৭৬৫ সালের পর নবাবকে বার্ষিক ভাতা দেয়া হয় ৫৩,৮৬,০০০ টাকা। ১৭৭০ সালে তা হ্রাস করে করা হয় বত্রিশ লক্ষ এবং ১৭৭২ সালে মাত্র ষোল লক্ষ টাকা। পূর্বে নবাবগণ তাঁদের অধীনে বহু মুসলমানকে চাকুরীতে নিয়োজিত করতেন। সম্ভ্রান্ত পরিবারসমূহকে প্রচুর আর্থিক সাহায্য, জায়গীর প্রভৃতি দান করতেন। তা সব বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে তাঁরা চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কিছু সংখ্যক বাংলাদেশ পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান তাঁদের ভাগ্যান্বেষণের জন্যে এবং অবশিষ্ট দারিদ্রে নিষ্পেষিত হতে থাকেন।

২। সম্ভ্রান্ত বা উচ্চশ্রেণীর মুসলমান

সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ বিজয়ীর বেশে অথবা দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষী হিসাবে বিভিন্ন সময়ে এ দেশে আগমন করেন। অতঃপর এ দেশকে তাঁরা মনেপ্রাণে ভালোবেসে এটাকেই তাঁদের চিরদিনের আবাসভূমিরূপে গ্রহণ করেন। বিজয়ী হিসাবে স্বভাবতঃই তাঁরা সরকারের বিভিন্ন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার অধিকার রাখতেন। হান্টার বলেন, একটি সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার তিনটি প্রধান সূত্র থেকে সম্পদ আহরণ করতো— সামরিক বিভাগের নেতৃত্ব, রাজস্ব আদায় এবং বিচার বিভাগ ও প্রশাসন ক্ষেত্রে চাকুরী।

প্রথম সূত্রটি, বলতে গেলে, ছিল তাদের একেবারে একচেটিয়া। মীর জাফর স্বয়ং আশি হাজার সৈন্য চাকুরী থেকে অপসারিত করে। নজমুদ্দৌলা তার আপন মর্যাদা রক্ষার্থে যে পরিমাণসংখ্যক সৈন্যের প্রয়োজন হতো তাই রাখতে পারতো। ফলে, বাংলা বিহারের কয়েক লক্ষ মুসলমান বেকারত্ব ও দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হতে থাকে।

হান্টার বলেন, জীবিকার্জনের সূত্রগুলির প্রথমটি হচ্ছে, সেনাবাহিনী। সেখানে মুসলমানদের প্রবেশাধিকার রুদ্ধ হ'য়ে যায়। কোন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান আর আমাদের সেনাবাহিনীতে প্রবেশ করতে পারে না। যদিও কদাচিৎ আমাদের সামরিক প্রয়োজনের জন্যে তাদেরকে কোন স্থান দেয়া হতো, তার দ্বারা তার অর্থোপার্জনের কোন সুযোগই থাকতো না।

তাদের অর্থ উপার্জনের দ্বিতীয় সূত্র ছিল—রাজস্ব আদায়ের গুরুত্বপূর্ণ পদ। কিন্তু উপরে বর্ণিত হ'য়েছে কিভাবে নিম্নপদস্থ হিন্দু রাজস্ব আদায়কারীগণ কোম্পানীর অনুগ্রহে এক লাফে মুসলমানদের জমিদারীর মালিক হ'য়ে বসে।

লর্ড মেট্‌কাফ্ ১৮২০ সালে মন্তব্য করেন ঃ দেশের জমি-জমা প্রকৃত মালিকের নিকট থেকে কেড়ে নিয়ে একশ্রেণীর বাবুদের নিকটে হস্তান্তরিত করা হয়—যারা উৎকোচ ও চরম দুর্নীতির মাধ্যমে ধনশালী হয়ে পড়েছিল। এ এমন এক ভয়াবহ নির্যাতনমূলক নীতির ভিত্তিতে করা হয় যার দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। —(E. Thompson : The life of Charls Lord Metcalfe; A.R. Mallick : British Policy and the Muslims of Bengal).

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেই রাজস্ব বিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত মুসলমান কর্মচারী ও ভূমির প্রকৃত মালিকের স্থান অধিকার করে বসে ইংরেজ ও হিন্দুগণ।

আবহমান কাল থেকে ভারতের মুসলমান শাসকগণ জনগণের শিক্ষা বিস্তারকল্পে মুসলিম মনীষীদেরকে জায়গীর, তমঘা, আয়মা, মদদে-মায়াশ প্রভৃতি নামে লাখেরাজ ভূ-সম্পত্তি দান করতেন। বুকাননের মতে একমাত্র বিহার ও পাটনা জেলায় একুশ প্রকারের লাখেরাজ ভূমি দান করা হয়েছিল বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে। ইংরেজ আমলে নানান অজুহাতে এসব লাখেরাজদারকে তাদের মালিকানা থেকে উচ্ছেদ করা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বর্ধমানের স্পেশাল ডিপুটি কলেক্টর মিঃ টেইলার একদিনে ৪২৯ জন লাখেরাজদারের বিরুদ্ধে তাদের অনুপস্থিতিতে রায় দান করেন।

ইংরেজ সরকারের Tribunals of Resumption-এর অধীনে লাখেরাজ সম্পত্তি সরকারের পুনর্দখলে নেয়া হয়। চট্টগ্রাম বোর্ড অব রেভেনিউ-এর জনৈক অফিসার নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন ঃ সরকারের নিয়তের প্রতি লাখেরাজদারগণ সন্দিগ্ধ হ'য়ে পড়লে তাতে বিস্ময়ের কিছুই থাকবে না। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

১৪৮৬৩টি মামলার মধ্যে সব কয়টিতেই লাখেরাজদারদের অনুপস্থিতিতে সরকারের পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ তিক্ত অভিজ্ঞতার পর Tribunals of Resumption-এর প্রতি তাদের আস্থাহীন হবারই কথা (Comment by Smith on Harvey's Report of 19th June 1840: A.R. Mallick : British Policy and the Muslims of Bengal).

মুসলমান লাখেরাজদারদের ন্যায্য ভূমির মালিকানা থেকে উচ্ছেদ করার জন্যে নানাবিধ হীনপন্থা অবলম্বন করা হতো এবং ইংরেজ কর্মচারীদের মধ্যে এ ব্যাপারে এক বিদ্বেষদুষ্ট মানসিকতা বিরাজ করতো। লাখেরাজদারদের সনদ রেজেস্ট্রী না করার কারণে বহু লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করা হয়। জেলার কালেকটরগণ ইচ্ছা করেই সময় মতো সনদ রেজেস্ট্রী করতে গড়িমসি করতো। তার জন্যে চেষ্টা করেও লাখেরাজদারগণ সনদ রেজেস্ট্রী করাতে পারতেন না।

চট্টগ্রামে লাখেরাজদারদের কোর্টে হাজির হবার জন্যে কোন নোটিশই দেয়া হতো না। অনেকক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে যে, মামলায় ডিক্রী জারী হবার বহু পূর্বেই সম্পত্তি অন্যত্র পত্তন করা হয়েছে। ১৮২৮ থেকে ১৮৫১ সাল পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে সমগ্র বাংলা বিহারে লাখেরাজদারদের মিথ্যা তথ্য সংগ্রহের জন্যে চর, ভূয়া সাক্ষী ও রিজাম্পশন অফিসার পংগপালের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং মুসলমানদেরকে মামলায় জড়িত করে। এসব মামলায় সরকার ছাড়াও তৃতীয় একটি পক্ষ বিরাট লাভবান হয়। যারা মিথ্যা সাক্ষ্যদান করে এবং যারা সরকারী কর্মচারীদের কাছে কাল্পনিক তথ্য সরবরাহ করে—তারা প্রভূত অর্থ উপার্জন করে। পক্ষান্তরে, মুসলিম উচ্চশ্রেণী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ার ফলে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বন্ধ হ'য়ে যায়।

পন্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু বলেন ঃ

ইংরেজরা বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেখানে বহু 'মুয়াফী' অর্থাৎ লাখেরাজ ভূ-সম্পত্তির অস্তিত্ব ছিল। তাদের অনেক ছিল ব্যক্তিগত, কিন্তু অধিকাংশই ছিল শিক্ষায়তনগুলির ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ্‌কৃত। প্রায় সকল প্রাইমারী স্কুল, মকতব এবং বহু উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান এসব 'মুয়াফীর' আয় নির্ভর ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বিলাতে তাদের অংশীদারগণকে মুনাফা

দেয়ার জন্যে তাড়াতাড়ি টাকা তোলার প্রয়োজনবোধ করে। কারণ কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ এজন্যে খুব চাপ দিচ্ছিল। তখন এক সুপরিকল্পিত উপায়ে 'মুয়াফী'র ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নীতি গৃহীত হয়। এসব ভূ-সম্পত্তির সপক্ষে কঠিন সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশ করার হুকুম জারী করা হয়।

কিন্তু পুরানো সনদগুলি ও সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র ইতিমধ্যে হয় কোথাও হারিয়ে গেছে, নয় পোকায় খেয়ে ফেলেছে। অতএব প্রায় সকল 'মুয়াফী' বা লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হলো। বহু বনেদী ভূম্যাধিকারী স্বত্বচ্যুত হলেন। বহু স্কুল কলেজের আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে গেল। এভাবে বহু জমি সরকারের খাস দখলে আসে আর বহু বনেদী বংশ উৎখাত হয়ে যায়। এ পর্যন্ত যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উপরোক্ত 'মুয়াফী'র আয় নির্ভর ছিল, সেগুলি বন্ধ হ'য়ে গেল। বহু সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষা বিভাগীয় কর্মচারী বেকার হ'য়ে পড়লেন। —(Pandit Jawaherlal Nehru : The Discovery of India, pp.376-77)

উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মুসলমানদের জীবিকার্জনের তৃতীয় অবলম্বন ছিল সরকারের অধীনে চাকুরী—বিচার ও প্রশাসনিক বিভাগগুলিতে। কোম্পানী দেওয়ানী লাভের পরও প্রায় পঞ্চাশ বছর যাবত তাঁরা চাকুরীতে বহাল ছিলেন। কারণ তখন পর্যন্ত সরকারী ভাষা ছিল ফারসী। কিন্তু হঠাৎ আকস্মিকভাবে ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজীকে সরকারী ভাষা করা হয়। মুসলমানগণ তার জন্যে পূর্ব থেকে মোটেইপ্রস্তুত ছিলেন না। ১৮৩২ সালে সিলেক্ট কমিটির সামনে ক্যাপ্টেন টি ম্যাকাম প্রস্তাব পেশ করেন যে, ক্রমশঃ ইংরেজী ভাষার প্রচলন করা হোক এবং মুসলমান কর্মচারীদেরকে অন্ততঃ পাঁচ/ছ'বছরের অবকাশ দিয়ে নোটিশ দেয়া হোক। হন্ট্ ম্যাকেঞ্জীও অনুরূপ প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি বলেন, জেলাগুলিতে ক্রমশঃ এবং পর পর ইংরেজীর প্রচলন করা হোক। কিন্তু সহসা সর্বত্র এ পরিবর্তন সাধিত হওয়ার ফলে হাজার হাজার মুসলমান কর্মচারী চাকুরী থেকে অপসারিত হন যাদের জীবিকা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতো একমাত্র চাকুরীর উপর। ১৮২৯ সালে সবরকম শিক্ষার বাহন হিসাবে স্কুল-কলেজে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দেয়া শুরু হয়। ১৮৩৭ সালের ১লা এপ্রিল থেকে (তৎকালীন আর্থিক বৎসরের প্রথম দিন) সহসা সরকারী ভাষা হিসাবে ইংরেজীর প্রবর্তন হয়।

হান্টার সাহেবও এসব সত্য স্বীকার করে বিদ্রূপ করে বলেছেন ঃ

"এখন কেবলমাত্র জেলখানায় দু'একটা অধঃস্তন চাকুরী ছাড়া আর কোথাও ভারতের এই সাবেক প্রভুরা ঠাঁই পাচ্ছে না। বিভিন্ন অফিসে কেরানীর চাকুরীতে, আদালতের দায়িত্বশীল পদে, এমনকি পুলিশ সার্ভিসের উর্ধ্বতন পদগুলিতে সরকারী স্কুলের উৎসাহী হিন্দু যুবকদেরকে নিযুক্ত করা হচ্ছে।"

এ পরিবর্তনের ফলে হিন্দু সম্প্রদায় পূর্ণ সুফল ভোগ করে। বিভিন্ন কলেজ থেকে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করে তারা সর্বত্র সরকারী চাকুরীতে একচেটিয়া অধিকার লাভ করে। পক্ষান্তরে রাজনৈতিক অংগনে পট পরিবর্তনের ফলে সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারসমূহ জীবিকার্জনের সকল সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হ'য়ে দারিদ্র্য, অনাহার ও ধ্বংসের মুখে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩। নিম্নশ্রেণীর মুসলমান ঃ কৃষক ও তাঁতী

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষককুলের যে চরম দুর্দশা হ'য়েছিল তার কিঞ্চিত আভাস উপরে দেয়া হয়েছে। একথারও উল্লেখ করা হয়েছে যে, জমিদার এবং প্রকৃত কৃষকদের মধ্যে আরও দুটি স্তর বিরাজ করতো। যথা পত্তনীদার ও উপপত্তনীদার। জমিদারের প্রাপ্য খাজনার কয়েকগুণ বেশী এ দুই শ্রেণীর মাধ্যমে রায়তদের কাছ থেকে আদায় করা হতো এবং তাতে করে রায়ত বা কৃষকদের শোষণ-নিষ্পেষণের কোন সীমা থাকতো না। জমিদার-পত্তনীদারদের উৎপীড়নে তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়তো। বাধ্য হয়ে তাদেরকে হিন্দু মহাজনদের দ্বারস্থ হতে হতো। শতকরা ৩৭ টাকা থেকে ৬০ টাকা পর্যন্ত হারে সুদে তাদেরকে টাকা কর্জ করতে হতো। উপরন্তু তাদের গরু/মহিষ মহাজনের কাছে বন্ধক রাখতে হতো। অভাবের দরুন মহাজনের কাছে অগ্রিম কোন শস্য গ্রহণ করতে হলে তার দ্বিগুণ পরিশোধ করতে হতো। আবার উৎপন্ন ফসল যেহেতু মহাজনের বাড়ীতেই তুলতে হতো, এখানেও তাদেরকে প্রতারিত করা হতো। মোটকথা হতভাগ্য কৃষকদের জীবন নিয়ে এসব জমিদার মহাজনরা ছিনিমিনি খেলে আনন্দ উপভোগ করতো।

কৃষকদের এহেন দুঃখ-দুর্দশার কোন প্রতিকারের উপায়ও ছিল না। কারণ তা ছিল অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। উপরন্তু জমিদার ও তাদের দালালগণ উৎকোচ ও

নানাবিধ দুর্নীতির মাধ্যমে মামলার খরচ কয়েকগুণে বাড়িয়ে দিত। পরিণাম ফল এই হতো যে, জমিদার মহাজন তাদেরকে ভিটেমাটি ও জমিজমা থেকে উচ্ছেদ করে পথের ভিখারীতে পরিণত করতো।

কৃষক সম্প্রদায় ধান ও অন্যান্য শস্যাদি উৎপন্নের সাথে সাথে নীলচাষও করতো। এই নীলচাষের প্রচলন এদেশে বহু আগে থেকেই ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ভারত থেকে নীল রং সর্বপ্রথম ইউরোপে রপ্তানী হয়। ব্রিটিশ তাদের আমেরিকান ও পশ্চিম ভারতীয় উপনিবেশগুলিতে নীলচাষের ব্যবস্থা করে। এগুলি তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবার পর বাংলা প্রধান নীল সরবরাহকারী দেশে পরিণত হয়। ১৮০৫ সালে বাংলায় নীলচাষের পরিমাণ ছিল ৬৪,৮০৩ মণ এবং ১৮৪৩ সালে তার পরিমাণ হ'য়ে পড়ে দ্বিগুণ। বাংলা, বিহার এবং বিশেষ করে ঢাকা, ফরিদপুর, রাজশাহী, পাবনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি মুসলিম অধ্যুষিত জেলাগুলিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রিটিশের তত্ত্বাবধানে ব্যাপক আকারে নীলচাষ করা হয়। কিন্তু বিদেশী শাসকগণ নীলের এমন নিম্নমূল্য বেঁধে দেয় যে, চাষীদের বিঘাপ্রতি সাত টাকা ক'রে লোকসান হয় যা ছিল বিঘাপ্রতি খাজনার সাতগুণ। তথাপি চাষীদেরকে নীলচাষে বাধ্য করা হতো। বাংলার নীলচাষীদের উপরে শাসকদের অমানুষিক অত্যাচার উৎপীড়নের মর্মন্তুদ ও লোমহর্ষক কাহিনী ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। ক্ষমতা মদমত্ত শাসক ও তাদের দালালদের মানবতাবোধ সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছিল। নতুবা তাদের নিষ্পেষণের দরুন কৃষক সমাজের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মর্মন্তুদ হাহাকারে বাংলার আকাশ বাতাস বিদীর্ণ হতো না।

দরিদ্র ও দুঃস্থ কৃষকগণ বেঁচে থাকার জন্যে নীলচাষের মাধ্যমে কিছু অর্থ উপার্জনের আশা করতো। তাদের দারিদ্র্য ও অসহায়তার সুযোগে ইংরেজ নীলকরগণ কৃষকদের স্বার্থের পরিপন্থী বিভিন্ন চুক্তিতে আবদ্ধ হ'তে তাদেরকে বাধ্য করতো। তাদের হালের গরু-মহিষ ধরে নিয়ে বেঁধে রাখতো এবং মারের চোটে কৃষকদেরকে নীলকরদের ইচ্ছানুযায়ী চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করতো। অনেক সময় অনিচ্ছুক কৃষকদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিত। এতেও সম্মত করতে না পারলে জাল চুক্তিনামার বলে তাদের জমাজমি জবরদখল ক'রে নীলকরগণ তাদের কর্মচারীদের দ্বারা সেসব জমিতে নীলচাষ করাতো। কখনো কখনো অত্যাচারী জমিদার তার প্রজাকে শাস্তি দেবার জন্যে তার কাছ থেকে

জমি কেড়ে নিয়ে নীলকরদেরকে দিয়ে দিত। একবার অ্যাশলী ইডেন নীল কমিশনের সামনে ১৮৬০ সালে সাক্ষ্যদানকালে বলেন যে, বিভিন্ন ফৌজদারী রেকর্ড থেকে জানা যায় যে, ঊনপঞ্চাশটি ঘটনা এমন ঘটেছে, যেখানে নীলকরগণ দাংগা, হত্যা, অগ্নিসংযোগ, ডাকাতি, লুটতরাজ এবং বলপূর্বক অপহরণ প্রভৃতি গুরুতর অপরাধে জড়িত থাকে। তার বহু বৎসর পূর্বে জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট একজন খৃষ্টান মিশনারীর সামনে মন্তব্য করেন যে, মানুষের রক্তে রঞ্জিত হওয়া ব্যতীত একবাক্স নীলও ইংলন্ডে প্রেরিত হয় না। (১৮৬১ সালের নীল কমিশন রিপোর্ট এবং ক্যালকাটা খৃষ্টান অবজার্ভার, নভেম্বর, ১৮৫৫ সাল)।

নীল চাষীদের দুঃখ-দুর্দশার কোন প্রতিকারের উপায় ছিল না। চৌকিদার-দফাদারের সামনে চাষীদের উপর নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করা হলেও চৌকিদারদের ঘৃণাক্ষরেও সেকথা প্রকাশ করার সাধ্য ছিল না। একবার নিষ্ঠুর নীলকরগণ একটি গ্রামে অগ্নিসংযোগ করলে তা নির্বাপিত করার জন্যে এক ব্যক্তি চীৎকার ক'রে লোকজন জড়ো করে। তার জন্যে তাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করে আহত অবস্থায় একটি অন্ধকার কামরায় চার মাস আটক রাখা হয়। ওদিকে আবার নীলকরগণ পুলিশকে মোটা ঘুষ দিয়ে বশ করে রাখতো। (নীল কমিশন রিপোর্ট ১৮৬১)।

হতভাগ্য অসহায় কৃষকগণ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট থেকে কোন প্রকারের প্রতিকার ও ন্যায় বিচারের আশা করতে পারতো না। উক্ত নীল কমিশন রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, সাদা চামড়ার ম্যাজিস্ট্রেটগণ আপন দেশবাসীদের পক্ষই অবলম্বন করতো। ফৌজদারী আইন-কানুন এমনভাবে তৈরী করা হয়েছিল যে, ইংরেজ প্রজাকে শাস্তি দেয়া ছিল অসম্ভব ব্যাপার। একজন দরিদ্র প্রজা সুদূর প্রত্যন্ত এলাকায় তার স্ত্রী-পুত্র-পরিজনকে ফেলে কোলকাতায় গিয়ে মামলা দায়ের করার সাহস রাখতো না। কারণ তার অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের জানমাল ইয্যৎ-আবরু নীলকরদের দ্বারা বিনষ্ট হতো। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলিতে অধিক পরিমাণে নীলচাষ করা হতো। ফলে নিম্নশ্রেণীর মুসলমান নীলকরদের চরম নির্যাতন-নিপীড়নের সার্বক্ষণিক শিকারে পরিণত ছিল।

তাঁতী

কৃষক শ্রেণীর মতো এদেশে তাঁতী শ্রেণীও চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়। বাংলা-বিহারের লক্ষ লক্ষ মুসলমান তাঁতশিল্প দ্বারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করতো। ঊনবিংশতি শতাব্দী শেষ হবার পূর্বেই লাভজনক ব্যবসা হিসাবে তাঁত শিল্পের মৃত্যু ঘটেছিল। তথাপি উপায়ান্তর না থাকায় যেসব মুসলমান তখন পর্যন্ত তাঁতশিল্প আঁকড়ে ধরে ছিল, ১৮৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী তাদের সংখ্যা বিহার প্রদেশ ও বাংলার কয়েকটি জেলায় ছিল ৭,৭১,২৩৭। নদিয়া, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, জলপাইগুড়ি, নোয়াখালী, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের তাঁতীগণ ছিল এ সংখ্যার বাইরে। অতএব কোম্পানী আমলের প্রথমদিকে সমগ্র বাংলা ও বিহারে মুসলমান তাঁতীর সংখ্যা অন্ততঃপক্ষে উপরোক্ত সংখ্যার যে দশগুণ ছিল তা বিনা দ্বিধায় বলা যেতে পারে। এসব তাঁতী ব্যবসায়ীদের কিভাবে সর্বনাশ করা হয়েছিল, তার কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশে আগমনের পূর্বে এদেশের তাঁতশিল্প চরম উৎকর্ষ সাধন করেছিল। প্রতিটি জেলায় বিশিষ্ট ধরনের অতি উৎকৃষ্ট তাঁতবস্ত্র নির্মিত হতো। চাহিদা মেটাবার জন্যে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস আমদানী করা হতো। এসব তাঁতশিল্প থেকে মোটা ও মিহি উভয় প্রকারের বস্ত্র তৈরী হতো। ভারত ছিল মোটা বস্ত্রের বাজার এবং সূক্ষ্ম ও অতিসূক্ষ্ম বস্ত্র ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী করা হতো। মুসলমান শাসকদের সাহায্য সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকার রেশমজাত অতিসূক্ষ্ম 'মসলিন' বস্ত্র দু'শতাব্দী ব্যাপী ইউরোপীয় বাজারে বিরাট আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল। মোটা বস্ত্র হোক, অথবা অতিসূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্র উভয় বস্ত্রই ছিল মুসলমান তাঁতশিল্পীদের বিরাট অবদান। উইলিয়াম বোল্ট নামক জনৈক ইংরেজ বণিক, কোম্পানী কর্তৃক তাঁতীদের উপর অকথ্য নির্যাতনের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, সকল ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার। ইংরেজ এবং তাদের অধীনস্থ হিন্দু বেনিয়া ও গোমস্তাগণ আপন খুশী খেয়াল মতো কাপড়ের দর বেঁধে দিয়ে সে দরে নির্দিষ্ট পরিমাণের বস্ত্র সরবরাহ করতে তাঁতীদেরকে বাধ্য করতো। নীলকরদের মতো তাঁতীদের স্বার্থ-বিরোধী চুক্তিতে স্বাক্ষর করতেও তাদেরকে বাধ্য করা হতো। নির্দিষ্ট কোয়ালিটির বস্ত্র নির্দিষ্ট পরিমাণে তাদেরই বেঁধে দেয়া দরে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরবরাহ করতে তাঁতীদেরকে বাধ্য করা হতো—ওসব চুক্তি বলে। তাদের

বেঁধে দেয়া দর আবার বাজার দর থেকে শতকরা পনেরো থেকে চল্লিশ ভাগ কম হতো। কোম্পানী ও তার অত্যাচারী দালালদের মনস্তুষ্টি সাধন করতে না পারলে তাঁতীদেরকে বেত্রাঘাত করা হতো। এ যেন জ্যান্ত চামড়া খুলে মানুষের মাংস ভক্ষণ করা। আদিম যুগে অরণ্য নিবাসী অসভ্য বর্বর মানুষ প্রয়োজনবোধে নর-নারীর মাংসে ক্ষুধা নিবৃত্তি করতো বলে শুনা যায়। কিন্তু তাদের চেয়ে এসব তথাকথিত সভ্য ইংরেজ ও তাদের দালালগণ কোন্ দিক দিয়ে উৎকৃষ্টতর ছিল?

পরবর্তীকালে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ বাংলার বস্ত্রশিল্পে চরম আঘাত হানে। তারা বাংলা থেকে তৈরী বস্ত্র ইংলন্ডে আমদানী না করে কাঁচামাল হিসেবে কার্পাস ও রেশম আমদানী করতে থাকে। অতঃপর তারা সুপারিশ করে যে, রেশমী বস্ত্রের কারিকরগণকে নিজেদের তাঁতে কাজ করার পরিবর্তে কোম্পানীর নিজস্ব কলকারখানায় কাজ করতে বাধ্য করা হোক। পরিণামে এ শিল্পপ্রধান দেশটি ইংলন্ডের বস্ত্র নির্মাতাদের কাঁচামালের বাজারে পরিণত হয়। ১৭৮৯ সালের পর থেকে ঢাকার সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্রের রপ্তানী হ্রাস পেতে থাকে। ১৭৯৯ সালে শুধুমাত্র ঢাকা থেকে বস্ত্র রপ্তানী হয়েছিল ১২ লক্ষ টাকার। সেকালের বার লক্ষকে এখনকার টাকার মূল্যমানে অনায়াসে বার কোটি বলা যেতে পারে। ১৮১৩ সালে রপ্তানী হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকায়। ১৮১৭ সালে ঢাকার উৎপন্ন বস্ত্রের রপ্তানী একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

মোটকথা বাংলা বিহারের বস্ত্রশিল্প ধ্বংস করে উপার্জনহীন তাঁতী সম্প্রদায়ের রক্তমাংসে গড়ে উঠে মানচেস্টারের বস্ত্রশিল্প। ক্রমে রপ্তানীকারী দেশ আমদানীকৃত মালের বাজারে পরিণত হয়। ১৭৮৬ থেকে ১৭৯০ সাল পর্যন্ত এদেশে বার্ষিক বস্ত্র আমদানী হতো বার লক্ষ পাউন্ড মূল্যের। ১৮০৯ সালে তার পরিমাণ দাঁড়ায় এক কোটি চৌরাশি লক্ষ পাউন্ড মূল্যের। ব্রিটিশের নীতিই ছিল ধীরে ধীরে এদেশের তাঁতী সম্প্রদায়কে নির্মূল করা, যারা ছিল প্রায়ই মুসলমান। (আবদুল মওদূদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ)।

তাঁতীদের দুঃখ-দুর্দশার করুণ চিত্র এঁকেছেন পন্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু তাঁর The Discovery of India গ্রন্থে। তিনি বলেন, এসব তাঁতীদের পুরানো পেশা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। নতুন কোন পেশার দ্বার উন্মুক্ত ছিল না। উন্মুক্ত ছিল শুধু মৃত্যুর দ্বার। মৃত্যুবরণ করলো লক্ষ লক্ষ। লর্ড বেন্টিংক ১৮৩৪ সালের

রিপোর্টে বলেন, তাদের দুঃখ-দুর্দশার তুলনা নেই বাণিজ্যের ইতিহাসে। ভারতের পথঘাট পূর্ণ হয়েছে তাঁতীদের অস্থিতে। —(Pandit Nehru : The Discovery of India, p. 352)।

মোটকথা, পলাশীর যুদ্ধে এদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে তুলে দেয়ার পর থেকে একশত বছরের সঠিক ইতিহাস ও বিভিন্ন তথ্যাবলী থেকে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, এ সময়কালের ইতিহাস বাংলার মুসলমানদের শোষণ, লুণ্ঠন, নির্যাতন-নিষ্পেষণ, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা ও হত্যাযজ্ঞের ইতিহাস। আর এ কাজে ইন্ধন যুগিয়েছে, সর্বপ্রকারে সাহায্য সহযোগিতা করেছে কোম্পানী সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট দেশীয় 'বাবুদের' দল। দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার মূল্যও তারা লাভ করে পূর্ণমাত্রায়। আর তা হলো এই যে, দেশের সমুদয় জমিদারী, জোতদারী প্রকৃত মালিকের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে এসব 'বাবুদের' দেয়া হয়েছে চিরকালের জন্যে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগের জন্যে। আর এরা অগাধ ধন-ঐশ্বর্যের মালিক হ'য়ে পড়ে উৎকোচ ও দুর্নীতির মাধ্যমে। —(E. Thompson : The life of Charles Lord Metcalfe; A. R. Mallick : British Policy & the Muslims of Bengal).

শোষণ-নিষ্পেষণের মর্মান্তিক দৃষ্টান্ত হলো এই যে, 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে' বাংলার লোক মরেছে তিনভাগের একভাগ, চরম অবনতি ঘটেছে চাষবাসের। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস হিসাব কষে ও কড়া চাপে নির্ধারিত রাজস্বেরও বেশী টাকা আদায় করেছেন মুমূর্ষু কৃষকদের কাছ থেকে; রাজস্বের শতকরা একভাগও দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জনসাধারণের দুঃখ মোচনের জন্যে খরচ করেননি। বরঞ্চ বাখরগঞ্জ জেলার ৩৩,৯১৩ মণ চাউল বিক্রয় ক'রে ৬৭,৫৯৩ টাকা মুনাফা লুটেছেন। ঢাকার ৪০,০০০ মণ চাউল বাঁকীপুরের সেনানিবাসে গুদামজাত করেছেন, বলেছেন আবদুল মওদূদ তাঁর 'মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ' গ্রন্থে (পৃঃ ৬৩)।

আবদুল মওদূদ আরও বলেন, যে তাজমহলকে স্থপতিরা পৃথিবীর বুকে স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করেন, যার নির্মাণকর্মে ২৩ কোটি ডলার ব্যয়িত হয়েছিল এবং যার পরিকল্পনা মানস সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিজয়ীর মানসকেও ম্লান করে লজ্জা দেয়, সেই তাজমহলটিকে ভেঙে তার মাল-মসলা আত্মসাৎ করার জন্যে ভারতে অন্যতম পরম দয়ালু ও কল্যাণসাধক বড়লাট

হিসাবে নন্দিত লর্ড বেন্টিংক একবার একজন হিন্দু কন্ট্রাক্টরকে মাত্র দেড় লক্ষ ডলারে বিক্রয় করারও চুক্তি করেছিলেন। (The Round the World Traveller, Loreng : p. 379)। ওয়ারেন হেস্টিংস দেওয়ান-ই-খাসের হামামখানাটি উপড়ে নিয়ে বিলাতে চতুর্থ জর্জকে উপহার পাঠিয়েছিলেন এবং লর্ড বেন্টিংক প্রাসাদটির অন্যান্য অংশ বিক্রয় করে ভারতের রাজস্ব বৃদ্ধি করেছিলেন (India : Chirol—p. 54; The Story of Civilization, Our Oriental Heritage by Will Durant, pp. 609-10)।

এমনি, মহামূল্য লুণ্ঠিত 'কোহিনূর' এখনো ইংলন্ডের শাহীমহলের শোভা বর্ধন করছে। এহেন লুণ্ঠনকার্যের দ্বারা শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতা-ভব্যতায় গর্বিত ইংরেজদের চরম হীন প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

এডমন্ড বার্ক সত্যিই নির্মম উক্তি করেছেন ঃ আমাদের আজ যদি ভারত ছাড়তে হয়, তাহলে ওরাংওটাং বা বাঘের চেয়ে কোন ভালো জানোয়ারের অধিকারে যে এদেশ ছিল তার প্রমাণ করবার কিছুই থাকবে না। (আবদুল মওদূদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ, পৃঃ ৬৪)।

কোম্পানীর শাসন আমল সমাপ্তির পূর্বক্ষণে জন ব্রাইট বলেছিলেন, "ভারতের নিরীহ জনগণের উপর এক শ' বছরের ইতিহাস হলো অকথ্য অপরাধসমূহের ইতিহাস (Oxford History of India : p. 680).

হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক ঃ ধর্ম ও সংস্কৃতি

মুসলমানরা, মধ্যযুগের প্রারম্ভকাল থেকে আরব, তুরস্ক, ইরান-তুরান, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে বাংলা তথা ভারত উপমহাদেশে আগমন করে। অতঃপর এ দেশকে তারা ভালোবেসেছে মনে-প্রাণে, তাদের চিরন্তন আবাসভূমি হিসাবে গ্রহণ করেছে এ দেশকে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ দেশের হিন্দুর সাথে পাশাপাশি বসবাস করে এসেছে। কিন্তু ঐতিহাসিক নির্মম সত্য এই যে, হাজার বছরেরও বেশী কাল হিন্দু-মুসলমান একত্রে পাশাপাশি বাস করে, একই আকাশের নীচে একই আবহাওয়ায় পালিত বর্ধিত হয়েও এ দু'টি জাতি যে শুধু মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়নি, তাই নয়, বরঞ্চ তাদের মধ্যে আত্মিক সম্পর্কও গড়ে উঠতে পারেনি। অবশ্য এ সুদীর্ঘকালের মধ্যে তারা উভয়ে কখনো কখনো মিলেমিশে কাজ-কর্ম করেনি, একে অপরের সুখ-দুঃখের

অংশীদার হয়নি, তা নয়। তবে তা বিশেষ স্থান, কাল ও ক্ষেত্র বিশেষে—জাতি হিসাবে নয়, প্রতিবেশী হিসাবে। সেও আবার সাময়িকভাবে। তাদের মধ্যে সৌহার্দ ও একাত্মতার স্থায়ী শিকড় বদ্ধমূল হতে পারেনি কখনো।

এই যে পাশাপাশি বসবাস করেও উভয়ের মধ্যে দূরত্ব অক্ষুণ্ন রইলো এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন ঃ

এই দুই সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস ও সমাজবিধান সম্পূর্ণ বিপরীত · · · হিন্দুরা বাংলা সাহিত্যের প্রেরণা পায় সংস্কৃত থেকে আর মুসলমানরা পায় আরবী-ফারসী থেকে। মুসলমানদের ধর্মের গোঁড়ামি যেমন হিন্দুদেরকে তাদের প্রতি বিমুখ করেছিল, হিন্দুদের সামাজিক গোঁড়ামিও মুসলমানদেরকে তাদের প্রতি সেরূপ বিরূপ করেছিল। · · · হিন্দুরা যাতে মুসলমান সমাজের দিকে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখাতে না পারে, তার জন্যে হিন্দু সমাজের নেতাগণ কঠোর বিধানের ব্যবস্থা করেছিলেন। (রমেশ চন্দ্র মজুমদার ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস মধ্যযুগ, পৃঃ ২৪১-৪৩ ও ৩৩৪-৫০)।

উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ব্যবধান, তা দূরীভূত হয়ে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে না উঠার কারণ বর্ণনা করেছেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বলেন ঃ

"সকলের চেয়ে গভীর আত্মীয়তার ধারা নাড়ীতে বয়, মুখের কথায় বয় না। যাঁরা নিজেদের এক মহাজাত বলে কল্পনা করেন, তাঁদের মধ্যে নাড়ীর মিলনের পথ ধর্মের শাসনে চিরদিনের জন্য যদি অবরুদ্ধ থাকে, তাহলে তাঁদের মিলন কখনই প্রাণের মিলন হবে না। —[রবীন্দ্র রচনাবলী (শতবার্ষিকী সংস্করণ), ১৩'শ খন্ড- পৃঃ ৩০৮]

অতএব দেখা যাচ্ছে এই যে পার্থক্য এবং দূরত্ব এ শুধু বাহ্যিক ও কৃত্রিম নয়। এর গভীর মূলে রয়েছে উভয়ের পৃথক পৃথক ও বিপরীতমুখী ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতি। ভারতের এককালীন বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর শাসনতান্ত্রিক উপদেষ্টা H. V. Hodson ভারতের হিন্দু-মুসলমান দু'টি জাতি সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন, তা এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেন ঃ

"· · · এখানে বিরাট দু'টি সম্প্রদায় আছে যারা বসবাস করে একই দেশে, বলতে গেলে একই গ্রামে, একই সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে এবং একই সরকারের অধীনে। মূল জাতির দিক দিয়ে আলাদাও নয়। কারণ অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমান তাদের প্রতিবেশী হিন্দুর ঊর্ধ্বতন পূর্ব পুরুষদেরই

বংশসম্ভূত। তথাপি পৃথক ও স্বতন্ত্র। শুধুমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাস ও রীতি-পদ্ধতির দিক দিয়েই স্বতন্ত্র নয়, বরঞ্চ জীবনের সামগ্রিক বিধান ও মানসিক দৃষ্টিভংগীর দিক দিয়েও স্বতন্ত্র। প্রত্যেক দল বা সম্প্রদায় স্থায়ী বংশভিত্তিক। না তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহের প্রচলন আছে, আর না মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।" —(H. V. Hodson The Great Divide, p. 10)।

বাংলা তথা ভারত উপমহাদেশে হিন্দু ও মুসলমান আবহমানকাল থেকে তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রেখে চলেছে। ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন ঃ

"মুসলমানেরা মধ্যযুগের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত স্থানবিশেষে ১৩০০ হইতে ৭০০ বৎসর হিন্দুর সংগে পাশাপাশি বাস করিয়াও ঠিক পূর্বের মতো আছে। · · · অষ্টম শতাব্দীর আরম্ভে মুসলমানেরা যখন সিন্দুদেশ জয় করিয়া ভারতে প্রথম বসতি স্থাপন করে, তখনও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে মৌলিক প্রভেদগুলি ছিল, সহস্র বর্ষের পরেও এক ভাষার পার্থক্য ছাড়া ঠিক সেইরূপই ছিল। · · · বর্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতে আমাদের দেশে একটি মতবাদ প্রচলিত হইয়াছে যে, মধ্যযুগে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মিশ্রণের ফলে উভয়েই স্বাতন্ত্র্য হারাইয়াছে। এবং এমন একটি নতুন সংস্কৃতি গঠিত হইয়াছে যাহা হিন্দু সংস্কৃতি নহে, ইসলামীয় সংস্কৃতি নহে— ভারতীয় সংস্কৃতি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাজা রামমোহন রায়, দ্বারিকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি এবং শেষভাগে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বাংলার তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ নায়কগণ ইহার ঠিক বিপরীত মতই পোষণ করিতেন এবং উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য এই বিপরীত মতেরই সমর্থন করে। · · · ১২০০ খৃষ্টাব্দে হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম যাহা ছিল, আর ১৮০০ খৃষ্টাব্দে হিন্দুধর্ম ও সমাজ যাহা হইয়াছিল, এই দুয়ের তুলনা করিলেই সত্যতা প্রমাণিত হইবে। —(রমেশ চন্দ্র মজুমদার ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস মধ্যযুগ, পৃঃ ২৪২-৪৩ ও ৩৩৪-৫০)।

মুসলমান ভারতে আসার পর হতে সহস্রাধিক বৎসর হিন্দুদের সাথে বসবাস করার পর উভয়ে মিলে এক জাতি গঠনের পরিবর্তে উভয়ের স্বাতন্ত্র্য অধিকতর সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় হয়েছে। কে, এম, পান্নিকর তাঁর Survey of India History গ্রন্থে মন্তব্য করেন ঃ "ভারতে একটি ধর্ম হিসাবে ইসলাম প্রবর্তনের প্রধান সামাজিক পরিণামফল দাঁড়ালো এই যে, সমাজ দেহকে খাড়াভাবে দু'ভাগে

বিভক্ত করা হলো। তের শতকের পূর্বে হিন্দু সমাজে যেসব বিভাগ দেখা দিয়াছিল, সেগুলির প্রকৃতি ছিল কিছুটা আনুভূতিক। তখন বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম সমাজদেহে তেমন সামগ্রিক বিচ্ছিন্নতা ঘটাতে পারেনি। হিন্দুধর্মের পক্ষে এসব উপধর্মগুলিকে হজম করা সম্ভব ছিল এবং কালেভদ্রে এরা হিন্দুধর্মের পরিসীমার মধ্যে আপন আপন আঞ্চলিক আবাস গড়ে নিয়েছিল। পক্ষান্তরে ইসলাম ভারতীয় সমাজকে আগাগোড়া স্পষ্ট দু'ভাগে বিভক্ত করে। এবং আজকের দিনের ভাষায় আমাদের নিকট যা দুই জাতিত্ব বলে পরিচিত হয়েছে, তা সেই প্রথম দিনেই জন্মগ্রহণ করে। এরপর থেকে একই ভিত্তির উপর দু'টি সমান্তরাল সমাজ খাড়াভাবে বিভক্ত অবস্থায় বিরাজ করতে থাকে। জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই দু'টি সমাজ পৃথক ও স্বতন্ত্র হয়ে গেল এবং পৃথকভাবেই আত্মপ্রকাশ করলো। উভয়ের মধ্যে কোনরূপ সামাজিক সম্পর্ক–সম্বন্ধ বা জীবনের ক্ষেত্রে আদান–প্রদান রইলো না। অবশ্য হিন্দুত্ব থেকে ইসলামে ধর্মান্তরকরণ অবিরাম চলতে থাকলো। কিন্তু সংগে সংগে নতুন মতবাদ ও সম্প্রদায়ের উদ্ভব এবং নতুন প্রতিরোধমূলক নিরাপত্তার মনোভাব সৃষ্টি হলো। ফলে হিন্দু সমাজদেহ ক্রমশঃ অধিকতর শক্তিশালী হয়ে দেখা দিল।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর শিক্ষাপ্রাপ্ত পন্ডিতপ্রবর ডক্টর সৈয়দ মুজতবা আলী যে নির্মম সত্যউক্তি করেছেন, তা পাঠকবর্গকে পরিবেশন করা যেতে পারে। তিনি বলেন ঃ

"বড় দর্শন নির্মাতা আর্য মনীষীগণের ঐতিহ্যগর্বিত পুত্র–পৌত্রেরা মুসলমান আগমনের পর শত শত বৎসর ধরে আপন আপন চতুষ্পাঠীতে দর্শনচর্চা করলেন, কিন্তু পার্শ্ববর্তী গ্রামের মাদ্রাসায় শত শত বৎসর ধরে যে আরবীতে প্লাতো থেকে আরম্ভ করে নিয়–প্লাতনিজম তথা কিন্দী, ফারাবী, বু–আলী সিনা, আলগাজ্জালী, আবু রুশ্‌দ্‌ ইত্যাদি মনীষীগণের দর্শনচর্চা হলো, তার কোন সন্ধানই পেলেন না। এবং মুসলমান মওলানাও কম গাফলতি করলেন না— তিনি একবারের তরেও সন্ধান করলেন না, পাশের চতুষ্পাঠীতে কিসের চর্চা হচ্ছে। . . . শ্রীচৈতন্য নাকি ইসলামের সংগে পরিচিত ছিলেন . . . কিন্তু চৈতন্যদেব উভয় ধর্মের শাস্ত্রীয় সম্মেলন করার চেষ্টা করেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুধর্মের সংগঠন ও সংস্কার এবং তাকে ধ্বংসের পথ থেকে নব–যৌবনের পথে নিয়ে যাওয়ার। ··· মুসলমান যে

জ্ঞান–বিজ্ঞান, ধর্ম–দর্শন এনেছিলেন এবং পরবর্তী যুগে বিশেষ করে মোগল আমলে আকবর থেকে আওরংজেব পর্যন্ত মংগোল জর্জরিত ইরান–তুরান থেকে যেসব সহস্র সহস্র কবি–পন্ডিত–ধর্মজ্ঞ–দার্শনিক এ দেশে এসে মোগল রাজসভায় আপন আপন কবিত্ব–পান্ডিত্য উজাড় করে দিলেন, তার থেকে এ দেশের হিন্দু ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত দার্শনিকেরা কণামাত্র লাভবান হননি ··· হিন্দু পন্ডিতের সংগে তাঁদের কোনও যোগসূত্র স্থাপিত হয়নি।" —(বড়বাবু, সৈয়দ মুজতবা আলী)।

ইসলামী তৌহিদের চিত্তচাঞ্চল্যকর বিপ্লবী বাণী, স্রষ্টা সমীপে সর্বস্ব নিবেদন, ইসলামের বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও প্রেম, তার সাম্যের বাণী ও সুবিচার, তার গণতান্ত্রিক আদর্শ মানুষের মনে যে আবেদন–পুলক সৃষ্টি করে তা ছিল অপ্রতিরোধ্য। ফলে দলে দলে হিন্দুগণ ইসলামের সুশীতল ছায়ায়, আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে। তারপর হিন্দুধর্মের কাজ হলো আত্মরক্ষার। ইসলামের বাণীর মুখে আত্মরক্ষা তেমন সহজও ছিলনা। তাই ভারতের এখানে সেখানে ধর্ম সমন্বয় ও ঐক্যের বাণী প্রচারিত ও প্রতিধ্বনিত হয়েছে যুগে যুগে—রামানন্দ, একলব্য, দাদু, নানক কবীর প্রভৃতি সাধক–প্রচারকদের আবির্ভাবে। ইসলামের অদ্বৈতবাদকে ভিত্তি করে তারা হিন্দুধর্মের সংস্কার করতে চেয়েছেন ইসলাম থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে। অথবা ইসলাম ধর্মে হিন্দুত্বের প্রভাব ও অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের মতো ইসলামকে সর্বগ্রাসী হিন্দুত্বের মুখে ঠেলে দেয়ার প্রচেষ্টা করেছেন মাত্র।

এ সম্পর্কে আবদুল মওদূদ বলেন ঃ

"এ আন্দোলনগুলি অবশ্য বিশ শতকের রাজনীতিক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের প্রচুর সুযোগ–সুবিধায় আসে এবং 'জাতীয়তাবাদী' নামাংকিত করে হিন্দু রাজনীতিকেরাই এক ভারতীয় সংস্কৃতির ধূঁয়া তোলে, তাছাড়া অনতিকাল মধ্যে এগুলো ইসলাম ও দম্ভধর মুসলিম শক্তিকে বাধা দেবার ও সম্ভব হলে বিতাড়িত করবার সক্রিয় প্রয়াসে লিপ্ত হয়ে উঠে। তখন তাদের রাজনীতিক ভূমিকা ও রাষ্ট্রীক প্রয়োজন এসব সমন্বয় সাধনার বুলি স্পষ্ট হয়ে উঠে। (আবদুল মওদূদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ২৫)।

আবদুল মওদূদ, আহমদ শরীফ প্রণীত 'মুসলিম পদ সাহিত্য' (সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭)–এর বরাত দিয়ে বলেন ঃ

"শিখ বা বৈষ্ণব আন্দোলনে যে এ উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল—তার বহু প্রমাণ আছে। রাষ্ট্রীক প্রয়োজনে বাদশাহ আকবর থেকে গান্ধীর কাল পর্যন্ত সমন্বয় সাধনের পথ অব্যাহত ছিল। এ পথে গান্ধীর 'রামধুন' সংগীত ও নজরুলের কয়েকটি কবিতাকে শেষ প্রয়াস বলে ধরে নেয়া যেতে পারে।"

অতঃপর তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে এগুলো ছিল সর্বগ্রাসলোভী ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুত্বের অভিনব প্রয়াস—এ পথেই অজগরের মতো ইসলামকে লীন করার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা। রাষ্ট্রীক প্রয়োজনে এ ধর্মসমন্বয় ও সংস্কৃতির ঐক্যের মহামন্ত্র অতীতে উদ্‌গীত হয়েছিল এবং এখনও হয়ে থাকে। (আবদুল মওদূদ–ঐ–পৃঃ২৫)।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এ সত্যটি সুস্পষ্ট হয়েছে যে, নিছক রাজনৈতিক কারণে সম্রাট আকবর থেকে আরম্ভ করে বিংশতি শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ পর্যন্ত হিন্দু–মুসলমানের সমন্বয়ে জগাখিচুড়ি তৈরী করে এক ভারতীয় জাতি ও সংস্কৃতি অথবা এক বাঙালী জাতি ও সংস্কৃতি বলে চালাবার যে হাস্যকর প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে, তা জাল ও অচল মুদ্রার মতো সত্যনিষ্ঠদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কারণ তা ছিল অস্বাভাবিক, অবান্তর ও অসম্ভব।

সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ

বাংলা তথা ভারত উপমহাদেশের দু'টি বৃহৎ জাতি হিন্দু ও মুসলমান দু'টি স্বতন্ত্র ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতির ধারক বাহক—এ দিবালোকের মতোই সুস্পষ্ট। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, দু'টি স্বতন্ত্র ধর্মবিশ্বাসী একই দেশে মিলেমিশে, শান্তিতে ও নির্বিবাদে বসবাস করতে পারলোনা কেন। পৃথক ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও তাদের সদ্ভাব, সৌহার্দ ও মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারেনি কেন? এর জন্যে দায়ী কে? তারা কি উভয়ে—না কোন একটি দল? এর সঠিক জবাব ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে খুঁজে বের করতে বিশেষ বেগ পেতে হবেনা নিশ্চয়।

হিন্দু–মুসলমানের বিরোধ ও সংঘর্ষের মূল কারণ যে প্রধানতঃ রাজনৈতিক তাতে সন্দেহ নেই। এ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে ধর্মের নামে স্বজাতিকে ডাক দেয়া হয়েছে, প্রতিপক্ষকে ধর্ম বিনষ্টকারী পরস্বাপহরণকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। প্রতিপক্ষকে বিদেশী–হানাদার, নরহন্তা, নারী

ধর্ষণকারী, প্রতিমা ও মন্দির ধ্বংসকারী বলে চিত্রিত করে স্বজাতির মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করা হয়েছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ উপমহাদেশে হিন্দুশাসনের পরিবর্তে যে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা হিন্দুজাতি মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেনি। অষ্টম শতকের পর থেকে পরবর্তী কয়েক শতক পর্যন্ত মুসলিম সামরিক শক্তির, বলতে গেলে যৌবন–জোয়ার জলতরংগ দেশদেশান্তর ব্যাপী প্লাবন এনে দিচ্ছিল। এ অপ্রতিহত শক্তির মুখে ভারতীয় রাজনৈতিক শক্তি টিকে থাকতে পারেনি বলে মুসলিম শাসন প্রতিহত করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তাই বলে এ দেশের বিজিত হিন্দুগণ হৃত রাজ্যের জন্য দুঃখ–অপমানে–লজ্জায় মুসলিম শাসন অন্তর দিয়ে মেনেও নিতে পারেনি। তাদের অন্তরাত্মা বিক্ষোভে ফেটে পড়ছিল। বহু শতকের পুঞ্জিভূত বিক্ষোভ ও প্রতিহিংসার বহ্নির বিসেফারণ ঘটেছিল মধ্যভারতে রাজপূত, মারাঠা, শিখদের বিদ্রোহের মাধ্যমে এবং তা সার্থক হয়েছিল ১৭৫৭ সালে সিরাজদৌলার পতনে। তারপর থেকে উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত দেড় শতাব্দী যাবত মুসলমানদের জীবনে নেমে এসেছিল চরম দুর্দিন। হিন্দু ও ইংরেজদের সম্মিলিত শক্তি দিয়ে তাদেরকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে উৎখাত করার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা ও কৌশল অবলম্বন করা হয়। এ সময়কালে হিন্দুজাতি ইংরেজদের ভূয়সী প্রশংসা ও বিগত মুসলিম শাসন ও শাসকদের বিরুদ্ধে অকথ্য কুৎসা রটনা করেছে। বাংলা সাহিত্য ও কবিতা ইসলাম ও মুসলমানদের কাল্পনিক কুৎসা রটনায় ভরপুর হয়ে আছে। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রংগলাল বন্দোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র এবং সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে ছোটো–বড়ো সকল হিন্দু কবি সাহিত্যিকগণ ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন ইসলাম ও মুসলমানদের চরিত্রে কলংক আরোপ করাকে। অনেকের ধারণা মুসলমানদের চরিত্র বিকৃতকরণের ব্যাপারে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সকলের পিছনে, কিন্তু তথাপি তাঁর কলমও কম বিষোদগার করেনি।

ভারত উপমহাদেশে হিন্দু মুসলমানের মিলনের জন্য কম চেষ্টা–সাধনা হয়নি। এ ধরনের মিলনের প্রচেষ্টা যখন চলছিল সে সময়ে শরৎবাবুর লিখনী মুসলমানদের খোঁচা দিতে ভুল করলো না, তিনি তাঁর "দিন কয়েকের ভ্রমণ কাহিনী" শীর্ষক প্রবন্ধের এক স্থানে বলেন—

"... শুনিতে পাইলাম হিন্দু-মোসলেম ইউনিটি একদিন জাতীয় মহাসভার মধ্যে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। সবাই বাহিরে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বলিতে লাগিল— যাক বাঁচা গেল, চিন্তা আর নাই। নেতারা হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন, এবার শুধু কাজ, শুধু দেশোদ্ধার। প্রতিনিধিরা ছুটি পাইয়া মুখে দলে দলে টাঙ্গা, একা এবং মোটর ভাড়া করিয়া প্রাচীন কীর্তিস্তম্ভ সকল দেখিতে ছুটিলেন। সে ত আর এক আধটা নয়, অনেক। সংগে গাইড, হাতে কাগজ-পেন্সিল—কোন্ কোন্ মসজিদ কয়টা হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া তৈয়ার হইয়াছে, কোন্ ভগ্নস্তূপের কতখানি হিন্দু ও কতখানি মোসলেম, কোন্ বিগ্রহের কে কবে নাক এবং কান কাটিয়াছে ইত্যাদির বহু তথ্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া সংগ্রহ করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। অবশেষে শ্রান্ত দেহে দিনের শেষে গাছতলায় বসিয়া পড়িয়া অনেকেরই দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিতে লাগিল- 'উঃ হিন্দু-মোসলেম ইউনিটি!" —(বিজলী ২৫ আশ্বিন, ১৩৩০)।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আরও বলেন,

—ইংরেজের আর যাহাই দোষ থাক,—যে মন্দিরের প্রতি তাহার বিশ্বাস নাই তাহারও চূড়া ভাঙে না, যে বিগ্রহের সে পূজা করে না, তাহারও নাক কান কাটিয়া দেয় না। অতএব যে কোন দেবায়তনের মাথার দিকে চাহিলেই বুঝা যায় ইহার বয়স কত। স্বামীজী দেখাইয়া দিলেন—'ওটি অমুক জিউর মন্দির—সম্রাট আওরাংজেব ধ্বংস করিয়াছেন, ওটি অমুক জিউর মন্দির—অমুক বাদশাহ ভূমিসাৎ করিয়াছেন, ওটি অমুক দেবায়তন ভাঙিয়া মসজিদ তৈয়ার হইয়াছে। ওখানে আর কেন যাইবে, আসল বিগ্রহ নাই, নতুন গড়াইয়া রাখা হইয়াছে (ইংরেজ কর্তৃক), ইত্যাদির পুণ্যময় কাহিনীতে চিত্ত একবারে মধুময় করিয়া আমরা অনেক রাত্রে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম।

—(বিজলী, ২৩ কার্তিক, ১৩৩০ সাল)

একই কলমের দ্বারা ইংরেজদের প্রশংসাসহ পুষ্পবর্ষণ করা হচ্ছে এবং অতীতের মুসলমান শাসকদের মুন্ডপাত করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, হিন্দুমন্দির ভাঙার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে হিন্দুদের ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে ক্ষিপ্ত করে তোলা হচ্ছে। তাহলে বলতে হবে হিন্দু-মুসলিম মিলনের প্রচেষ্টা প্রহসন মাত্র, তার মধ্যে ঐকান্তিকতার লেশমাত্র নেই।

কবি হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ইংরেজ প্রভুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় গেয়ে উঠলেন—

"না থাকিলে এ ইংরাজ
ভারত অরণ্য আজ- কে শেখাতো, কে দেখাতো
কে বা পথে লয়ে যেতো
যে পথ অনেক দিন করেছ বর্জন।"

—(শতাব্দী পরিক্রমা, ডঃ হাসান জামান সম্পাদিত, পৃঃ ২৮৪)

উনবিংশ শতকের প্রথম পাদে হিন্দু জমিদার ও কোম্পানী শাসনের দ্বারা বাংলার মুসলমান নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও জর্জরিত হচ্ছিল এবং তার প্রতিবাদে বাংলায় ফারায়েজী আন্দোলন ও সাইয়েদ তিতুমীরের আন্দোলন প্রচন্ড আকার ধারণ করে। পরবর্তীকালে সাইয়েদ আহমদ শহীদের জিহাদী আন্দোলন সারা ভারতে এক আলোড়নের সৃষ্ট করে। অতঃপর ভারতের প্রথম আযাদী আন্দোলন শুরু হয় ১৮৫৭ সালে। এ সমস্ত আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার ফলে ভারতীয় মুসলমান ইংরেজদের কোপানলে পড়ে কোন্ অসহনীয় জীবন যাপন করছিল, তা যথাস্থানে আলোচনা করা হবে। জেল, ফাঁসী, দ্বীপান্তর, স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ এবং ইংরেজ কর্তৃক অন্যান্য নানাবিধ অমানুষিক-পৈশাচিক অত্যাচারে মুসলিম সমাজদেহ যখন জর্জরিত, সে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখনীর নির্মম আঘাত শুরু করেন মুসলিম জাতির জর্জরিত দেহের উপর। তিনি তাঁর আনন্দমঠ, রাজসিংহ , দুর্গেশনন্দিনী, দেবী চৌধুরী প্রভৃতি উপন্যাসগুলিতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে বিষোদ্গার করেছেন, তাতে পাঠকের শরীর রোমাঞ্চিত হবারই কথা। তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি এবং তাঁর বর্ণনামতে মুসলমান কর্তৃক 'হিন্দু মন্দির ধ্বংস', 'হিন্দু নারী ধর্ষণ' প্রভৃতি উক্তির দ্বারা হিন্দুজাতির প্রতিহিংসা বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করার সার্থক চেষ্টা করা হয়েছে। ১৮৯৮ সালে মুসলিম এডুকেশান সোসাইটি অধিবেশনে নবাব নবাব আলী চৌধুরীর উদ্যোগে বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচারণার তীব্র প্রতিবাদ করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত করে হিন্দু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে দেয়া হয়। কোন পত্রিকায় তা ছাপা হয়নি, শুধুমাত্র 'ভারতী' পত্রিকায় বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করা হয়। —(Bengali Muslim Public Opinion

as reflected in the Bengali Press-1901-30: Mustafa Nural Islam, pp. 141-42).

সাহিত্যের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্রের মুসলিম বিদ্বেষ প্রচারণার দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিছু উদ্ধৃতি নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

"রাজপুত্রী বলিলেন—আমি এই আলমগীর বাদশাহের চিত্রখানি মাটিতে রাখিতেছি সবাই উহার মুখে এক একটি বাঁ পায়ের নাতি মার। কার নাতিতে উহার নাক ভাঙ্গে দেখি।" —[রাজসিংহ (১ম খন্ড) দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ চিত্রদলন]।

"ঔরঙ্গজেবের দুই ভগিনী–জাহানারা ও রওশনারা। জাহানারা শাহজাহাঁর বাদশাহীর প্রধান সহায়।· · · তিনি পিতার বিশেষ হিতৈষিণী ছিলেন। কিন্তু তিনি যে পরিমাণে এ সকল গুণবিশিষ্টা ছিলেন, ততোধিক পরিমাণে ইন্দ্রিয় পরায়ণা ছিলেন। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য অসংখ্য লোক তাঁহার অনুগতির পাত্র ছিল। সেই সকল লোকের মধ্যে ইউরোপীয় পর্যটকেরা এমন এক ব্যক্তির নাম করেন যে, তাহা লিখিয়া লেখনী কলুষিত করিতে পারিলাম না।" –(রাজসিংহ, ২য় খন্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ জেবউন্নিসা)।

"ঔরঙ্গজেবের তিন কন্যা। · · · জ্যেষ্ঠা জেব–উন্নিসা বিবাহ করিলেন না। পিতৃস্বসাদিগের ন্যায় বসন্তের ভ্রমরের মত পুষ্পে–পুষ্পে মধু পান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।" —(রাজসিংহ, ২য় খন্ড দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ জেব–উন্নিসা)।

সতীসাধ্বী পুণ্যবতী মুসলিম রমণীদের চরিত্রে কতখানি কলংক আরোপ করা হয়েছে তা ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই স্বীকার করবেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'লেখনী কলুষিত করিতে পারিলাম না' —বলে খেদ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু একজন লোকের নিছক মুসলিম বিদ্বেষের কারণে, বিবেক ও রুচি কতখানি বিকৃত ও ব্যাধিগ্রস্ত হলে কোন অন্তঃপুরবাসিনী পর্দানশীল সতীসাধ্বী দ্বীনদার খোদাভীরু মুসলিম রমণীর চরিত্র তিনি এমনভাবে কলংকিত করতে পারেন, তা পাঠকের বুঝতে বাকী থাকার কথা নয়।

পুণ্যবতী জেব–উন্নিসার চরিত্র অধিকতর জঘন্যভাবে চিত্রিত করতে বঙ্কিম কণামাত্র দ্বিধাবোধ করেননি। না করবারই কথা। মুসলমানের প্রতি অন্ধ বিদ্বেষে বিবেক ও রুচিবোধ হারিয়ে তিনি নানা প্রলাপ বকেছেন। 'রাজসিংহ' উপন্যাসটির আগাগোড়া বাদশাহ্ আওরংজেব-আলমগীর ও তাঁর বিদূষী কন্যা জেব–উন্নিসার

চরিত্র জঘন্যরূপে বিকৃত করে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মনের সাধ মিটিয়েছেন।

'দুর্গেশনন্দিনী' গ্রন্থে জগৎসিংহের সাথে আয়েশা নাম্নী এক কল্পিতা মুসলিম মহিলার অবৈধ প্রণয় কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। স্যার যদুনাথ সরকার 'দুর্গেশনন্দিনী' সম্পর্কে বলেন ঃ "বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'তে সত্য ইতিহাস কতটুকু আছে? মানসিংহ, জগৎসিংহ, কুৎলু খাঁ, খাজা ইসা, উসমান—ইহারা সকলেই ঐতিহাসিক পুরুষ · · · ইহা ভিন্ন 'দুর্গেশনন্দিনী'র আর সব কথা কাল্পনিক।· · · · আয়েশা, তিলোত্তমা, বিমলা সকলেই কাল্পনিক।· · ·এগুলি আসিয়াছে ঐতিহাসিক নামজাদা একজন ঘোর কাল্পনিক সাহেবের লেখা হইতে, তিনি কাপ্তান আলেকজান্ডার ডাও (Alexander Dow)। এই সাহেবটি ফিরিশ্‌তা রচিত হিন্দুস্থানের ইতিহাস ইংরাজীতে প্রায়শঃ অনুবাদ করিয়া দিতেছেন বলিয়া এবং নিজ গ্রন্থের নামপত্রে ফিরিশ্‌তার নাম সংযোগ করিয়া দিয়া অপর্যাপ্ত মেকী কথা চালাইয়াছেন, যাহা ফিরিশ্‌তাতো লেখেন নাই, এমনকি, কোনও পারসিক লেখকের পক্ষে সেরূপ সম্ভব ছিল না।" —[বঙ্কিম রচনাবলী, ষষ্ঠ প্রকাশ, ১৩৮২ (উপন্যাস প্রসংগ) পৃঃ ২৯–৩০]।

একথা সত্য যে, মুসলমানদের ইতিহাস ও চরিত্র বিকৃতকরণে ইংরেজ এবং হিন্দু উভয়েই বাকপটুতা প্রদর্শন করেছেন। তবে এ ব্যাপারে কে কতখানি অগ্রগামী তা বলা কঠিন।

'আনন্দমঠে' বঙ্কিমচন্দ্র মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে বলছেন ঃ

"দেখ যত দেশ আছে মগধ, মিথিলা, কাশী, কাঞ্চী, দিল্লী, কাশ্মীর, কোন্ দেশের এমন দুর্দশা, কোন্ দেশে মানুষ খেতে না পেয়ে ঘাস খায়? কাঁটা খায়? উইমাটি খায়? বনের লতা খায়? কোন্ দেশে মানুষ শিয়াল–কুকুর খায়, মড়া খায়? কোন্ দেশের মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, সিংহাসনে শালগ্রাম রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঘরে ঝি–বউ রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঝি–বউয়ের পেটে ছেলে রাখিয়া সোয়াস্তি নাই? পেট চিরে ছেলে বার করে।· · · আমাদের মুসলমান রাজা রক্ষা করে কই? ধর্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, কুল গেল, এখন ত প্রাণ পর্যন্ত যায়। এ নেশাখোর নেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে?" —('আনন্দমঠ', প্রথম খন্ড, দশম পরিচ্ছেদ)।

বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর মন্ত্রশিষ্যগণ তাঁদের সাহিত্যে, কবিতায়, প্রবন্ধে মুসলমানদের নামের পূর্বে 'নেড়ে', 'পাতি নেড়ে', 'ম্লেচ্ছ' প্রভৃতি বিশেষণ ব্যবহার

না করে লেখনী ধারণ করা পাপ মনে করতেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে জগৎসিংহ ও কল্পিত আয়েশাকে পরস্পর প্রণয়াবদ্ধরূপে দেখানো হয়েছে। তবুও আয়েশাকে যবনী বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করা হয়েছে। দ্বাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ সমাপ্তিতে বলা হয়েছে, 'আয়েশা যবনী হইয়াও তিলোত্তমা আর জগৎসিংহের অধিক স্নেহবশত সহচরীবর্গের সহিত দুর্গান্তঃপুরবাসিনী হইলেন।"

আল্লাহ, কোরআন শরীফ ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে উপহাস করে 'আনন্দমঠে'র চতুর্থ খন্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে—

মুসলমানেরা বলিতে লাগিল, "আল্লা–আকবর! এতনা রোজের পর কোরআন শরীফ বেবাক কি ঝুটা হলো? মোরা যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ করি, তা এই তেলককাটা হিঁদুর দল ফতে করতে নারলাম?"

বিপিন চন্দ্র পাল 'আনন্দমঠ' সম্পর্কে মন্তব্য করেন ঃ

"আনন্দমঠে তিনি দেশমাতৃকাকে মহাবিষ্ণুর বা নারায়ণের অংশে স্থাপন করিয়া আমাদের দেশপ্রীতি ও স্বদেশ সেবাব্রতকে সাধারণ মানবপ্রীতি এবং বিশ্বমানবের সেবার সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছেন। মহাবিষ্ণুকে বা নারায়ণকে বা বিশ্বমানবকে ছাড়িয়া দেশমাতৃকার পূজা হয় না। এ কথাটা আনন্দমঠের একটা অতি প্রধান কথা।" —(নবযুগের বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ১০৯)

রমেশচন্দ্র দত্ত 'ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা'র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শীর্ষক প্রবন্ধে (১১শ' সংস্করণ, ষষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ১১০) বলেন ঃ

"আনন্দমঠের' সারকথা হলো ব্রিটিশ শাসন ও ব্রিটিশ শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করে উৎপীড়নমূলক মুসলিম শাসনের অবসান ঘটানো।· · · শীঘ্রই হোক আর বিলম্বেই হোক, ভারতে একটি হিন্দুরাজ্য স্থাপনের আদর্শে 'আনন্দমঠ' উদ্দীপ্ত।"

মোটকথা, বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' লিখে একদিকে মুসলমান জাতির বিরুদ্ধে তাঁর স্বজাতিকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছেন এবং 'বন্দেমাতরম' সংগীতের মাধ্যমে ধর্মের নামে—দেবী দেশমাতৃকার নামে হিন্দুজাতির মধ্যে পুনর্জাগরণের প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন। এ পুনর্জাগরণ সম্ভব মুসলিম দলনে এবং ব্রিটিশ শাসনকে এদেশে স্বাগতঃ জানিয়ে এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করে—এ ভাবধারা আনন্দমঠের ছত্রে ছত্রে প্রবাহিত।'আনন্দমঠের' বন্দেমাতরম' মন্ত্রের সার্থক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বংগভংগ রদ আন্দোলনে।

বংগভংগ ও বংগভংগ বিরোধী আন্দোলন যথাস্থানে আলোচিত হবে। তবে এখানে 'বন্দেমাতরমের' ভাবাদর্শে যে সন্ত্রাসবাদ জন্মলাভ করেছিল তার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়ে রাখি।

আবদুল মওদূদ বলেন ঃ

সন্ত্রাসবাদ বাংলার মাটিতে আসন খুঁজে পায়নি উনিশ শতকে এবং ভদ্রলোকদের সহানুভূতিও লাভ করেনি। ১৯০৩ সালের পূর্বে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ লন্ডন থেকে কোলকাতায় প্রত্যাগমন করে উত্তেজনা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন, কিন্তু কোন সহানুভূতি পাননি।

· · ·বিফল হ'য়ে তিনি বরোদায় বড়দাদা অরবিন্দ ঘোষের নিকট গমন করেন। অরবিন্দও ইংলন্ডে উচ্চশিক্ষিত। তিনি তখন গায়কোয়াড় কলেজের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। বারীন্দ্র বরোদায় বসে অনুধাবন করেন, রাজনীতিকে ধর্মের সঙ্গে একাঙ্গীভূত না করলে কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনে কাজ হবে না। এ জন্যে তিনি গীতাপাঠের সঙ্গে রাজনীতির পাঠ দেবার উদ্দেশ্যে 'অনুশীলন সমিতি'র পরিকল্পনা করেন ও উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করতে থাকেন।

"সুযোগ মিললো ১৯০৪ সালে। তখন বাংলা বিভাগ পরিকল্পনা জোরদার হয়েছে এবং 'ভদ্রলোক' হিন্দু সম্প্রদায়–সর্বনাশের আভাসে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। বারীন্দ্র কোলকাতায় এলেন ১৯০৪ সালে, অরবিন্দ এসে যোগ দিলেন ১৯০৫ সালে। বাংলা বিভাগ কার্যকর হলো, বাঙালী হিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায় বিক্ষোভে ফেটে পড়লো। 'বংগমাতার' অংগচ্ছেদ বলে বিভাগটার ধর্মীয় রূপ দেয়া হলো এবং সমগ্র হিন্দু বাংলা আন্দোলনে মেতে উঠলো।" —(আবদুলমওদূদঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ২০২)।

'আনন্দমঠের' বন্দেমাতরম মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেই বাংলার মাটিতে সন্ত্রাসবাদ জন্মলাভ করে। অরবিন্দ ঘোষের স্বীকৃতিই তার প্রমাণ। ১৯০৭ সালের ১৬ই এপ্রিল বঙ্কিমচন্দ্রের অবদানের কথা উল্লেখ করে তিনি ইংরেজীতে একটি প্রবন্ধ লিখেন। তার থেকে কিঞ্চিত উদ্ধৃতি নিম্নে দেয়া হলো ঃ

"The earlier Bankim was only a poet and stylist—the later Bankim was a saint and a nation-builder".

অর্থাৎ, 'প্রথম দিককার বঙ্কিম একজন কবি ও শিল্পী—শেষ দিককার বঙ্কিম—ঋষি ও জাতি গঠনকারী।'

তিনি আরও বলেন—

"It was thirty two years ago that Bankim wrote his great song . . . The Mantra had been given and in a Single Day a whole people had been converted to the religion of patriotism. The mother had revealed herself . . . A great nation which has had that vision can never again be placed under the foot of the conqueror".

অর্থাৎ "বত্রিশ বছর আগে বঙ্কিম তাঁর বিখ্যাত 'বন্দেমাতরম' সংগীত রচনা করেছিলেন। মন্ত্র ফুঁকে দেয়া হলো, আর একদিনেই গোটা জাতি দেশমাতৃকার ধর্মে দীক্ষিত হ'য়ে গেল। দেশমাতা আত্মপ্রকাশ করলেন · · · সেই স্বপ্নসাধ পোষণ করতো যে এক বিরাট জাতি, সে আর বিজেতার পদতলে লুণ্ঠিত হবে না।" —[শ্রী যোগেশচন্দ্র বাগল–(বঙ্কিম রচনাবলী গ্রন্থের ভূমিকায় বঙ্কিম পরিচিতি লেখক), পৃঃ ২৫–২৬]।

বঙ্কিম সাহিত্যের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের প্রতি বিষোদ্‌গীরণের বিরুদ্ধে বিংশতি শতকের প্রথম পাদে মুসলিম পত্র–পত্রিকায় তীব্র প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কোন ফল হয়নি। বরঞ্চ হিন্দুদের পক্ষ থেকে সন্ত্রাসবাদ ও হিংস্রতা ক্রমশঃ বেড়েই চলছিল। কোলকাতা থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'ইসলাম প্রচার–এর বাংলা ১৩১৪ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় (১৯০৭ খৃঃ) নিম্নের চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হয় ঃ

"ইংরেজ এবং মুসলমানদের উৎখাত করার সংকল্প নিয়ে সর্বশ্রেণীর হিন্দুদেরকে— উচ্চশিক্ষিত থেকে স্কুলের ছাত্র পর্যন্ত—লাঠিখেলা ও কুস্তি শিক্ষার জন্যে দলে দলে ভর্তি করা হচ্ছে। তাদের ভয়াবহ গতিবিধি সারা বাংলায় বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়েছে। এসব ঠগেরা কুমিল্লায় একজন মুসলমানকে হত্যা করেছে, জামালপুরে দু'জনকে জবাই করেছে এবং হিন্দু ও মুসলমান ফকীর–সন্যাসীর ছদ্মবেশে সারা বাংলায় আতংক ছড়াচ্ছে। মৌলভীর ছদ্মবেশে তারা হিন্দুদের লুণ্ঠন করার, হিন্দু বিধবাদের বিবাহ করার, এবং হিন্দু নারী ধর্ষণের জন্যে মুসলমানদেরকে প্ররোচিত করছে এই বলে যে, এ ব্যাপারে সরকার এবং ঢাকার নবাবের কাছ থেকে নিশ্চিত সাহায্য পাওয়া যাবে।

'ইসলাম প্রচারকের' সেই সংখ্যায় আরও সংবাদ পরিবেশিত হয় যে, পাঞ্জাবে হিন্দুদের সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা এবং বিশেষ করে আর্যসমাজী কংগ্রেসী টাউটদের

তৎপরতার বিরুদ্ধে মুসলিম সমিতিগুলোর পক্ষ থেকে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তাঁরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছেন যে, এসব হিন্দু সন্ত্রাসবাদ ও অরাজকতার সাথে মুসলমানদের কোনই সংস্রব সম্বন্ধ নেই।

এ অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তু 'সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ'। এ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের মূল উৎস ছিল বঙ্কিম সাহিত্য। বঙ্কিম সাহিত্যে মুসলমানদেরকে 'যবন', 'ম্লেচ্ছ', 'নেড়ে', 'পাতি নেড়ে' প্রভৃতি ইতর ভাষায় আখ্যায়িত করে এ যবন ও ম্লেচ্ছ নিধন হিন্দুজাতির ব্রত ও পুণ্যকর্ম হিসাবে দেখানো হয়েছে। 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র এ যবন নিধনে তাদেরকে প্রেরণা যোগায়। কিন্তু বিংশতি শতাব্দীর প্রথম পাদে একদিকে যখন হিন্দু–মুসলিম মিলনের গান হচ্ছিল সারা দেশে, তখন হিন্দু–মুসলিমের যুক্ত বৈঠক ও সভাসমিতিতে অনিবার্যরূপে গাওয়া হতো 'বন্দেমাতরম' সংগীত। মুসলমানদের বহু আপত্তি ও প্রতিবাদ সত্বেও তাঁরা নিবৃত্ত হননি।

মাসিক পত্রিকা 'শরিয়তে ইসলাম' বাংলা ১৩৩৫ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় (১৯২৮ খৃঃ) হিন্দু–মুসলমানের যৌথ সভায় 'বন্দেমাতরম' সংগীত বন্ধ করার দাবী জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন। The Mussalman-এর সম্পাদক মৌলভী মজিবর রহমান কংগ্রেসের জাতীয় কমিটির নিকটে সভাসমিতিতে 'বন্দেমাতরম' নিষিদ্ধ করার অনুরোধ জানিয়ে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু এতেও কোনই ফল হয়নি।

হিন্দু–মুসলিম সংঘর্ষের আর একটি কারণ হলো মসজিদের সামনে হিন্দুদের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার এবং হিন্দু জমিদারীর অধীনে ও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় মুসলমানদের গো–কোরবানীতে বাধা দান। এ নিয়ে বহু বাদ–প্রতিবাদেও কোন লাভ হয়নি।

মুসলিম ভারতের উপরে চরম আঘাত হানে আর্য সমাজীদের 'শুদ্ধি' ও 'সংগঠন' আন্দোলন। এ আন্দোলনের অন্যতম নেতা লালা হরদয়াল কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতিতে বলা হয়, যা ১৯২৫ সালের ২৫শে জুলাই Times of India-তে প্রকাশিত হয় ঃ

"হয় মুসলমানদেরকে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করতে হবে, নতুবা জীবন ও মানসম্মানসহ ভারত পরিত্যাগ করতে হবে।" আর্য সমাজের স্বামী শ্রদ্ধানন্দের প্রধান শিষ্য সত্যদেব একই সময়ে ঘোষণা করেন ঃ

"আমরা শক্তি অর্জন করার পর মুসলমানদের নিকটে এ শর্তগুলি পেশ করব, 'কোরআনকে আর ঐশী গ্রন্থ হিসাবে মানা চলবে না, মুহাম্মদকে খোদার নবী বলে স্বীকার করা চলবে না, মুসলমানী অনুষ্ঠান পর্বাদি পরিত্যাগ করে হিন্দু পর্ব পালন করতে হবে। মুসলমানী নাম পরিত্যাগ করে রামদ্বীন, কৃষ্ণখান, ইত্যাদি নাম রাখতে হবে। আরবী ভাষায় উপাসনার পরিবর্তে হিন্দী ভাষায় উপাসনা করতে হবে।" A History of the Freedom Movement পৃঃ ২৬২ থেকে গৃহীত। —(Mustafa Nurul Islam : Bengali Muslim Public Opinion as reflected in the Bengali Press 1901-1930, p. 125)।

রাজনৈতিক হাংগামার প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল বোম্বাইয়ে যখন হিন্দুনেতা বালগঙ্গাধর তিলক দুটি হিন্দু ধর্মীয় উৎসবকে প্রাধান্য দিয়ে হিন্দু জনমত ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত করতে থাকেন। এ দুটি উৎসবের একটি হলো 'গণেশের' পূজা আর দ্বিতীয়টি 'শিবাজী' উৎসব। স্কুল কলেজের যুবকদের সামরিক শিক্ষা দিয়ে, এ দুটি উৎসবকে কেন্দ্র করে, হিন্দু ক্ষাত্র শক্তিকে জাগ্রত করা হয়। তিলক শিবাজী উৎসবে পৌরহিত্যকালে ভগবদ্‌গীতার উদ্ধৃতি দিয়ে ঘোষণা করেন যে, আত্মকারণে না হলে, জাতি বা দেশমাতার কারণে গুরু ও আত্মীয় হত্যায় কোন পাপ হয় না। তাঁর শিক্ষায় স্কুল কলেজের ছাত্র শিক্ষক উদ্দীপ্ত ও উত্তেজিত হয়ে গুপ্ত সমিতি গঠন করতে থাকে হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্যে।

বংগবংগের পর ১৯০৬ সালে এ আন্দোলন হঠাৎ জোরদার হয়ে উঠে এবং সারা ভারতব্যাপী 'শিবাজী উৎসব' পালন করে হিন্দুধর্ম পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা হতে থাকে। এ উৎসবে সকল প্রখ্যাত হিন্দু সমাজনেতা, রাজনীতিবিদ, কবি সাহিত্যিক সানন্দে যোগদান করেন। কবি রবীন্দ্রনাথ 'শিবাজী উৎসব' লিখে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন আন্দোলনে প্রত্যক্ষ যোগদান করেন। তিনি 'শুভশঙ্খনাদে জয়তু শিবাজী' উচ্চারণ করে এ 'ধ্যানমন্ত্রে' দীক্ষা গ্রহণ করেন ঃ

ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী বসন—
দরিদ্রের বল।
'এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে' এ মহাবচন
করিব সম্বল।

(Indian Sedition Committee Report, 1918, p. 2; B.B. Misra : the Indian Middle class : Their growth, আবদুল মওদূদ ঃ মধ্যবিত্ত

সমাজের বিকাশ দ্রষ্টব্য)।

বাংলা তথা সারা ভারতে রাজনীতি ও হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন আন্দোলন একাকার হয়ে গেল। ধর্মীয় উন্মত্ততা রাজনীতির আবহাওয়াকে করলো বিষাক্ত ও কলুষিত এবং ফলে চারদিকে শুরু হলো হিন্দু–মুসলিম বিরোধ ও সংঘর্ষ। একে অপরের রক্তে হাত রঞ্জিত করতে লাগলো।

খেলাফত আন্দোলন চলাকালে সাময়িকভাবে হলেও হিন্দু–মুসলিম সম্পর্কের উন্নতি সাধিত হয়েছিল। কিন্তু এ সময়ে হিন্দুজাতি একরকম বলতে গেলে 'মুসলিম আতংকের' ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিল। এ ব্যাধি ছড়াচ্ছিলেন প্রধানতঃ বিপিনচন্দ্র পাল, পন্ডিত মদনমোহন মালব্য, লালা লাজপৎ রায় এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। এ চার ব্যক্তি ছিলেন 'শুদ্ধি সংগঠন' আন্দোলনের উদ্যোক্তা, এবং কংগ্রেসের জাতীয় রাজনীতিতে হিন্দুত্বের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় এঁদের অবদান ছিল সর্বাধিক। উপরন্তু এঁরা সারা ভারতে দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দীভাষা প্রবর্তনেরও জোরদার ওকালতি করেন।

রিয়াজুদ্দীন আহমদ ও মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সম্পাদিত কোলকাতার সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সুলতানে' ১৯২৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে 'রবীবাবুর আতংক' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে আক্ষেপ করে বলা হয় ঃ

"রবীন্দ্র ঠাকুর পর্যন্ত এ ব্যাধিতে আক্রান্ত বলে আমরা দুঃখিত। তাঁকে এরূপ বলতে শুনা গেছে, 'ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলিম শাসন কায়েম হবে। সেজন্যে হিন্দুদের মারাত্মক ভুল হবে—খেলাফত আন্দোলনে যোগ দেয়া। মহাত্মা গান্ধীকে মুসলমানেরা পুতুলে পরিণত করেছে। তুরস্ক ও খেলাফতের সাথে হিন্দুস্বার্থের কোনই সংস্রব নেই।"

উপসংহারে 'সুলতান' বলেন, "অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে আমরা একজন কবি, খ্যাতনামা কবি, বিশ্ববিখ্যাত কবি হিসাবে মানি . . . কিন্তু তিনি রাজনীতিক নন . . . ভারতে মুসলিম শাসনের কল্পিত আতংকে তিনি আতংকিত।" —(Mustafa Nurul Islam : Bengali Muslim Public Opinion as reflected in the Bengali press 1901-1930, pp. 147-48)।

বলতে গেলে, খেলাফত আন্দোলনে কংগ্রেসের যোগদানে ঐকান্তিকতা ছিলনা মোটেই, মুসলমানেরা মনে করেছিল এবার হয়তো হিন্দু–মুসলমানের বিরোধের অবসান ঘটবে। কিন্তু তা হয়নি।

এস কে মজুমদার তাঁর 'জিন্নাহ ও গান্ধী' গ্রন্থে বলেন ঃ

"খেলাফত আন্দোলনকালে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য কোন জোরদার বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মুসলমানদের কাছে এটা ছিল একটা ধর্মীয় আন্দোলন, ভারত স্বাধীন করার কোন চিন্তা এতে ছিলনা। পক্ষান্তরে গান্ধী এটাকে গ্রহণ করেছিলেন নিজ উদ্দেশ্য হাসিলের প্রধান হাতিয়ার হিসাবে। গান্ধীজী বলেছিলেন, 'আমি বিশ্বাস করি খেলাফত আমাদের দু'জনের নিকটে কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল— মওলানা মুহাম্মদ আলীর নিকট এটা তাঁর ধর্ম। আর আমার নিকট হচ্ছে, খেলাফতের জন্যে জীবন বিসর্জন দিয়ে গো-নিরাপত্তা নিশ্চিত ও নির্ভয় করছি। অর্থাৎ আমার ধর্মকে মুসলমানের ছুরিকা থেকে রক্ষা করছি।'

'ধর্ম' বলতে এখানে গান্ধীজী যে 'গোধর্মই বুঝিয়েছেন, তা না বললেও চলে। মুসলমানের ছুরিকা থেকে 'গোধর্ম' বা গোজাতিকে রক্ষা করার অর্থ হলো ভারতভূমিতে মুসলমানের গো-কোরবানী চিরতরে বন্ধ করা।

১৮৭০ সাল থেকে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানে যত দাংগা হয়েছে তার খতিয়ান বিবেচনা করলে জানা যাবে যে এসবের প্রত্যক্ষ কারণ (Immediate cause) হচ্ছে এই যে, প্রথম চার বছর হিন্দুর দুর্গাপূজা আর মুসলমানের কোরবানী একই সময়ে, বলতে গেলে, একই দিনে হতো। কথা যদি এই হতো যে, ঠিক আছে, উভয়ে উভয়ের উৎসব পালন করুক— হিন্দুরা দুর্গাপূজা করুক, মুসলমান কোরবানী করুক। কিন্তু তা নয়। মুসলমানরা গো কোরবানী করতেই পারবে না। আর হিন্দু দুর্গাপূজা ত করবেই। বরঞ্চ বিসর্জনের দিনে মসজিদের সামনে দিয়ে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বাজনা বাজিয়ে মিছিল করে যাবে। ফলে দাংগা হাংগামা ত অনিবার্য। গায়ে পড়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করে, দাংগা-হাংগামা বাধিয়ে মুসলমানকে খুনী আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে রায় দেয়া হবে- "বাবা, এখন জানমাল ও মান-সম্মান নিয়ে যে দেশ থেকে এসেছিলে, সেখানে চলে যাও।" এসব পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী করা হচ্ছিল, এ কথা মনে করার সংগত কারণও আছে। পরবর্তীকালে আর্য সমাজীরা এবং হিন্দু মহাসভার নেতাগণ এ কথাই বারবার বলেছেন। বঙ্কিম 'আনন্দমঠে' বন্দেমাতরম মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন 'যবন-ম্লেচ্ছ' নিধনযজ্ঞের আর এদের কথা হলো, 'হত্যাযজ্ঞের পরে যারা তোমরা বেঁচে আছ, ভারত ত্যাগ কর।'

পরিকল্পিত দাংগা-হাংগামায় হিন্দুপক্ষ সমর্থনের বড়ো সাধ ইংরেজদেরও ছিল। কারণ উনবিংশতি শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত মুসলমান ছিল তাদের চোখের বালি। ১৮৮৩ সালে জন্ ব্রাইট লন্ডনে ইন্ডিয়ান কমিটি নামে একটি সমিতি গঠন করেন এবং পঞ্চাশ জন ইংরেজ এম পিকে এর সভ্য করেন। ১৮৮৫ সালে অ্যালেন হিউম ভারতীয় কংগ্রেস গঠন করেন। হিউম বাংলা প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। তিনজন ইংরেজ এই কংগ্রেসের সভাপতি হন এবং তাঁরাই ইংলন্ডে কংগ্রেসের প্রচারকার্য চালিয়ে কংগ্রেসকে একটি জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইংলন্ডবাসীর কাছে পরিচিত করেন। ১৮৮৮ সালে চার্লস ব্রাড্‌ল কংগ্রেসের সার্বক্ষণিক বেতনভুক কর্মচারী নিযুক্ত হন। লন্ডনে কংগ্রেসের প্রচারকার্যে নিয়োজিত হন উইলিয়ম ডিগ্‌বী। কংগ্রেসের প্রচারকার্যে ১৮৮৯ সালে ব্যয়িত হয় ২৫০০ পাউন্ড। ডিগ্‌বী প্রচার করতেন, কংগ্রেস ভারতের সব জাতি, সম্প্রদায় ও শ্রেণীর একমাত্র মুখপাত্র। এমনকি মুসলমানেরও।

হিন্দু-মুসলিম দাংগায় ভারতভূমি যখন রক্তরঞ্জিত হচ্ছিল, সে সময়ে মুসলমানদের পক্ষে কথা বলার না কোন ব্যক্তি, আর না কোন প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু ব্রিটেনের ইন্ডিয়া কমিটি কংগ্রেসকেই সমর্থন করে বলতো,—"ভারতে সাম্প্রদায়িক প্রীতি অক্ষুণ্ন আছে।"

ব্রিটেনের ১৯০৫ সালের নির্বাচনে ভারতফেরত বেশ কিছুসংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত আইসিএস অফিসার হাউস অব কমন্সের সদস্য হন। তাঁরা ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টারী কমিটি গঠন করেন। স্যার হেনরী কটন ছিলেন তার একজন সদস্য। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতীয়দের আশা আকাংখা তুলে ধরার দায়িত্ব পালনে গৌরব বোধ করেন তিনি। তিনি প্রচার করতেন, "জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল ভারতীয় এক জাতীয়তায় গৌরব বোধ করে।" লাহোর, কার্ণাল প্রভৃতি স্থানে যখন প্রচন্ড সাম্প্রদায়িক দাংগা চলছিল এবং বংগভংগ বিরোধী আন্দোলনে হিন্দু সন্ত্রাসবাদীরা লুঠতরাজ দ্বারা বিভীষিকা সৃষ্টি করছিল, তখন হেন্‌রী কটন বলতেন, "মুসলমানদের স্বার্থ হিন্দু সংবাদপত্র ছাড়া অন্য কোথাও সমর্থিত হয় না।" বংগভংগ রদের ব্যাপারে হিন্দুদের দোসর ইংরেজ সাহেবদের আচরণ কি ছিল তা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

উপরে বলা হয়েছে যে, খেলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম মিলনের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু বংগভংগের পর বাংলা তথা সারা ভারতে

হিন্দুজাতির মানসিকতা যেভাবে সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে, তারপর— খেলাফত আন্দোলনে তার উপরে যে একটা কৃত্রিম প্রলেপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল তাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এ সময়ের সবচেয়ে মর্মন্তুদ ও লোমহর্ষক ঘটনা হলো মুসলিম মোপ্লা সম্প্রদায়ের উপর অমানুষিক ও পৈশাচিক নির্যাতন নিষ্পেষণের।

এ সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী সংবাদ ভারতের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। হিন্দু পত্র-পত্রিকা ও নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে হিন্দু মহাসভা ও আর্য সমাজের নেতাগণ প্রকৃত ঘটনাকে অতিমাত্রায় অতিরঞ্জিত করে হিন্দুভারতকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে তোলেন। ফলে বিভিন্ন স্থানে হিন্দু-মুসলিম দাংগা-হাংগামার সূত্রপাত হয়। ১৯২২ সালে অমৃতসর থেকে 'দাস্তানে জুল্‌ম্' নামে পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। সাহারানপুর থেকে 'মালাবার কি খুনী দাস্তান' নামে আর একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এ পুস্তিকা দু'টির অধিকাংশ সংবাদ অতিরঞ্জিত, কল্পিত ও অনির্ভরযোগ্য সূত্রে গৃহীত।

প্রথম পুস্তিকায় যেসব তথ্য প্রকাশিত হয় তার সারাংশ হচ্ছে ঃ

মালাবারের সশস্ত্র মোপ্লা সম্প্রদায় হত্যা, লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ, বলপূর্বক হিন্দুদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরকরণ প্রভৃতি কাজে লিপ্ত রয়েছে। বলা হয়েছে যে, একজন পুরুষ হিন্দুকে প্রথমতঃ তারা গোসল করিয়ে দেয়। তারপর মুসলমানী কায়দায় তার চুল কেটে দেয়া হয়, অতঃপর মুসলমানী কালেমা পড়তে বাধ্য করা হয়। মেয়েদেরকে মোপ্লাদের পোষাক পরিয়ে দেয়ার পর কান ছিদ্র করে ইয়ারিং পরিয়ে দেয়া হয়।

দ্বিতীয় পুস্তিকায় বলা হয় যে, মালাবারের মুসলমানরা হিন্দুদেরকে খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করতে এবং মুসলমান হতে বাধ্য করছে। সম্মত না হলে তাকে ঘরে আবদ্ধ করে তার মুখে গরুর গোশ্‌ত গুঁজে দেয়া হয়। তার আপনজন ও আত্মীয় স্বজনকে তার চোখের সামনে মারধর করা হয়। এতেও মুসলমান হতে রাজী না হলে, তাকে হত্যা করে খন্ড বিখন্ড করে কুপের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয় এবং তার বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়। মন্দির ধ্বংস করা হচ্ছে, প্রতিমা চূর্ণ বিচূর্ণ করা হচ্ছে। হিন্দু সন্যাসীদেরকে গরুর কাঁচা চামড়া পরিধান করতে বাধ্য করা হচ্ছে। —(A. Hamid Muslim Separatismin India, pp. 158-159) : (দাস্তানে জুল্‌ম্— সেক্রেটারী, মালাবার হিন্দু সহায়ক সভা, অমৃতশহর, ১৯২২)।

হিন্দুজাতির কাছে এই বলে উদাত্ত আহবান জানানো হতোঃ

"হিন্দুজাতি জাগ্রত হও। তোমাদের নিদ্রা তোমাদের মৃত্যু ডেকে আনবে। আত্মরক্ষার জন্যে বদ্ধপরিকর হও। তোমাদের দুর্বলতা তোমাদেরকে ধ্বংস করবে। লাঞ্ছিত জীবন যাপন অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়। 'তোমাদের ভাইয়ের দুঃখ দুর্দশা তোমাদের নিজেদেরই।" —(A. Hamid Muslim Separatism in India, p. 159, দাস্তানে জুল্‌ম্, ঐ)।

প্রকৃত ঘটনা জানার জন্যে কেন্দ্রীয় খেলাফত সংগঠনের পক্ষ থেকে গঠিত একটি কমিটির উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এ কমিটি সরেজমিনে তদন্ত করে যে রিপোর্ট পেশ করে তার সারাংশ নিম্নরূপ ঃ

সরকারী ঘোষণায় যে মালাবারের ঘটনাবলীকে 'সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ' বলে আখ্যায়িত করা হয়, তা সঠিক নয়। অবস্থা স্বাভাবিক এবং বিদ্রোহের চিহ্নমাত্র নেই। ভারতের অন্যান্য স্থানের মুসলমানের ন্যায় মোপলাগণও খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করে। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এ আন্দোলন দমন করতে বদ্ধপরিকর। পুলিশের দৌরাত্ম ও বাড়াবাড়ি তাদেরকে কিছুটা বিদ্রোহী করে তোলে। ঘটনার সূত্রপাত এভাবে হয় যে, স্থানীয় খেলাফত কমিটির সেক্রেটারীকে ধরে এনে একটি গাছের সাথে বেঁধে ফেলা হয়। তার স্ত্রীকে সেখানে এনে তার চোখের সামনে তার চামড়া খুলে ফেলা হয়। তারপর ট্রাফিক আইন ভংগ করার তুচ্ছ অপরাধে মোপলাদের জনৈক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে একজন পুলিশ কনস্টেবল মুখে থাপ্পড় দেয়। অন্য একজন খেলাফত কর্মীকে অন্যায়ভাবে অস্ত্র নির্মাণ অপরাধে জড়িত করা হয়। অবশেষে পুলিশ মোপ্লাদের গৃহে বলপূর্বক ঢুকে পড়ে তাদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে এবং গৃহের মালিকদের উপর বর্বরোচিত অত্যাচার করে। এতেও ক্ষান্ত না হয়ে পুলিশ তাদের উপর বেপরোয়া গুলীবর্ষণ করে। মোপ্লা সম্প্রদায় অসীম সাহসী ও যোদ্ধা ছিল। ফলে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে তারা জয়ী হয়। ক্ষিপ্ত মোপ্লারা অতঃপর টেলিগ্রাফ তার ও রেল লাইন ক্ষতিগ্রস্ত করে। এ পর্যন্ত হিন্দুদের সাথে তাদের পূর্ণ সদ্ভাব বজায় ছিল। কারণ খেলাফত কর্মী হলেও তারা ছিল কংগ্রেসী। তারা হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রচার করে বেড়ায় এবং হিন্দু মহল্লা ও তাদের ধনসম্পদ পাহারা দেয়। —(A. Hamid Muslim Separatism in India, p. 159-160: কাশ্‌ফে হাকীকতে মালাবার-বাদাউন,১৯২৩)।

দু'সপ্তাহ পর বহুসংখ্যক পুলিশ ও সৈন্য বাহিনী ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করে এবং পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে। 'বিদ্রোহী' মোপ্লাদের সংবাদ সরবরাহ করার জন্যে অধিকাংশ হিন্দু গুপ্তচরের কাজ শুরু করে। এর ফলে মোপ্লাগণ হিন্দুদের প্রতি রুষ্ট হ'য়ে পড়ে। পুলিশ হিন্দুদেরকে মোপ্লাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। আর্য-সমাজী কর্মীগণও তাদেরকে সাহায্য করে। পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী মিলিতভাবে মোপলাদের প্রতিশোধ গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। সামরিক শাসনের অধীনে অমানুষিক নির্যাতনের মধ্য দিয়ে তাদেরকে কাটাতে হয়। শত শত মোপ্লা বাস্তুহারা ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে। শত শত লোক কারাবরণ করেন এবং দুইশত জনকে প্রাণদন্ডে দন্ডিত করা হয় —(A. Hamid : do. p. 160 : কাশ্‌ফে হাকীকতে মালাবার)।

Indian Annual Register-এ বর্ণিত হয়েছে যে, পুলিশ ও সরকারী প্রশাসন বিভাগকে পরাজিত করে মোপ্লাগণ খেলাফত কায়েম করে এবং শাসকদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। হিন্দুদের পাইকারীভাবে ধর্মান্তরকরণের সংবাদ ভিত্তিহীন। মোপ্লাগণ বনে জঙ্গলে আত্মগোপন ক'রে গেরিলা তৎপরতা চালায়।

উক্ত রেজিস্টারে একটি তুলনাহীন বর্বরতার উল্লেখ করা হয়। তা হচ্ছে এই যে, একশত বন্দী মোপলাদেরকে একটি রেলের মালগাড়ীতে ভর্তি করে, দরজা বন্ধ করে দিয়ে, অন্যত্র পাঠানো হয়। গন্তব্যস্থলে পৌছুবার পর দরজা খোলা হলে দেখা যায় ৬৬ জন মৃত্যুবরণ করেছে এবং অবশিষ্ট মুমূর্ষু অবস্থায়। উক্ত রেজিস্টার মন্তব্য করে ঃ এ সময়ের মালাবার ইতিহাসের অন্ধকার অধ্যায়ের কত যে অমানুষিক লোমহর্ষক ঘটনা অজ্ঞাত আছে, তা একমাত্র ভবিষ্যতই প্রকাশ করতে পারে —(A. Hamid, Muslim Separatism in India, p.160: Indian Annual Register 1922, p. 266)।

এ ঘটনাগুলি সারা ভারতের হিন্দু-মুসলমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মুসলিম ভারত মর্মাহত হয়ে পড়ে এবং মোপ্লাদের সাহায্যের জন্যে আবেদন জানায়। চতুর্দিক থেকে অপূর্ব সাড়া পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে হিন্দু সংবাদপত্র ও নেতৃবৃন্দ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে হিন্দুদেরকে উত্তেজিত করতে থাকেন।

সারাদেশে নতুন করে হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ শুরু হয়। প্রথম শুরু হয় মুলতানে ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মহররম উৎসবকে কেন্দ্র করে। ১৯২৩

সালে তার পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং প্রচন্ড সংঘর্ষ ঘটে সাহারানপুরে। এখানে নিহতের সংখ্যা তিনশতের অধিক বলা হয়েছে। পরবর্তী বৎসরে আঠারোটি দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ৮৬ জন নিহত এবং ৭৭৬ জন আহত হয়। চরম সংঘর্ষ ঘটে কোহাটে। জনৈক হিন্দুকর্তৃক ইসলাম বিরোধী কবিতা প্রকাশনাই এর মূল কারণ। দু'দিন ধরে যে দাঙ্গা চলে, তাতে ৩৬ জন নিহত এবং ১৪৫ জন আহত হয়, দোকান-পাট লুণ্ঠিত হয়, এবং প্রায় সত্তর হাজার টাকার ধনসম্পদ বিনষ্ট করা হয়। পর বৎসর ১৯২৫ সালে অবস্থা কিছুটা শান্ত হলেও ১৯২৬ সালে আবার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। এ বৎসর সারাদেশে মোট ৩৬টি দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়। যার ফলে দু'হাজার লোক নিহত হয়। এ বৎসর দাঙ্গার সূত্রপাত হয় কোলকাতা শহর থেকে মসজিদের সামনে হিন্দুদের বাদ্যবাজনাকে কেন্দ্র করে। পরিস্থিতি আয়ত্তাধীন হবার পূর্বে দু'শ দোকান লুণ্ঠিত হয়, বারটি পবিত্র গৃহ ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ১৫০টি অগ্নিসংযোগের ঘটনা সংঘটিত হয় এবং হতাহতের সংখ্যা দাঁড়ায় সাড়ে চৌদ্দশ'

১৯২৭ সালে সারাদেশে একত্রিশটি দাঙ্গা সংঘটিত হয়ে পূর্বের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে। এবার হতাহতের সংখ্যা এক হাজার ছয় শ'। নিহতের সংখ্যা এক শ' চল্লিশ।

১৯২৮ সালে অবস্থা কিছুটা প্রশমিত হয়। কিন্তু ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে মে মাসের মধ্যে বোম্বাই শহরে দাঙ্গা সংঘটিত হয় যার ফলে হতাহতের সংখ্যা দাঁড়ায় এগার শ'। বিগত কোলকাতা দাঙ্গার ন্যায় এখানেও দোকান-পাট লুণ্ঠিত হয়। ১৯৩১ সালে কানপুরে প্রচন্ড দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয় এবং তিন দিন পর্যন্ত হত্যা, লুঠতরাজ, ও অগ্নিসংযোগ চলতে থাকে। জনৈক হিন্দু হত্যাকারীর সন্ধানে বলপূর্বক দোকানপাট বন্ধ করতে গিয়ে হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ শুরু হয় এবং প্রচন্ড আকার ধারণ করে। এ দাঙ্গায় চার-পাঁচ শ' লোক নিহত হয়, বহুসংখ্যক মসজিদ মন্দির ধ্বংস করা হয় এবং বহু ঘর-বাড়ী অগ্নিদগ্ধ হয়। —(A. Hamid : Muslim Separatism in India, p.162; Cumming : Political India, p. 114-17)।

হিন্দু ও মুসলমানের পক্ষ থেকে এসব সংঘর্ষের বিবরণ গান্ধীজীর নিকটে বিবৃত করা হলে তিনি মুসলমানদের ঘাড়েই দোষ চাপান। গান্ধীজী মন্তব্য করেন ঃ আমার মনে কোনই সন্দেহ নেই যে, অধিকাংশ কলহে হিন্দুদের স্থান দ্বিতীয়

পর্যায়ে পড়ে। আমার এ মন্তব্য আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ যে, মুসলমানরা স্বভাবতঃই ষন্ডা প্রকৃতির এবং হিন্দুরা স্বাভাবিকভাবেই ভীরু। আর, যেখানেই ভীরু লোক বিরাজ করে সেখানে সর্বদাই থাকবে, ষন্ডাদল।

(The Indian Quarterly Register, p. 647; A. Hamid : Separatism in India, p. 105).

মিঃ গান্ধী হিন্দু–মুসলিম অনৈক্য ও কলহ দমনে সহায়ক হলেন না। বরঞ্চ তাঁর উপরোক্ত মন্তব্য মুসলমানদেরকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং এটা হিন্দু দাঙ্গাকারীদের একটা শক্তিশালী সনদ হয়ে পড়ে।

ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পথে হিন্দু মুসলিম অনৈক্য অথবা কলহ–কোন্দল যে অন্তরায় একথা বুঝতে পেরে মিঃ গান্ধী যে বিব্রত হয়ে পড়েননি, তা নয়। তবে হিন্দু মুসলিম মিলনের সুষ্ঠু ও স্থায়ী সমাধানকল্পে তাঁর কোন চেষ্টাও পরিলক্ষিত হয়নি।

তিনি একবার বলেন যে, একমাত্র চুক্তি বা প্যাক্টের ভিত্তিতে হিন্দু–মুসলিমের স্থায়ী মীমাংসা হতে পারে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি বলেন, "প্যাক্টের দ্বারা ঐক্য হতে পারে। কিন্তু তার দ্বারা এক হওয়া যায় না। প্যাক্ট যদি এক হওয়ার ভিত্তি হয়, তাহলে তা হবে একেবারে অর্থহীন, বরঞ্চ তার চেয়েও খারাপ। প্যাক্টের স্বভাবই হলো বিচ্ছিন্নতাবাদ। প্যাক্ট একে অপরকে নিকটে টানবার বাসনা জাগ্রত করে না, এর দ্বারা ত্যাগের মনোভাব সৃষ্টি হয় না, আর তা দলগুলিকে মূল লক্ষ্য অর্জনে একত্রে বাঁধতেও পারে না। একে অপরকে নিকটে টানার পরিবর্তে চুক্তির অধীন দলগুলি একে অপরের কাছ থেকে যতটা সম্ভব আদায় করবার চেষ্টা করে।. . . সকলের অভিন্ন স্বার্থোদ্ধারের জন্যে ত্যাগ স্বীকারের পরিবর্তে চুক্তির অধীন দলগুলি সর্বদা লক্ষ্য করে যে, এক দলের ত্যাগ স্বীকারের দ্বারা অন্য দলের মঙ্গল সাধিত যেন না হয়।. . . হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অন্তরের মিল ব্যতীত "স্বরাজ" শুধুমাত্র স্বপ্নই রয়ে যাবে।"

কিন্তু পরক্ষণেই আবার তিনি বলেন, " 'স্বরাজ' সমস্যা অপেক্ষা গো–সমস্যা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, . . . যতোক্ষণ পর্যন্ত না আমরা গোরক্ষা করতে সক্ষম হবো, আমরা স্বাধীনতা লাভ করতে পারব না।" গান্ধীর এসব উক্তি এটাই প্রমাণ করে যে, ভারতীয় স্বাধীনতা হিন্দুত্বের সংকীর্ণ স্বার্থ হাসিলেরই অপর নাম। লাহোরে একটি ঐক্য সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে তিনি পাঞ্জাবে মুসলিম

সংখ্যাগরিষ্ঠতায় আতংক প্রকাশ করেন। অদূর ভবিষ্যতে পাঞ্জাব একটি রণদক্ষ জাতির আবাসভূমি হয়ে পড়লে উপমহাদেশের শান্তি বিনষ্ট হবে বলেও তিনি আশংকা প্রকাশ করেন। —(মুহাম্মদ আমীন যুবেরী, সিয়াসতে মিল্লিয়া, পৃঃ ১৭৫–৮৪)।

দাঙ্গা–হাঙ্গামায় হিন্দু ও মুসলিম সমাজদেহ যখন রক্তাক্ত তখন তিনি তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবকে উভয়ের কল্যাণমূলক স্বার্থে ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু তৎপরিবর্তে তিনি রাজনীতি থেকে দূরে সরে পড়ে আহমদাবাদের নিকটবর্তী সবরমতী আশ্রমে নির্জনবাস শুরু করেন এবং ভারতীয় রাজনীতির নিরপেক্ষ দর্শক হিসাবে দিন কাটাতে থাকেন। তবে একেবারে চুপচাপ বসে না থেকে খাদি ও স্বহস্তে নির্মিত বস্ত্রের মহত্ব, ছাগ–দুগ্ধের উপকারিতা, টিকা–ইনজেকশনের অপকারিতা, সোয়াবিনের খাদ্যপ্রাণ প্রভৃতি সম্পর্কে প্রবন্ধাদি লিখেন, হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি মুখ বন্ধ করে থাকেন। (মুহাম্মদ আমীন যুবেরী ঃ সিয়াসতে মিল্লিয়া, পৃঃ ১৭০)।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে ভারতের হিন্দুজাতির প্রকৃত মুখোশ খুলে গেল ১৯৩৭ সালের পর, যখন ১৯৩৫ সালের ইন্ডিয়া এ্যাক্টের অধীন ভারতের প্রদেশগুলিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে মন্ত্রীত্ব গঠিত হলো, মুসলমান চারটি প্রদেশে এবং হিন্দু সাতটি প্রদেশে মন্ত্রীত্ব গঠনের দায়িত্ব লাভ করে। ভারতীয় কংগ্রেস এতদিন ভারতে ও বহির্জগতে এ দাবীতে সোচ্চার ছিল যে, কংগ্রেস— ভারতের হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনক্ষমতা একমাত্র কংগ্রেসের উপরেই অর্পণ করতে হবে। পক্ষান্তরে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ এ আশংকা প্রকাশ করে আসছে যে, কংগ্রেসের হাতে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলে ভারতীয় মুসলমানদের সকল স্বার্থ দলিত–মথিত হবে এবং মুসলিম জাতিকে তাদের ধর্ম, ঐতিহ্য ও তাহ্‌জিব তামাদ্দুন বিসর্জন দিয়ে হিন্দুর গোলামে পরিণত হতে হবে।

১৯৩৭ সালের পর কংগ্রেসের দাবী মিথ্যা প্রমাণিত হয় এবং মুসলমানদের আশংকা সত্যে পরিণত হয়। কংগ্রেস মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, বোম্বাই ও উত্তর–পশ্চিম–সীমান্ত প্রদেশে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মন্ত্রীসভা গঠন করে।

নির্বাচনের পূর্বে এরূপ আশা করা গিয়েছিল যে, মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে, বিশেষ করে ইউ পি এবং বোম্বাই–এ মুসলিম লীগ সদস্যদেরকে নিয়ে কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হবে। গভর্ণরদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, মন্ত্রীসভা যেহেতু একটি সমষ্টিগত দায়িত্ব, সেজন্যে শক্তিশালী সংখ্যালঘু দল থেকে যতজন সম্ভব লোক মন্ত্রীসভায় শামিল করা উচিত। ইউ পিতে মুসলমান ছিল মোট লোকসংখ্যার ছয় ভাগের একভাগ। সেখানে তাদের তুলনায় তাদের প্রভাব ও ঐক্য ছিল অনেক বেশী এবং এ কারণে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে এরূপ একটি অলিখিত বুঝাপড়া হয়েছিল যে, অন্ততঃ দু'জন মন্ত্রী মুসলিম লীগ থেকে নেয়া হবে। কিন্তু ইউ পি এবং বোম্বাই–এ মুসলিম লীগের কোন সদস্যকে মন্ত্রীসভায় স্থান দেয়া হয়নি। কংগ্রেস এখানেই মারাত্মক ভুল করে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয় যে, একমাত্র কংগ্রেসই সারা ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে। মুসলমানদের নিকটে এটা ছিল হিন্দু শাসনের কাছে নতিস্বীকার করা। ফলে 'ইসলাম বিপন্ন' ধ্বনি উত্থিত হয় এবং 'কংগ্রেসরাজ' ব্রিটিশরাজ থেকে অনেক খারাপ বলে বিবেচিত হয়। পন্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু ও মিঃ জিন্নাহ্‌র মধ্যে ১৯৩৮ সালের প্রথম দিকে যে পত্র বিনিময় হয় তাতে নেহরুর দাবী হলো ধর্মনিরপেক্ষ যুক্ত ভারতের এবং মিঃ জিন্নাহর দাবী হলো লীগকে কংগ্রেসেরই সমমর্যাদাশীল বলে মেনে নেয়ার। কোন ফরমূলা বা সমঝোতার ভিত্তিতে এর মীমাংসা সম্ভব হলো না —(H.V. Hodson : The Great Divide, p. 63, pp. 66-67)।

ভারতে কংগ্রেস শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের প্রতি সুবিচার করা হবে, সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে, ইত্যাদি ধরনের কংগ্রেসের বড়ো বড়ো বুলি ১৯৩৭ সালের পর মিথ্যা প্রমাণিত হয়। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ভারতের সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসের আড়াই বৎসরের শাসন 'হিন্দু রামরাজ' বলে কুখ্যাতি লাভ করে এবং মুসলমানদের প্রতি অন্যায় অবিচার, তাদের ধর্ম–তাহজিব–তামাদ্দুন বিলুপ্তির প্রচেষ্টা প্রভৃতির দ্বারা কংগ্রেস সারা ভারতের মুসলমানদের আস্থা একেবারে হারিয়ে ফেলে। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে পাটনায় অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ অধিবেশনে মিঃ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন যে, সাম্প্রদায়িক শান্তি ও সম্প্রীতির সকল আশা ভরসা 'কংগ্রেস ফ্যাসিবাদের' দ্বারা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে। ভারতের সর্বত্র মুসলমানদের পক্ষ

থেকে অত্যাচারী কংগ্রেস শাসনের অবসান দাবী করে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হতে থাকে।

কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের প্রতি কৃত অন্যায় অবিচারের তদন্তের জন্যে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে একটি কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করেন তা, 'পীরপুর রিপোর্ট' নামে খ্যাত। 'বিহারের মুসলমানদের অভাব–অভিযোগ'–শীর্ষক একটি রিপোর্ট পেশ করেন বিহার প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কর্তৃক গঠিত কমিটি। একে 'শরীফ রিপোর্ট' বলে অভিহিত করা হয়। 'পীরপুর রিপোর্টের' পর ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে 'শরীফ রিপোর্ট' পেশ করা হয়। অতঃপর ডিসেম্বর মাসে বাংলার প্রধানমন্ত্রী মিঃ এ কে ফজলুল হক 'কংগ্রেস শাসনে মুসলমানদের দুঃখ দুর্দশা' নামে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। হিন্দু পত্র–পত্রিকা রিপোর্টগুলিতে বর্ণিত অভিযোগগুলি অস্বীকার করে এবং বিহার সরকার 'পীরপুর রিপোর্ট'ও প্রত্যাখ্যান করেন।

H.V. Hodson : তার The Great Divide গ্রন্থে বলেন ঃ

"ভারতের ইতিহাসের এ এক সুবিদিত ঘটনা যে, যখন থেকে এ দেশে হিন্দু–মুসলমান পাশাপাশি বাস করা শুরু করেছে, তখন থেকেই কিছুটা ধর্মীয় উত্তেজনা বিরাজ করে আসছে। যেমন ধরুন গো–পূজা, নামাজের আজানে বাধা প্রদান, মসজিদ অপবিত্রকরণ, নারী ধর্ষণ, নারী হরণ প্রভৃতি ব্যক্তিগত আক্রমণ। অপরদিকে, রাজনৈতিক ও শাসন সংক্রান্ত নতুন নতুন অভিযোগ বিরাজ করছে, বিশেষ করে যেসব বর্ণিত হয়েছে যুক্তিপূর্ণ 'পীরপুর রিপোর্টে'। হিন্দীর সপক্ষে উর্দুকে কোণঠাসা করে রাখা হচ্ছে; পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট পক্ষপাতিত্ব করছেন; সরকারী চাকুরীতে মুসলমানদেরকে তাদের ন্যায্য অংশ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, কংগ্রেস মন্ত্রীসভা থেকে তারা কোন প্রকার ন্যায়পরতা আশা করে না; কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক অনুরূপ পাল্টা সরকার চলতে দেয়া হচ্ছে; কংগ্রেস শাসন অর্থাৎ হিন্দু শাসন; যেমন সর্বত্র কংগ্রেস পতাকা উড়ানো হচ্ছে, ইসলাম বিরোধী 'বন্দেমাতরম' সংগীত জাতীয় সংগীত হিসাবে গীত হচ্ছে এবং 'ওয়ার্ধা স্কীম' অনুযায়ী গ্রাম্য শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করা হচ্ছে। এ হচ্ছে মিঃ গান্ধীর কল্পনাপ্রসূত আদর্শ যার ভিত্তি হচ্ছে অহিংসা, সূতা প্রস্তুতকরণ ও বয়ন শিল্প এবং ধর্ম থেকে নিবৃত্তি। এর বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিদ্রোহ করতে হয়। কারণ তাদের প্রাথমিক শিক্ষা ছিল সকল সময়ে কোরআন ভিত্তিক।" —(H.V. Hodson : The Great Divide, pp. 73-74)।

মিঃ হড্‌সন আরও বলেন ঃ

"কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলির ব্রিটিশ গভর্ণরগণ সাধারণতঃ এ ধরনের মত পোষণ করতেন যে, তাঁদের মন্ত্রীগণ যদিও বা অনেক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার দিক দিয়ে দল নিরপেক্ষ থাকবার চেষ্টা করেন, কিন্তু জেলা শহর ও গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসীদের ক্ষমতা প্রবণতা তাদেরকে ঔদ্ধত্য ও উত্তেজনাকর আচরণে লিপ্ত করে। . . . মোট কথা, ভবিষ্যতে সংখ্যাগরিষ্ঠ কেন্দ্র দ্বারা তা পরিচালিত হবে। আর এর পশ্চাতে এমন একটি সংগঠন থাকবে যে কখনো বিরোধিতা বরদাশ্‌ত্‌ করবে না এবং কাউকে তাদের ক্ষমতার অংশীদার করতেও স্বীকৃত হবে না। এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, ১৯৩৭ থেকে ও ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত আড়াই বছরের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দ্বিজাতিত্ব–মতবাদ প্রচার ও পাকিস্তান আন্দোলনের কারণ।" —(H.V. Hodson : The Great Divide, pp. 74-

ভারতের হিন্দু–মুসলিম সংঘর্ষ ও বিরোধ সমাধানকল্পে কবি ইকবাল ১৯৩৭ সালের ২১শে জুন আঙিনা ভাগ করার পরামর্শ দেন। ৭ই জুলাই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুসলিম ছাত্র সমাজকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

ওই সর্বনাশটাকে ধর্মের দামেতে করো দামী
ঈশ্বরের করো অপমান
আঙিনা করিয়া ভাগ দুই পাশে তুমি আর আমি
পূজা করি কোন্ শয়তানে?

তারপর দশ বছর অতীত হয়েছে অধিকতর বিরোধ ও সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে। আড়াই বছরের কুখ্যাত কংগ্রেস শাসনের ইংগিত উপরে করা হয়েছে। ১৯৩৯ সালের ১৭ই অক্টোবর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রতি যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য সহযোগিতার আহবান জানিয়ে ভারতের বড়োলাট লর্ড লিনলিথ্‌গো এক বিবৃতি প্রদান করেন। মুসলমানদের বিক্ষোভের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে নয়, বড়োলাটের বিবৃতির সাথে একমত হতে না পেরে কংগ্রেস হাই কম্যান্ড প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলিকে এস্তেফাদানের নির্দেশ দেয়। তাঁরা নীরবে এ নির্দেশ পালন করেন এবং সাতটি প্রদেশ থেকে কংগ্রেস কুশাসনের অবসান ঘটে। এর জন্যে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে মুসলমানগণ সারাদেশে 'নাজাত দিবস' পালন করেন।

মুসলিম লীগের উদ্যোগে সারাদেশে 'নাজাত দিবস' পালন ন্যায়সংগত হোক বা না হোক, কিন্তু একটি জিনিস দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, এ দেশে শাসনক্ষেত্রে হিন্দু–মুসলমান ঐক্য ও মিলন আর কিছুতেই সম্ভব নয়। অতএব আল্লামা ইকবালের পরামর্শ অনুযায়ী আঙিনা ভাগ করা ব্যতীত স্থায়ী সমাধানের আর অন্য কোন পথ রইলো না। কিন্তু আঙিনা ভাগ ত সহজে হবার বস্তু নয়। কারণ একপক্ষ আঙিনা ভাগ করতে মোটেই রাজী নয়। তাই এই নিয়ে উভয়ের মধ্যে অধিকতর সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। অবশেষে আঙিনা ভাগ হলো দশটি রক্তাক্ত বছরের পর। অর্থাৎ ভারতের আঙিনা ভাগ করে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট মুসলমানদের জন্যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলো। কিন্তু ভারতের আঙিনায় যেসব মুসলমান রয়ে গেল, আঙিনা ভাগ করতে চাওয়ার অপরাধে তাদেরকে চড়া মাশুল দিতে হয়েছে বহু বছর ধরে।

সপ্তম অধ্যায়

মুসলমানদের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাদীক্ষা

মুসলমানগণ চিরদিনই বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের প্রতি অসীম গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। কারণ এ ছিল তাদের নবীর নির্দেশ। যতোই ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য হোক না কেন, এবং প্রয়োজন হলে দেশ থেকে দেশান্তরে গিয়েও বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানার্জন করতে হবে—এ ছিল ইসলামের নবী মুহাম্মদ মুস্তাফার (সা) সুস্পষ্ট নির্দেশ। মুসলিম জাতি অতীতে এ নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। তারাই এক সময় জ্ঞানের মশাল প্রজ্জ্বলিত করে তমসাচ্ছন্ন ইউরোপকে শিক্ষাদীক্ষা ও জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করেছে। এ এক ঐতিহাসিক সত্য। জ্ঞানী ব্যক্তিকে মুসলিম জগতের সর্বত্রই বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়। একজন মুসলিম পিতা তার সন্তানকে শিক্ষাদীক্ষা দানের সাধ্যমতো চেষ্টা করে থাকে এবং এটাকে সে মনে করে তার ধর্মীয় কর্তব্য ও অনুশাসন।

ভারতীয় মুসলমানদের অতীত ইতিহাস আলোচনা করলে জানা যায় যে, যখন কোন সন্তানের বয়স চার বৎসর চার মাস ও চার দিন পূর্ণ হতো, তখন তার বিদ্যাশিক্ষার সূচনা করা হতো। একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের কিছু অংশ শিশুকে পাঠ করে শুনানো হতো এবং শিশু তা পুনরাবৃত্তি করতো। এ ছিল প্রতিটি মুসলিম পরিবারের অপরিহার্য প্রথা। (A.R. Mallick Br. Policy & the Muslims in Bengal, p. 149; M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & Eng. Education : p. 1; L.F. Smith's Appendix to Chahar Darvesh, p. 253)।

মিঃ স্মিথ্ এ অনুষ্ঠান ১৮০১ সালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে স্বচক্ষে দেখেছেন যা তিনি তাঁর 'চাহার দরবেশ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

ভারতের মুসলিম শাসকগণ বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানার্জনকে নানানভাবে উৎসাহিত করেছেন এবং এর জন্যে প্রভূত অর্থ বরাদ্দ করেছেন। রাজ দরবারে জ্ঞানীগুণী ও পন্ডিতগণ বিশেষভাবে সমাদৃত হতেন। বিদ্যাশিক্ষার জন্যে রাজ্যের বিভিন্নস্থানে প্রভূত পরিমাণে লাখেরাজ ভূসম্পদ দান করা হতো। এমন কোন মসজিদ অথবা

ইমামবাড়া ছিল না যেখানে আরবী ও ফার্সী ভাষায় অধ্যাপকগণ অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন না।

যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল বেশী, সেখানে প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে মক্তব খোলা হতো এবং মুসলিম শিশুগণ সেখানে আরবী, ফার্সী ও ইসলামী শিক্ষা লাভ করতো। বিশেষ করে বাংলার সুলতানগণ বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অধিকতর অনুরাগী ছিলেন এবং শিক্ষা প্রসারের জন্যে তাঁরা সর্বতোভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলিম জমিদার, লাখেরাজদার, আয়মাদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত মুসলিম প্রধানগণ তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় মক্তব, মাদরাসা কায়েম করতেন এবং এসবের ব্যয়ভার বহনের জন্যে প্রভূত ধনসম্পদ ও জমিজমা দান করতেন।

বাংলার প্রথম সুলতান মুহাম্মদ বখ্তিয়ার খিলজী ছিলেন অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী এবং তিনি দিল্লীসম্রাট কুত্বউদ্দীন আইবেকের অনুকরণে দেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, কলেজ এবং দরগাহ্ (কোরআন হাদীসের শিক্ষাকেন্দ্র) স্থাপন করেন। (S.M. Jaffar : Education in Muslim India, 1935, p. 66; N. N. Law : Promotion of Learning in India during Muhammadan Rule, pp. 19, 22)।

প্রথম গিয়াসউদ্দীন (১২১২-২৭ খৃঃ) বাংলার মসনদে আরোহণ করার পর পরই বাংলার রাজধানী লাখনৌতি বা লক্ষ্মণাবতীতে একটি অতীব সুন্দর মসজিদ, একটি কলেজ এবং একটি সরাইখানা নির্মাণ করেন। দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দীন (১৩৬৭-১৩৭৩) নিজে একজন খ্যাতনামা কবি ছিলেন। তিনি ওমরপুর গ্রামের নিকটবর্তী দরস্বাড়ীতে একটি কলেজ স্থাপন করেন। (M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & English Education, p. 4)। হোসেন শাহ, নসরৎ শাহ প্রমুখ সুলতানগণের আমলেও শিক্ষার বিরাট উন্নতি সাধিত হয়েছে।

মুর্শিদকুলী খান অতি বিদ্বান ও সুসাহিত্যিক ছিলেন এবং জ্ঞানী ও গুণীদের সর্বদা সমাদর করতেন। তিনি প্রায় দু'হাজার আলেম ও বিদ্বানমন্ডলীর ভরণপোষণ করতেন। তাঁরা সর্বদা পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, ধর্মীয় শিক্ষাদীক্ষা ও ক্রিয়া অনুষ্ঠানাদিতে নিয়োজিত থাকতেন। গোলাম হোসেন তাঁর ইতিহাসে বর্ণনা করেছেন যে, মুর্শিদকুলী খাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বীরভূমের

আসাদুল্লাহ্ নামক জনৈক জমিদার তাঁর আয়ের অর্ধাংশ জ্ঞানী ব্যক্তিদের ভরণপোষণ এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতেন। গোলাম হোসেন আরও বলেন, আলীবর্দী খাঁ ভারতের পশ্চিমাঞ্চল থেকে শিক্ষিত বিদ্বানমন্ডলীকে মুর্শিদাবাদে বসবাসের উদ্দেশ্যে আমন্ত্রণ জানান এবং তাঁদের প্রত্যেকের জন্যে মোটা ভাতার ব্যবস্থা করেন। তাঁরা সাথে করে নিয়ে আসেন এত বেশী সংখ্যক মূল্যবান গ্রন্থাদি যে, একমাত্র জনৈক মীর মুহাম্মদ আলীর লাইব্রেরীতেই ছিল দু'হাজার বা ততোধিক গ্রন্থাদি। —(M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & English Education, p. 5; Ghulam Husain : Seiyere-Mutakherin Vol II, p. 63, 69, 70 & 165)।

মুসলিম শাসন আমলে দেশের অভ্যন্তরে বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার জন্যে যেসব অগণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মক্তব, মাদ্‌রাসা, কলেজ প্রভৃতি ছিল, তার সঠিক বিবরণ পাওয়া বড়োই দুষ্কর। মুসলিম শাসনের অবসানের পর সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। ছিটে ফোঁটা যা বিদ্যমান ছিল তার কিঞ্চিৎ বিবরণ পাওয়া যায় বুকানন হ্যামিল্টন ও ডব্লিউ অ্যাডাম কর্তৃক প্রণীত শিক্ষা সম্পর্কিত রিপোর্টে যা তাঁরা প্রণয়ন করেন যথাক্রমে ১৮০৭ থেকে ১৮১৪ সালের মধ্যে এবং ১৮৩৫ থেকে ১৮৩৮ সালের মধ্যে। W. Adam বলেন, রাজশাহী জেলার কসবা বাঘাতে বিয়াল্লিশটি গ্রাম দান করা হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জনসেবামূলক কাজের জন্যে। (Adam, Second Report, p. 37)। কস্‌বা বাঘার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেসব ছাত্র পড়াশুনা করতো তাদের যাবতীয় খরচপত্রাদি, যথা বাসস্থান, আহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, বইপুস্তক, খাতা-পেন্সিল, কালি-কলম, প্রসাধন প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বহন করা হতো। —(A.R. Mallik : Br. Policy & the Muslims in Bengal, p. 150)।

কোরআন এবং হাদীস থেকে বিদ্যাশিক্ষার প্রেরণা লাভ করে সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তিগণ দরিদ্র ছাত্রদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করতেন। ধনবান সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে এ প্রথাও বিদ্যমান ছিল যে, তাঁরা উপযুক্ত গৃহশিক্ষকের মাধ্যমে তাঁদের সন্তানাদির বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। দরিদ্র ছাত্রগণও বিনাপয়সায় তাদের নিকটে শিক্ষা লাভ করতে পারতো। পাড়ুয়াতে এ নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, মুসলিম ভূস্বামীগণ তাঁদের নিজেদের খরচে প্রতিবেশী দরিদ্র ছাত্রদের বিদ্যাশিক্ষার

জন্যে শিক্ষক নিযুক্ত করতেন। এমন কোন বিত্তশালী ভূস্বামী অথবা গ্রামপ্রধান ছিলেন না, যিনি উক্ত উদ্দেশ্যের জন্যে কোন শিক্ষক নিযুক্ত করেননি। —Adam, First Report, p. 55; M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims and English Education, p. 6)।

কোরআন হাদীস ও ইসলামী শিক্ষাদান পুণ্যকাজ বলে বিবেচনা করা হতো এবং প্রায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সমুদয় ব্যয়ভার এক এক ব্যক্তি বহন করতেন, সরাসরিভাবে অথবা দান, ওয়াকফ্ বা ট্রাস্টের মাধ্যমে। শিক্ষকদের বেতন তাঁরা দিতেন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং তার গৃহাদি প্রভৃতির যাবতীয় খরচপত্র তাঁরা বহন করতেন। সেকালে পাঠ্যবই ছিল না বলে অবৈতনিক শিক্ষা দেয়া হতো। শিক্ষকগণ প্রায় স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করতেন—মস্‌জিদের ইমাম হিসাবে অথবা কোন ছোট খাটো সরকারী চাকুরীর মাধ্যমে। তার ফলে বিনা বেতনে তাঁরা ছাত্রদেরকে শিক্ষা দান করতেন। এভাবে মুসলমান দের বহু বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল যেসবের ব্যয়ভার বহন করতেন—বিত্তশালী ও দানশীল ব্যক্তিগণ। শিক্ষকমন্ডলী ও এসব মহানুভব দানশীল ব্যক্তিদের এ দৃষ্টিভংগী বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যেতো যে, শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য জীবিকার্জন ছিল না। বরঞ্চ তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে জাতির ধর্মীয় ও নৈতিক মান উন্নয়ন করা। —(M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & English Education pp. 7,8)।

W. Adam-এর রিপোর্টে এ কথাও সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, সেকালে অতি সুলভে এমনকি, বলতে গেলে বিনে পয়সায় শিক্ষালাভ করা যেতো। প্রতিটি মসজিদ ছিল মুসলিম জনগণের কেন্দ্রীয় আকর্ষণস্থল এবং মসজিদে মসজিদে যেসব মাদ্রাসা ছিল, সেখানে যেকোন ছেলে বিনে পয়সায় লেখাপড়া শিখতে পারতো। যেহেতু ছাপানো কোন পাঠ্যপুস্তক ছিল না, সে জন্যে বই পুস্তক কেনার কোন খরচই ছিল না। কালি-কলম নিজের ঘরে তৈরী করা যেতো। অবশ্য উচ্চশিক্ষার জন্যে কিছু বেতন দিতে হতো। কিন্তু তাও ছিল অতি সামান্য। ইংরেজদের আগমনের পর খৃষ্টান মিশনারী স্কুলসমূহে ইংরাজী শিক্ষা দেয়া হতো। সেখানে কেউ বিনা বেতনে পড়াশুনা করতে পারতো না। কেউ খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করলে—তার সন্তানাদির বিনা বেতনে পড়াশুনার সুযোগ দেয়া হতো। মুসলমানদের এই যে বিনে পয়সায় অথবা অতি অল্প খরচে বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ

ছিল—তার একমাত্র কারণ হলো মুসলমান শাসকগণ এবং বিত্তশালী মুসলমানগণ বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যে অকাতরে ধনসম্পদ জমিজমা প্রভৃতি দান করতেন। —(M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & English Education, p. 11)।

ইংরেজদের আগমনের পর

যে কোন জাতির শিক্ষাদীক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের পেছনে থাকে আর্থিক আনুকূল্য ও সাহায্য সহযোগিতা। বলা বাহুল্য, পলাশীর ময়দানে বাংলার মুসলিম শাসন বিলুপ্ত হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই 'রাজনৈতিক অর্থনীতি' ভেঙে পড়ে, গোটা দেশ দারিদ্র্য ও দুঃখ দুর্দশা কবলিত হয়ে পড়ে এবং বিশেষ করে মুসলমানদের জাতীয় জীবনে নেমে আসে ধ্বংসের ভয়াবহতা। কোম্পানী শাসনের প্রথম দিকেই বাংলার মুসলমানগণ বিপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কোন দায়িত্ব ব্যতিরেকেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার (Power without responsibility) জন্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যে 'দেওয়ানীর' সনদ লাভ করে, তার সীমাহীন অত্যাচার উৎপীড়নের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার হতে থাকে।

রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে অপসারিত হওয়ার পর তাদের জীবিকার্জনের সকল পথ বন্ধ হতে থাকে যার ফলে সামাজিক কাঠামো ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধও ছিন্ন হয়ে যায়। —(M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & English Education p. 14)।

মুসলমানদের হাত থেকে ইংরেজদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে, মুসলমানগণ তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যতোটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ততোটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের শিক্ষাদীক্ষা। উপরে বর্ণিত হয়েছে, তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নির্ভর করতো সরকারী সাহায্য এবং মুসলিম প্রধানগণের দান, ওয়াকফ্ সম্পত্তি, ট্রাস্ট প্রভৃতির উপর। শিক্ষার প্রচার ও প্রসারকে মুসলমানগণ মনে করতো অত্যন্ত পুণ্যময় ধর্মীয় কাজ এবং এর জন্যে তারা অকাতরে দান করতো প্রভূত অর্থ সম্পদ ও জমিজমা। বহুস্থানে ধর্মীয় ট্রাস্ট বা সংস্থার মাধ্যমে বিনা বেতনে ও বিনা খরচায়—ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের

সন্তান বিদ্যাশিক্ষা করতে পারতো। রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে অপসারিত হওয়ার পর মুসলমানদের এহেন শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মুসলমানগণ সরকারের ছোটো বড়ো সকল চাকুরী থেকে অপসারিত হয়, মুসলমান সামরিক প্রধানগণ অন্যদেশে চলে যান অথবা জীবিকা অন্বেষণের জন্যে দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় গমন করেন—যেখানে আধুনিক অর্থাৎ ইংরাজী শিক্ষা পৌঁছুতে পারেনি। মুসলমানদের উচ্চপদস্থ চাকুরীগুলি একটি একটি করে ইংরেজ ও হিন্দুদের মধ্যে বিতরণ করা হয়—যার ফলে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিলুপ্ত হয় এবং নতুন হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। অতএব এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, একটি মুসলিম সরকার, উচ্চপদস্থ সরকারী মুসলিম কর্মচারী ও মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভাবে মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে বিনষ্ট হবারই কথা এবং তা হয়েছিল।

মুসলমানদের শিক্ষাদীক্ষা ত দূরের কথা, সত্য কথা বলতে কি, ইংরেজ শাসনের পর এক শতাব্দী যাবত, মুসলমান জাতির অস্তিত্বই ছিল প্রকৃতপক্ষে বিপন্ন। যেখানে তাদের শুধু বেঁচে থাকার প্রশ্ন, সেখানে তারা তাদের সন্তান-সন্ততির শিক্ষাদীক্ষার চিন্তা করবে কি করে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার হিন্দু ধনিক-বণিক, বেনিয়া শ্রেণী, ব্যাংকার প্রভৃতির সাথে এক গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটায়। বলা বাহুল্য, এতে উভয়ের স্বার্থ সমানভাবে জড়িত ছিল। একদিকে রাজনৈতিক ক্ষমতা অভিলাষী কোম্পানীর ক্ষমতা লাভ, অপরদিকে মুসলিম শাসনের অবসান কামনাকারী হিন্দুদের কোম্পানীর নিকট থেকে বৈষয়িক, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা লাভ। কোম্পানী ক্ষমতাসীন হওয়ার পর হিন্দুগণ তাদের নিকট-সম্পর্কে আসে। তাদের অধীনে চাকুরী-বাকুরী এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্যে তারা প্রয়োজন বোধ ক'রে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করে।

কোলকাতা একটি বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল এবং সেখানকার অধিবাসী বলতে গেলে প্রায় ছিল হিন্দু। হিন্দু বণিক, ব্যাংকার, বেনিয়া ও মহাজন শ্রেণী এই কোলকাতা নগরীকে কেন্দ্র করেই তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে চেয়েছিল। কোম্পানীর অধীনে চাকুরী বাকুরী ও ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্যে তারা মনে করেছিল 'English is money'—ইংরাজী ভাষার অপর নাম

অর্থ এবং এজন্যে তারা যতোটুকুই ইংরাজী ভাষা রপ্ত করতে পারুক না কেন, তার জন্যে প্রবল আগ্রহান্বিত হয়ে পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ব্যাঙের ছাতার মতো যেখানে সেখানে, কোলকাতা ও তার আশে পাশে ইংরাজী স্কুল গড়ে উঠে এবং হিন্দুরা এসব স্কুল থেকে কাজ চালাবার মতো ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করে।

অপরদিকে মুসলমানদের অবস্থা কি ছিল তারও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক। W. W. Hunter তাঁর গ্রন্থে বলেন, "শত শত প্রাচীন মুসলিম পরিবারধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে। ফলে লাখেরাজ ভূসম্পত্তির দ্বারা মুসলমানদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছিল তাও চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে।" —(W. W. Hunter : The Indian Mussalmans, Bangladesh Edition 1975, p. 167)।

সাধারণ মুসলমান ত দূরের কথা, ইংরেজদের আগমনের পর তারা মুসলিম সমাজের প্রতি যে বর্বর ও উৎপীড়নমূলক আচরণ করেছে, যার ফলে নবাবের বংশধরদের কোন্ মর্মন্তুদ পরিণতি হয়েছিল তার একটি করুণ চিত্র এঁকেছেন খোদ হান্টার সাহেব তাঁর গ্রন্থে—

"প্রতিটি জেলায় সাবেক নবাবদের কোন না কোন বংশধর ছাদবিহীন ভগ্ন প্রাসাদে অথবা শেওলা-শৈবালে পূর্ণ জরাজীর্ণ পুকুর পাড়ে অন্তর্জ্বালায় ধুঁকে ধুঁকে মরছে। এরূপ পরিবারের অনেকের সাথেই আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের সুযোগ হয়েছে। এদের ধ্বংসপ্রাপ্ত দালান কোঠায় তাদের বয়স্ক ছেলেমেয়ে, নাতি-নাত্নী, ভাইপো-ভাইঝি গিজ্ গিজ্ করছে এবং এসব ক্ষুধার্ত বংশধরদের কারো কোন সুযোগ নেই জীবনে কিছু করার। তারা জীর্ণ বারান্দায় অথবা ফুটো ছাদযুক্ত বৈঠকখানায় বসে বসে মৃত্যুর প্রহর গুণছে আর নিমজ্জিত হচ্ছে ঋণের গভীর গহ্বরে। অবশেষে প্রতিবেশী হিন্দু মহাজন তাদের সাথে ঝগড়া বাধিয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করছে যে, হঠাৎ তাদেরকে তাদের যথাসর্বস্ব ঋণের দায়ে বন্ধক দিতে হচ্ছে। এভাবে ঋণ তাদেরকে গ্রাস করে ফেলছে এবং প্রাচীন মুসলিম পরিবারগুলির অস্তিত্ব দুনিয়ার বুক থেকে মুছে যাচ্ছে।" —(W. W. Hunter : The Indian Mussalmans, Dhaka Edition, 1975, p. 138)।

ইংরেজদের আগমনের পর তৎকালীন ভারতের গোটা মুসলিম জাতিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাংলার মুসলমানগণ।

হান্টার বলেন—

"এ প্রদেশের ঘটনাবলীর সাথেই আমি বিশেষভাবে পরিচিত। তার ফলে আমি যতদূর জানি, তাতে করে ইংরেজ আমলে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এখানকার মুসলমান অধিবাসীগণ।" —(W. W. Hunter : The Indian Mussalmans, pp. 140-141)।

সে সময়ে বাংলা বলতে বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যাকে বুঝাতো। তৎকালে উড়িষ্যার মুসলমানদের পক্ষ থেকে বিভাগীয় কমিশনার মিঃ ই, ডব্লিউ সলোনী, সি এস্ এর নিকটে প্রেরিত একটি আবেদনপত্রে তাদের করুণ অবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে। আবেদনপত্রে বলা হয়েছে ঃ—

"মহামান্য দয়াবতী মহারাণীর অনুগত প্রজা হিসাবে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থার সকল চাকুরীতে আমাদের সমান অধিকার আছে বলে আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, উড়িষ্যার মুসলমানদেরকে ক্রমশঃ দাবিয়ে রাখা হচ্ছে এবং মাথা তুলে দাঁড়াবার কোন আশাই তাদের নেই। সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করলেও জীবিকার্জনের পথ রুদ্ধ বলে আমরা দরিদ্র হয়ে পড়েছি এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে আমাদের অবস্থা হয়েছে পানি থেকে ডাঙায় উঠানো মাছের ন্যায়। মুসলমানদের এই করুণ দুর্দশা আপনার সামনে তুলে ধরছি এই বিশ্বাসে যে, আপনি উড়িষ্যা বিভাগে মহারাণীর প্রতিনিধি এবং আশা করি আপনি বর্ণ ও জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর প্রতি সুবিচার করবেন। সরকারী চাকুরী থেকে বঞ্চিত হয়ে আমরা কপর্দকহীন হয়ে পড়েছি। আমাদের অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে পড়েছে যে, আমরা দুনিয়ার যেকোন প্রত্যন্ত এলাকায় যেতে রাজী আছি—তা হিমালয়ের বরফাচ্ছাদিত চূড়াই হোক অথবা সাইবেরিয়ার জনবিরল প্রান্তরই হোক—যদি আমরা এ আশ্বাস পাই যে, এভাবে দেশ থেকে দেশান্তরে ভ্রমণের ফলে প্রতি হপ্তায় মাত্র দশ শিলিং বেতনে কোন সরকারী চাকুরী আমাদের মিলবে।" —(W.W. Hunter : The Indian Mussalmans, pp. 158-159)।

মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারের যাঁরা বিভিন্ন সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, ইংরেজদের আগমনের পর চাকুরী থেকে বঞ্চিত হয়ে শুধুমাত্র এসব পরিবারই দারিদ্র্য কবলিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল তাই নয়, বরঞ্চ, বাংলার সাধারণ মুসলিম পরিবারগুলির অবস্থাও তদনুরূপ হয়েছিল। বাংলার কৃষক ও তাঁতী সমাজও চরম দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছিল।

কোম্পানী শাসনের প্রথম দিকে মুসলমানদের দুঃখ দুর্দশার অন্ত ছিল না। 'দায়িত্ব ব্যতিরেকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত' (Power without responsibility) দেওয়ানীর অত্যাচার উৎপীড়নে প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার হয়। দেওয়ানী লাভের পূর্বে জমির খাজনা অতটা কঠোরতার সাথে আদায় করা হতো না—যতোটা এখন হচ্ছে। তারপর, পূর্বে রাষ্ট্রীয় আয় যেভাবেই হোক এদেশের মধ্যেই ব্যয় করা হতো যার ফলে এদেশের অধিবাসী কোন না কান প্রকারে উপকৃত হতো। ভারতীয় কবির ভাষায়, রাজা কর্তৃক আদায়কৃত কর ভূমির আর্দ্রতার ন্যায়। সে আর্দ্রতা রৌদ্রতাপে শুষ্ক হয়ে পুনরায় উর্বরতা দানকারী বৃষ্টিধারা হয়ে ভূমিতে প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু বর্তমানে ভারতভূমি থেকে যে আর্দ্রতা উত্তোলিত হচ্ছে তা তদ্রূপ বৃষ্টিধারার আকারে অবতরণ করছে অন্য দেশে, ভারতভূমিতে নয়। (R.C. Dutt : Economic Hist. of India, p. 11, 12)। ইংরেজ আগমনের পর মোট আয়ের একতৃতীয়াংশ পাঠানো হচ্ছিল ইংলন্ডে। রাজ কোষাগার আর 'বায়তুলমাল' রইলো না যার থেকে জনগণ বিপদকালে সাহায্য পেতে পারতো। রাজস্বও দ্বিগুণ বর্ধিত করা হয়েছিল। বাংলার তথাকথিত শেষ নবাব তাঁর শেষ বৎসরে (১৭৬৪) ৮,১৭,৫৫৩ পাউন্ড রাজস্ব আদায় করেন। পরবর্তীকালে, মাত্র ত্রিশ বৎসর পর, ইংরেজরা আদায় করে ২৬,৮০,০০০ পাউন্ড। (R.C. Dutt. Economic History of India, p. 9; M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & English Education, p. 14)। পলাশী যুদ্ধের পরবর্তী কয়েক বৎসরে এবং পরে কৃষক সমাজ যে চরম ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছিল তা কারো অজানা নেই। একদিকে ক্রমাগত দেশের ধনদৌলত ক্রমবর্ধমান আকারে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছিল, অপরদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষকদের প্রতি নতুন জমিদারদের অমানুষিক অত্যাচার চলছিল। ফলে তারা ভাগ্যোন্নয়ন কিছুতেই করতে পারেনি এবং অদ্যাবধি তারা ক্রীতদাসের ন্যায় জমিদারদেরই স্বার্থে কৃষিকাজ করে চলেছে। —(M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & Eng. Education, p. 20; R.C. Dutt. p. 27)।

পাশাপাশি হিন্দু সমাজের ভাগ্য কতখানি সুপ্রসন্ন হয়েছিল, তারও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক। ব্যবসা বাণিজ্যের ন্যায় ভূমি ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও তারা ছিল অত্যন্ত ভাগ্যবান। কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমানদের প্রায় সব জমিদারী হিন্দুদের দখলে চলে যায়। কিন্তু কোন হিন্দুর কোন জমিদারী

হাতছাড়া হয়নি। অবশ্যি প্রাচীন হিন্দু জমিদারী কোন কোন ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে বটে, কিন্তু সেসবের ব্যবস্থাপনা নতুন প্রিয়পাত্র হিন্দুদের এবং ভূঁইফোড়দের উপর অর্পণ করা হয়। প্রাচীন অভিজাত সম্প্রদায়ের স্থলে এক নতুন ধনাঢ্য শ্রেণী গজিয়ে উঠে। হিন্দু সমাজের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের এ ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। পক্ষান্তরে মুসলমানদের বেলায় তা ছিল শূন্যের কোঠায়। —(M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & English Education, p. 25)।

চাকুরী বাকুরী, জমিদারী, জায়গীরদারী, কুটীর শিল্প প্রভৃতি থেকে মুসলমানদেরকে উৎখাত করে ক্রমবর্ধমান হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী পত্তন করা হলো। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকের বাংলার ইতিহাসই হলো এই নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইতিহাস। আর এ শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল ব্যবসায়ী হিন্দু শ্রেণী থেকে। অতএব তারা যে সরকারের পুরাপুরি দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। —(M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & English Education, p. 118)।

এ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্মলাভ সহজ করে দিয়েছিল হিন্দু জাতির বর্ণপ্রথা। কারণ এ বর্ণপ্রথাই তাদের একটি বিশেষ শ্রেণীকে ব্যবসাবাণিজ্যের দ্বারা জীবিকার্জনের জন্যে পৃথক করে দিয়েছিল। এই শ্রেণীর লোকেরা এই নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে শামিল হয়ে যাচ্ছিল এবং এরা ছিল নতুন শিক্ষা অর্থাৎ ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আগ্রহান্বিত। তারা কোম্পানীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল বলে এবং ব্যবসার দালাল ও সরকারের নিম্নপদস্থ চাকুরীতে নিয়োজিত ছিল বলে, নতুন শাসকদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল। দেশের প্রশাসন সম্পর্কে প্রাথমিক কর্মচারী ও মিশনারীগণ যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখেছিলেন তা পাঠ করলে জানা যায় যে, সরকার বার বার এই হিন্দু ভদ্রলোকদের (মধ্যবিত্ত শ্রেণী) উল্লেখ করতো এবং তাদের মনোরঞ্জন ও অবস্থার উন্নতির জন্যে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিল। এ ব্যাপারে সরকার অন্য কতগুলি কারণেও প্রভাবান্বিত হয়েছিল। প্রথম কারণ এই যে, তারা মুসলিম শাসনকে মনে করতো বৈদেশিক আধিপত্যবাদ যার অধীনে এদেশের লোক অর্থাৎ হিন্দুগণ উৎপীড়িত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ যে সময়ে অবস্থার উন্নতিকল্পে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছিল, তখন দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমানগণ শহর ছেড়ে জীবন ধারণের জন্যে প্রত্যন্ত এলাকায় গমন করেছিল। ফলে তারা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি।

তৃতীয়তঃ মুসলমানদের ব্যাপারে সরকার এক চরম অবাধ নীতি (Laissez faire policy) গ্রহণ করেছিল, কারণ যাদের কাছ থেকে তারা ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়, তাদের প্রতি একটা স্বাভাবিক অবিশ্বাস-অনাস্থা তাদের ছিল। পক্ষান্তরে বাংলার হিন্দুগণ এবং ইংরেজদের দখলকৃত অন্যান্য অঞ্চলের হিন্দুগণ সরকারের দৃষ্টি এমনভাবে আকর্ষণ করেছিল যাতে করে তারা তাদের মনোরঞ্জনের দিকেই মনোযোগ দেয়। উপরন্তু খৃস্টান মিশনারীগণ খৃস্টীয় মতবাদ ও প্রচার-প্রচারণার প্রতি মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুদেরকে অধিক সংবেদনশীল পেয়েছিল এবং ফলে তারা হিন্দুদের প্রতি ইংরেজ শাসকদের অতিমাত্রায় দৃষ্টি আকর্ষণের কাজ করেছিল। অতএব, হিন্দুরা তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের খাতিরে নিদেনপক্ষে ভাসাভাসা ইংরেজী ভাষায় জ্ঞান লাভের জন্যে উদগ্রীব হয়ে পড়ে। এদিক দিয়ে মুসলমানদের কোন সুযোগই ছিল না। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো এই যে, মুসলমানদের মধ্যে কোন মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিদ্যমান ছিল না যারা তাদের দাবী উত্থাপন করে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কোন সুযোগ সুবিধা লাভ করতে পারতো। পরবর্তীকালে সরকার কর্তৃক গঠিত General Committee of Public Instruction সত্য সত্যই মন্তব্য করেছে যে, যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল তাদের 'জাতীয় ধনাঢ্য, শক্তিশালী এবং প্রকৃত অভিভাবক'—তা তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল না বলে শিক্ষাদীক্ষা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা তারা গ্রহণ করতে পারেনি। —(M. Fazlur Rahman : The Bangali Muslims & English Education, pp. 25-27) : C.E.Trevelyan : On the Education of the people of India, pp. 4-8)।

খৃস্টান মিশনারী ও ইংরেজী শিক্ষার সূচনা

মুসলিম শাসন আমলে তাদের নিজস্ব শিক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী সর্বত্র যে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান ছিল, তা কিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো তা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইংরেজ শাসন আমলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে ইংরাজী ভাষার প্রচলন করা হয়। এটা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। পরিবর্তিত পরিস্থিতি ভালো করেই উপলব্ধি করেছিল হিন্দু শ্রেণী এবং সেজন্যে তারা ইংরাজী ভাষা শিক্ষার জন্যে দ্রুত অগ্রসর হয়। মুসলমানরা মোটেই তা যে

উপলব্ধি করেনি, তা নয়। কিন্তু নতুন শিক্ষা তথা ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণে কি কি অন্তরায় ছিল এবং অনেক সময়ে এ ব্যাপারে বহু চেষ্টা সাধনা করেও তারা কেন সফল হয়নি, সে সম্পর্কেই আমরা এখানে কিছু আলোচনা করতে চাই।

প্রকৃতপক্ষে বাংলা তথা ভারতে ইংরাজী ভাষা শিক্ষাদানের সম্পর্ক রয়েছে ব্রিটিশ মিশনারীদের যীশুর বাণী বা সুসমাচার প্রচারের সাথে। কোর্ট অব ডিরেক্টর্স ১৬৫৯ সালে একটি বার্তায় সকল সম্ভাব্য উপায়ে যীশুর বাণী প্রচারের গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে। মিশনারীদেরকে তাদের জাহাজে করে ভারত ভ্রমণের অনুমতি দেয়া হতো এবং এখানে এসে দরিদ্র ও অজ্ঞ লোকদের মধ্যে যীশুর বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে এ দেশের মাতৃভাষা শিক্ষা করার জন্যে তাদেরকে উৎসাহিত করা হতো। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদত্ত ১৬৯৮ সালের সনদে এ কথার উপর জোর দেয়া হয় যে, কোম্পানী যেখানে বসবাস করবে সেখানকার মাতৃভাষা তাদেরকে শিখতে হবে যাতে করে তারা তাদেরকে গড়ে নিতে পারে। কারণ তারা হবে কোম্পানীর চাকর বা দাস অথবা প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মে তাদের প্রতিনিধি। —(M. Fazlur Rahman : Bengali Muslims & Eng. Education, p. 28; Sharp. p. 3. Parochial Annals of Bengal by H. B. Hyde; Court of Directors' letter to Fort St. George, 25 February, 1695; LAW: Promotion of Learning in India by Early European Settlers, p. 19)।

বাংলার গভর্ণর জেনারেল স্যার জন শোর বলেন যে—ধর্মীয় কারণ অপেক্ষা রাজনৈতিক কারণে এ দেশবাসীকে খৃস্টধর্মে দীক্ষা দান অধিকতর প্রয়োজন। . . . . যতোক্ষণ পর্যন্ত আমাদের প্রজাবৃন্দ আমাদের সাথে ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রাণবন্ত না হয়েছে, ততোক্ষণ আমাদের অধিকৃত রাজ্য বহিরাক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ আন্দোলন-উত্তেজনা থেকে নিরাপদ হবে না। —(M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & English Education, p. 34; Sharp : Review of Bukanan's Ireatise, Vol. I. p. 113)।

এখন একথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, বাংলা ও ভারতে ব্রিটিশ শাসন সুদৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী করার জন্যে তারা প্রয়োজনবোধ করে এ দেশবাসীর ভাষা শিক্ষা করার যাতে করে খৃস্টীয় মতবাদ এ দেশবাসীর নিকটে তারা সহজেই প্রচার করতে পারে।

এ দেশে ইংরেজদের শিক্ষা বিস্তারের ধারা ছিল পর্যায়ক্রমিক। প্রথম পর্যায়ে খৃষ্টান মিশনারীগণ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষার স্কুল স্থাপন করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য তাহ্জীব তামাদ্দুন শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে ইংরাজী ভাষার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করে।

মিশনারীগণ বৎসরের পর বৎসর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যায়। তারা হুগলী শ্রীরামপুরে একটি ছাপাখানা স্থাপন করে তার মাধ্যমে বাংলা ভাষার বহু পুস্তক প্রকাশ করে। তারা তাদের প্রচার অভিযানে কোন বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয় না, বরং উৎসাহ লাভ করে। এভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ১৮১৫ সালের মধ্যে তারা একমাত্র কোলকাতার আশেপাশেই ২০২টি স্কুল স্থাপন করে। এর বহু পূর্বে ১৭৯৪ সালে জনৈক ক্যারী ফ্রী বোর্ডিংসহ মালদাহ্তে একটি স্কুল স্থাপন করেন। তিনি বাংলায় এসে একটি নীলচাষ খামারে ওভারশিয়ারের কাজ শুরু করেন। তাঁর স্থাপিত উক্ত স্কুলে সংস্কৃত, ফার্সী ও বাংলা ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়। এতদ্সহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানদান ও খৃষ্টীয় মতবাদও শিক্ষাদান করা হয়। জনৈক মিঃ আর্চার ১৭৮০ সালে বালকদের জন্যে একটি স্কুল এবং অল্পদিন পর বালক-বালিকা উভয়ের জন্যে একটি স্কুল স্থাপন করেন। আর একটি স্থাপন করেন John Stransherow । তবে ব্রাউন এবং উইলিয়াম ফানেল কর্তৃক স্থাপিত স্কুল দু'টি বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করে। ব্রাউনের স্থাপিত স্কুলের বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তা স্থাপিত হয়েছিল হিন্দু-যুবকদের জন্যে। —(M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & Eng. Education. p. 30: Calcutta Review-1913: 'Old Calcutta': its Schoolmaster by K. N. Dhas pp. 338)।

খৃষ্টীয় মতবাদ প্রচারের জন্যে রাষ্ট্রীয় সহায়তায় কতকগুলো সমিতি ইংলন্ডে স্থাপিত হয়। তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো SPCK (Society for Promotion of Christian Knowledge), S. P. G. (Society for the Propagation of the Gospel), CMS (Church Missionary Society) প্রভৃতি। বাংলায় খৃষ্টীয় মতবাদ প্রচারে এদের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলার মিশনারীগণ তাদের স্ব স্ব সমিতিগুলোর নিকটে নিম্নোক্ত রিপোর্ট পেশ করে ঃ

"ব্যবসা-বাণিজ্য এক নতুন চিন্তাধারা ও কর্মশক্তির দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছে। যদি আমরা দক্ষতার সাথে অবৈতনিক শিক্ষাদান করতে পারি—তাহলে

শত শত লোক ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করার জন্যে ভীড় জমাবে। আশা করি তা আমরা এক সময়ে করতে সক্ষম হবো এবং এর দ্বারা যীশুখৃস্টের বাণী প্রচারের এক আনন্দদায়ক পথ উন্মুক্ত হবে।" —(M. Fazlur Rahman, Bengali Muslims & Eng. Education, p. 35; Mussalmans-Vol. I, pp. 130-31)।

খৃষ্টান মিশনারীগণ বাংলা ও ইংরাজী স্কুল স্থাপনের নাম করে খৃষ্টীয় মতবাদ প্রচার করতে গিয়ে ইসলাম ও তার মহান নবীর বিরুদ্ধে প্রচারণা করতে কুণ্ঠিত হয়নি। কর্ণওয়ালিশ প্রকাশ্য রাজপথে ও গ্রামে গ্রামে খৃষ্টধর্মের প্রচার নিষিদ্ধ করে দেন (Beveridge: Hist. of India. Vol. II. pp. 850-51)। তথাপি তারা এ কাজ চালাতে থাকে। সবশেষে মিন্টো তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর ইসলাম ও নবী মুহাম্মদের (সা) প্রতি অশোভন ও অবান্তর উক্তি সম্বলিত পুস্তিকা প্রকাশের অপরাধে মিশনারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থাবলম্বন করেন। —(M. Fazlur Rahman : Bengali Muslims & Eng. Education p. 36: Lethbridge-p. 59)।

উইলিয়াম ক্যারীর সভাপতিত্বে ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর (হুগলী) কলেজ স্থাপিত হয়। এ কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জ্ঞানদান করা এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে এদেশের লোককে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করা। শ্রীরামপুর কলেজ সেকালে এশিয়ার মধ্যে একমাত্র ডিগ্রি কলেজ। —(Mc. Cully. p 41; M. Fazlur Rahman : Beng. Muslims & Eng. Education. pp. 39-40)।

শ্রীরামপুর কলেজের, যেমন আগে বলা হয়েছে, প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো ভারতে খৃষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসার, তার জন্যে প্রয়োজন ছিল এদেশীয় খৃষ্টানদের সন্তানদেরকে উচ্চশিক্ষা দান করা এবং প্রচারক হিসেবে একটি দলকে প্রশিক্ষণ দেয়া যারা খৃষ্টীয় মতবাদ বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজও চালাবে। এতদুদ্দেশ্যে অখৃষ্টানদের জন্যে এ কলেজের দ্বার অবারিত ছিল এবং প্রভাবশালী স্থানীয় লোকদের খৃষ্টীয় মতবাদ প্রচারে সাহায্য সহযোগিতার জন্যে অনুপ্রাণিত করা হতো। ১৮৩৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দেখা গেল এ কলেজে সর্বমোট ১০১ জন ছাত্রের মধ্যে অখৃষ্টান ছাত্র রয়েছে মাত্র ৩৪ জন। এরা ছিল শ্রীরামপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বংশের সন্তান (Mc. Cully pp. 64, 65)।

দু'টি কারণে এতে কোন মুসলমান ছাত্র ছিল না। প্রথমতঃ এ কলেজের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য ছিল খৃষ্টধর্মের প্রচার এবং দ্বিতীয়তঃ এতে এমন বাংলা ভাষা শিক্ষা দেয়া হতো যে বাংলা ভাষা মুসলমানদের জন্যে ছিল অবোধগম্য। কারণ, সে বাংলা ভাষা ছিল সংস্কৃত ব্যাকরণ-জ্ঞান লব্ধ যা মুসলমানদের মোটেই জানা থাকবার কথা নয়। —(M. Fazlur Rahman : Bengali Muslims & English Education p. 40)।

মিশনারীগণ কর্তৃক স্থাপিত স্কুল কলেজগুলিতে এবং সরকার কর্তৃক স্থাপিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে (১৮০০) হিন্দু শিক্ষকদের সহযোগিতায় সংস্কৃত ভাষার প্রণালীতে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে থাকে আর এ ধরনের বাংলা ভাষা মুসলমানদের কাছে অপরিচিত ছিল। যদিও নিম্ন বংগের মুসলমান বাংলা বলতো। কিন্তু তাদের বাংলা ছিল আরবী ফার্সী মিশ্রিত। D.H.H. Wilson ব্রিটিশ হাউস অব্ কমন্সের সিলেক্ট কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেন যে, বাংলা ও হিন্দীর সংস্কৃতের সাথে নিকট সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর মতে Shakespeare's Hindustanee Dictionary-তে ৫০০ শব্দের মধ্যে ৩০৫টি সংস্কৃত শব্দ। বাংলা 'হিতোপদেশ' নামক কলেজের পাঠ্য পুস্তকে প্রথম ১৪৭টি শব্দের মধ্যে মাত্র ৫টি শব্দ এমন, যা সংস্কৃত নয়। [A.R. Mallick : Br. Policy and the Muslims in Bengal, p. 156: Sixth Report, Select Committee (HC), 1853, Minutes of Evidence, p. 9. উইলসন একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন, সংস্কৃত সম্পর্কে কিছু জ্ঞান না থাকলে কোন লোক বাংলা বুঝতে পারবে না।]

মাতৃভাষার স্কুলগুলিতে সংস্কৃত শব্দবহুল বাংলা পড়ানো হতো—এসব স্কুলের দ্বার মুসলমানদের জন্য রুদ্ধ ছিল। আবার বিহারে হিন্দী ভাষা দেবনাগরী বর্ণমালায় শিখানো হতো এবং সেটাও ছিল মুসলমানদের কাছে একেবারে অপরিচিত। —(Report of Bengal Provincial Committee, Education Commission, p. 215, Evidence of Abdul Latif in reply to Q1)।

উপরন্তু এসব স্কুলে বাংলা ভাষায় যেসব পাঠ্য-পুস্তক ছিল তা সবই হিন্দুধর্ম সংক্রান্ত। বাংলা ভাষায় সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বইগুলি পড়ানো হতো ঃ

গুরু দক্ষিণা, অমর সিংহ, চাণক্য, সরস্বতী বন্দনা, মানভঞ্জন, কলংক ভঞ্জন প্রভৃতি।

হিন্দু বই যথা, দান লীলা, দধি লীলা প্রভৃতি যা ছিল কৃষ্ণের বাল্যকালের প্রেমলীলা সম্পর্কে লিখিত। বিহারে এতদ্ব্যতীত পড়ানো হতো সুদাম চরিত, রাম যমুনা প্রভৃতি। —(A.R. Mallick : British Policy and the Muslims in Bengal, p. 156)।

এসব তথ্য থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদেরকে শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত রাখার জন্যে খৃষ্টান মিশনারী, ইংরেজ শাসক এবং এতদ্দেশীয় দালালদের এ ছিল এক ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা। আলেকজান্ডার ডাফ্ (Alexander Duff) ইংরেজী শিক্ষার জন্যে কোলকাতায় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে—যা ডাফের প্রচেষ্টায় একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু তা ছিল শুধুমাত্র নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের জন্যে এবং তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রাজা রামমোহন রায়ের সহযোগিতায়। ইচ্ছাকৃতভাবেই এ স্কুলটি একটি হিন্দু মহল্লায় এবং এমন প্রাঙ্গণে স্থাপিত হয় যেখানে একদা গড়ে উঠেছিল হিন্দু কলেজ। ডাফ্ কোন মুসলমান এলাকায় কোন স্কুল প্রতিষ্ঠার কোন চেষ্টাই করেননি।—(M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & English Education, p. 41; N. Chatterhee : Life of Mahatma Raja Rammohan Roy (Bengali), p. 394)।

আঠারো শ' সাত থেকে ১৮১৪ সালের মধ্যে ডঃ ফ্রান্সিস্ বুকানন্ বাংলা ও বিহারের জেলাগুলি সরকারের নির্দেশে সার্ভে করেন। ১৯৩৮ সালে তাঁর রিপোর্ট তিন খন্ডে আর, এস, মার্টিন কর্তৃক প্রকাশিত হয়। লর্ড বেন্টিংকের আমলে ১৮৩৫ থেকে ১৮৩৮ সালের মধ্যে ডবলিউ অ্যাডাম বুকাননের কাগজপত্রের ভিত্তিতে তিনটি রিপোর্ট প্রণয়ন করেন। তৃতীয় রিপোর্টটি ১৯৩৮ সালে প্রণীত হয়—সরজমিনে তাঁর নিজের পরীক্ষা পর্যবেক্ষণের পর। তিনি হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষাক্ষেত্রের তুলনামূলক খতিয়ান পেশ করেন, তা নিম্নরূপ ঃ

		হিন্দু	মুসলমান
(ক)	দেশীয় প্রাথমিক স্কুল	১১	১৬
(খ)	" উচ্চ বিদ্যালয়	৩৮	০
(গ)	যেসব পরিবারে পিতামাতা অথবা বন্ধুবান্ধবের দ্বারা ছেয়ে-মেয়েদের শিক্ষা দেয়া হতো	১২৭৭	৩১১

উপরের খতিয়ান দৃষ্টান্তস্বরূপ রাজশাহী জেলার নাটোর থানার দেয়া হয় যেখানে তৎকালে হিন্দুর জনসংখ্যা ছিল ৬,৫৬,৫৫৮ এবং মুসলমান ১২৯৬৪০১। এমন একটি মুসলিম অধ্যুষিত থানায় মুসলমানদের শিক্ষার অনুপাত ছিল এত নগণ্য যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত খতিয়ানে মোট শিক্ষকের সংখ্যা বলা হয়েছে, যার মধ্যে মুসলমান শিক্ষক ছিল মাত্র একজন।

মুসলমানদের শিক্ষাক্ষেত্রে এহেন অবস্থার কারণ বর্ণনা করে বলেন যে, আর্থিক দিক দিয়ে তারা অত্যন্ত নিকৃষ্ট জীবন যাপন করছিল। তিনি আরও বলেন যে, এ অবস্থায় তাদেরকে বিদ্যাশিক্ষার জন্যে উপদেশ দেয়ার অর্থ হলো, মই লাগিয়ে স্বর্গে আরোহণ করা যা সম্পূর্ণ এক অসম্ভব ও অবান্তর ব্যাপার। অ্যাডাম বলেন, সমগ্র রাজশাহী জেলার মধ্যে মুসলমানদের শিক্ষার জন্যে একটিমাত্র বিদ্যালয় ছিল বিলমারিয়া থানার কসবাবাঘাতে যা কয়েকশত বছরের পুরাতন এবং স্থাপিত হয়েছিল বাংলার মুসলমান সুলতান ও মহানুভব মুসলিম প্রধানদের পৃষ্ঠপোষকতায়।

W. Adam তাঁর তৃতীয় রিপোর্ট প্রণয়ন করেন (১৮৩৮) বাংলা-বিহারের ৫টি জেলা পরিদর্শনের পর। তার ভিত্তিতে তিনি যে খতিয়ান প্রণয়ন করেন তা নিম্নরূপ ঃ

খতিয়ান নং-১ ঃ আরবী-ফার্সী স্কুল, তাদের সংখ্যা ও ছাত্র সংখ্যা, হিন্দু ও মুসলমান।

জেলা	ফার্সী স্কুল	আরবী স্কুল	হিন্দু ছাত্র	মুসলিম ছাত্র	মোট
মুর্শিদাবাদ	১৭	২	৬২	৪৭	১০৯
বর্ধমান	৯৩	৮	৪৭৭	৪৯৪	৯৭১
বীরভূম	৭১	২	২৪৫	২৪৫	৪৯০
তিরহুৎ	২৩৪	৪	৪৪৫	১৫৩	৫৯৮
দক্ষিণ বিহার	২৭৯	১২	৮৬৭	৬১৯	১৪৮৬
মোট	৬৯৪	২৮	২০৯৬	১৫৫৮	৩৬৫৪

মজার ব্যাপার এই যে, আরবী-ফার্সী স্কুলে যোগদানকারী হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা ৪ এর তিন অনুপাতে অধিক। তারপর সংস্কৃত স্কুলে যোগদানকারী হিন্দু

ছাত্রের সংখ্যা ধরলে তাদের সংখ্যা দাঁড়াবে ৪৬৫১ এবং মুসলিম সংখ্যা ১৫৫৮।

খতিয়ান নং-২ঃ মাতৃভাষার স্কুল—তাদের সংখ্যা, ছাত্রসংখ্যা ও হিন্দু মুসলমান।

জেলা	বাংলা স্কুল	হিন্দী স্কুল	হিন্দু ছাত্র	মুসলিম ছাত্র	অন্যান্য	মোট
মুর্শিদাবাদ	৬২	৫	৯৯৮	৮২	০	১০৮০
বর্ধমান	৬৩০	০	১২৪০৮	৭৬৯	১৩	১৩১৯০
বীরভূম	৪০৭	৫	৬১২৫	২৩২	২৬	৬৩৮৩
তিরহুৎ	০	৮০	৫০২	৫	০	৫০৭
দক্ষিণ বিহার	০	২৮৬	২৯১৮	১৭২	০	৩০৯০
মোট	১০৯৯	৩৭৬	২২৯৫১	১২৬০	৩৯	২৪২৫০

উপরোক্ত খতিয়ান থেকে একথা জানা যায় যে, মুসলমানরা মাতৃভাষা শিক্ষায় হিন্দুদের থেকে অনেক পেছনে পড়ে থাকে। তার কারণও অতি সুস্পষ্ট। প্রথমতঃ সংস্কৃতবহুল বাংলাভাষা তাদের জন্যে অবোধগম্য এবং দ্বিতীয়তঃ পাঠ্যপুস্তকের বিষয়গুলি ছিল পৌত্তলিকতাপূর্ণ প্রবন্ধাদি ও গল্পকাহিনীতে পরিপূর্ণ। তৃতীয়তঃ হিন্দী স্কুলের পরিবর্তে স্কুল না থাকায় মুসলমানরা শিক্ষায় পশ্চাৎপদ রয়ে যায়। ডবলিউ অ্যাডাম মুসলমানদের জন্যে উর্দু স্কুল খোলার জন্যে এবং মুসলমানদের উপযোগী বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্যে সুপারিশ করেন। কিন্তু সরকার এদিকে কোন দৃষ্টি দেননি।

(দ্রঃ A.R. Mallick : British Policy and Muslims in Bengal. pp. 161-65)।

খৃষ্টান মিশনারী সোসাইটির (C.M.S.) কোলকাতা শাখার উদ্যোগে বর্ধমানে ১৮১৯ সালে হিন্দুদের জন্যে একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হয়। কোলকাতা শাখার প্রতিনিধি Mr. Shrew এবং Mr. Thompson নিয়মিত স্কুলটি পরিদর্শন করতে থাকেন। অবশেষে যখন ১৮২২ সালে স্কুলটিকে একটি গীর্জা প্রাঙ্গণে স্থানান্তরিত করা হয়, তখন ছাত্রদেরকে খৃষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত করা হবে

এ আশংকায় স্কুলটি নষ্ট হয়ে যায়। অনুরূপভাবে ১৮৩২ সালে বিশপ কোরী (Corrie) কোলকাতার মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা কলিংগতে একটি ইংরাজী স্কুল স্থাপন করেন। কিন্তু যখন তার পাশে একটি গীর্জা নির্মাণ করা হলো, তখন অধিক সংখ্যক মুসলিম ছাত্র স্কুল পরিত্যাগ করে। মিঃ টমসন তাঁর রিপোর্টে ছাত্রসংখ্যা হ্রাসের কারণ বর্ণনা করে বলেন (১৮৪১) যে, হিন্দুরা পাশ্চাত্য ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি যেমন অনুরাগী, মুসলমানরা তেমন নয়। —(M. Fazlur Rahman: The Bengali Muslims & English Education, pp. 44-45; Long : Handbook of Bengal Mission, p. 125)।

মিঃ টমসন প্রকৃত কারণটি গোপন রেখে মুসলমানদের উপরেই দোষ চাপিয়েছেন। প্রকৃত কারণ এই যে, পাশ্চাত্যের ভাষা ও সাহিত্যের সাথে পাশ্চাত্যের ধর্মের প্রশ্ন ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। মিশনারী স্কুলে যেতে নিজেকে মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুত করা মুসলমানদের জন্যে যতোটা কষ্টকর ছিল, হিন্দুদের ততোটা ছিল না। খৃষ্টধর্মের প্রতি মুসলমানদের ছিল বীতশ্রদ্ধা এমনকি ঘৃণাও বলা যেতে পারে। কারণ মুসলমানগণ খৃষ্টধর্মকে নাকচ করে তাদের ধর্মবিশ্বাস গড়ে তুলেছে। পক্ষান্তরে হিন্দুদের এমন কোন পূর্বজ্ঞান ছিল না, সে জন্যে তারা সহজেই খৃষ্টধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হতো।

মিশনারীদের জানা ছিল যে, তাদের যোগাযোগের ফলে বেশী সংখ্যক হিন্দু খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। সে জন্যে তাদের সকল প্রচেষ্টা হিন্দুদের প্রতি নিয়োজিত ছিল। ১৮৫৮ সালে জনৈক মিশনারী তাঁর লিখিত একখানি পুস্তিকায় মন্তব্য করেন যে, মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে সত্যিকারভাবে কোন আন্তরিক প্রচেষ্টাই চালানো হয়নি। যেসব ইউরোপীয়ানদেরকে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শনের কাজে লাগানো হতো তাঁরা মুসলমানদের ভাষা, চরিত্র ও আচার-আচরণ সম্পর্কে কোন জ্ঞানই রাখতেন না। —(M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & English Education, p. 46; India Office Tract, 242)।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মুসলিম শাসনের অবসান এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ ইংরেজদেরকে বলতে গেলে এদেশের সর্বেসর্বা বানিয়ে দেয়। ফলে কোলকাতাকে কেন্দ্র করে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য শতগুণে

বর্ধিত হতে থাকে। কোলকাতায় বিরাট বিরাট অট্টালিকা গড়ে উঠতে থাকে। যে হিন্দুদের সাহায্য সহযোগিতায় এ দেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল, তারা কোম্পানীর অধীনে চাকুরী-বাকুরী করার, তাদের ব্যবসায় অংশীদার হওয়ার অথবা ব্যবসার দালাল হিসাবে কাজ করার জন্যে দলে দলে অগ্রসর হয়। তার জন্যে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার আশু প্রয়োজনীয়তা তারা উপলব্ধি করে। সেজন্যে ইংরাজী স্কুল স্থাপনের প্রথম পদক্ষেপ তাদের পক্ষ থেকেই গৃহীত হয়। হিন্দু ব্যবসায়ী ও ধনিক-বণিকগণ তাদের ইউরোপীয় বণিক বন্ধুদের সাহায্য-সহযোগিতায় বিভিন্ন স্থানে বেসরকারী পর্যায়ে ইংরাজী স্কুল স্থাপন করে। অষ্টাদশ শতকের ন'য়ের দশকে কোলকাতার কলুটোলায় এ ধরনের একটি স্কুল স্থাপন করেন জনৈক নিত্যানন্দ সেন।

আর একটি কথা এখানে বিশেষ উল্লেখ্য। এ দেশে মিশনারীগণ বাংলা ভাষার স্কুল স্থাপনের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে খৃষ্টধর্ম প্রচারে ব্রতী হয়। এ ব্যাপারে তারা যথেষ্ট বাড়াবাড়ি করতে থাকলে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক তাদের কার্যকলাপের উপর কিছু বাধা নিষেধ আরোপ করা হয়। কিন্তু Charter Act of 1813 তাদের প্রতি আরোপিত বাধা-নিষেধ রহিত করে। এ আইনের বলে ভারতে বিশপতন্ত্র (Episcopacy) প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত হয়। ১৮১৪ সালে বিশপ মিডল্টন (Middleton) কোলকাতায় আসেন। তাঁর উৎসাহ উদ্যমে মিশনারীগণ পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু করে। কোলকাতার বিশপ কলেজে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। তাঁর অনুরোধে এ কলেজের জন্যে গভর্ণর জেনারেল বাষট্টি বিঘা জমি দান করেন। পরবর্তীকালে এর জন্যে অধিকতর সরকারী সাহায্য দান করা হয়। বিশপ মিডল্টন নিজে কলেজের গীর্জা স্থাপনের উদ্দেশ্যে পাঁচশত পাউন্ড এবং পাঁচশত পুস্তক কলেজ লাইব্রেরীতে দান করেন।

মিশনারীদের কাজে সাহায্য সহযোগিতার জন্যে ইউরোপীয় বণিকগণ এগিয়ে আসে এবং বাংলায় প্রকৃতপক্ষে ইংরাজী শিক্ষার গোড়াপত্তন তাদের দ্বারাই হয়। তাদেরই প্রচেষ্টায়, বিশেষ করে মিঃ ডেভিড হেয়ার এবং স্যার এডওয়ার্ড হাইড্ ইস্টের সাহায্য সহযোগিতায় হিন্দু যুবকদের শিক্ষার জন্যে ১৮১৭ সালে কোলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮১৬ সালের ২৭ আগস্ট স্যার এড্ওয়ার্ডের বাসভবনে হিন্দুদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এক সাধারণ সভায় এ প্রস্তাবিত কলেজের গঠনতন্ত্র ও নিয়মনীতি প্রণীত হয়। বলা হয় যে, সম্ভ্রান্ত

হিন্দু সন্তানদেরকে ইংরাজী ও ভারতীয় ভাষা এবং ইউরোপ এশিয়ার সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া এ প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। (M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & English Education, pp. 48-51; Quoted from the Rules approved by the Subscribes and general meeting held on 27 August, 1816, Calcutta Christian Observer, July 1832, p. 72)।

এ হিন্দু কলেজটি ১৮২৩ সালে একটি সরকারী কলেজে পরিণত হয়। এভাবে সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা করে। সাধারণতঃ মুসলমানদের প্রতি এ অপবাদ আরোপ করা হয়ে থাকে যে, তারা ইংরাজী ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ ছিল। এমনকি বাংলাভাষার প্রতিও তারা ছিল উদাসীন। উপরে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদেরকে শিক্ষার অংগন থেকে দূরে রাখার জন্যে কিভাবে বাংলাভাষাকে সংস্কৃতবহুল করা হয়েছিল। এটাই ছিল প্রকৃত কারণ যার জন্যে মুসলমানরা তৎকালীন বাংলাভাষার প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেনি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলমানরা কি সত্যি সত্যিই ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করতে তাদের অস্বীকৃতি জানিয়েছিল? এমন ধারণা করলে তাদের প্রতি অবিচারই করা হবে। ইংরাজী স্কুল কলেজে অধ্যয়ন করা ছিল অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ এবং মুসলমানরা ছিল দারিদ্র জর্জরিত। ধনাঢ্য হিন্দু ব্যবসায়ী মহাজনগণ তাদের ইংরেজ বন্ধুদের সাহায্য সহযোগিতায় নিজেরা প্রাইভেট ইংরাজী স্কুল স্থাপন করে, সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকেই, নিজেদের সন্তানাদির ইংরাজী শিক্ষার পথ প্রশস্ত করে নিয়েছিল। মুসলমানদের জন্যে এসব প্রচেষ্টা ছিল অসম্ভব ও অবাস্তব। একথা নিঃসংকোচে বলা যেতে পারে যে, মুসলমানরা জন্মগতভাবে, জাতিগতভাবে এবং তাদের ধর্মের দিক দিয়ে যে কোন জাতি অপেক্ষা অধিকতর শিক্ষানুরাগী ছিল। কিন্তু তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ হয়ে পড়ে। ইংরাজী শিক্ষা তথা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতিও তারা অনুরাগী ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে তারা সরকারের কণামাত্র সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারেনি। মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যে সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ১৭৮০ সালে ওয়ারেন হ্যাস্টিংস কর্তৃক কোলকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। কিন্তু ১৭৮০ থেকে ১৮২৯ সাল পর্যন্ত চল্লিশ বৎসরের এ মাদ্রাসার ইতিহাস অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এ প্রতিষ্ঠানটিকে মুসলমানদের জন্যে ইংরাজী ও পাশ্চাত্য শিক্ষাসহ একটি

উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসাবে সরকার দাঁড় করাতে পারতেন। কিন্তু তা তাঁরা করেননি। কোলকাতা মাদ্রাসায় ইংরাজী ক্লাস খোলার উপর্যুপরি দাবী সত্ত্বেও সরকার গড়িমসি করে দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন। হিন্দুদের উচ্চশিক্ষার জন্যে হিন্দু কলেজ ছাড়াও বহু ইংরাজী স্কুল হিন্দু, ইংরেজ, মিশনারী এবং কোলকাতা স্কুল সোসাইটির দ্বারা স্থাপিত হয়। কিন্তু কোথাও মুসলমানদের প্রবেশ করার কোন উপায় ছিল না। অ্যাডাম সাহেবের বর্ণনামতে কোলকাতা আপার সার্কুলার রোড এবং বড় বাজারে জনৈক খৃষ্টান এবং জনৈক হিন্দু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দু'টি স্কুল ছিল। তাঁরা স্কুলে শিক্ষকতাও করতেন। আর একটি শোভাবাজারে। এখানে তিনশত ছাত্র অধ্যয়নরত ছিল। এ স্কুলটিও একজন খৃষ্টান ও একজন হিন্দু পরিচালনা করতেন। এসব স্কুল যেহেতু বেসরকারী ছিল, সেজন্যে ছাত্রদের নিকট থেকে মোটা বেতন আদায় করা হতো। মুসলমানদের সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল কিনা জানা যায়নি। তবে থাকলেও তারা অর্থাভাবে তাদের সন্তানকে সেখানে পাঠাতে পারতো না সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। Calcutta Review (1850) এ ধরনের আরও কতকগুলি স্কুলের উল্লেখ করেছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো Oriental Seminary। ১৮২৩ সালে স্কুলটি স্থাপিত হয়। ১৮৫০ সালে এর ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫৮৫। হিন্দু কলেজের পরেই ছিল এর স্থান। বলা হয় যে, জনৈক গৌর মোহন আদ্দী স্কুলটি তাঁর দেশবাসীর জন্যে স্থাপন করেন এবং এর অধ্যাপনা কার্যে জনৈক মিঃ চার্নবুল এবং জনৈক ব্যারিস্টার Herman Geoffery-কে নিযুক্ত করেন। খুব সম্ভবতঃ এখানেও মুসলমান ছাত্রদের প্রবেশাধিকার ছিল না। এসব ছাড়াও খৃষ্টানদের সন্তানদের জন্যে কিছু বিশেষ স্কুল স্থাপন করা হয় যেখানে হিন্দু ও মুসলমানদের প্রবেশাধিকার দেয়া হয়েছিল। এগুলি হলো —The Calcutta High School, The Parental Academic Institution, The Philanthropy Academy, The Verulam Academy প্রভৃতি। প্যারেন্টাল অ্যাকাডেমী এমন স্থানে অবস্থিত ছিল যেখানে সামর্থবান মুসলমানরা তাদের ছেলেদেরকে পাঠাতে পারতো। সম্ভ্রান্ত ও সামর্থবান মুসলমান তাদের সন্তানদেরকে সেন্ট পল্‌স্ স্কুলে এবং প্যারেন্টাল এ্যাকাডেমীতে পাঠাতো। এ দু'টিতে পাঠাবার কারণ এই ছিল যে, এখানে ছেলেরা ইংরাজী ভাষায় দক্ষতা লাভ করতো এবং এ দু'টি মিশনারী ধরনের স্কুল ছিল না। এ দু'টি স্কুলে মুসলমানদের যোগদান করার কারণ বর্ণনা

করে মিঃ মুয়াত (Mouat 1952)* বলেন যে, যেহেতু কোলকাতা মাদ্রাসায় পড়াশুনা ভালো হতো না এবং আরও কিছু দোষ-ত্রুটি ছিল, যার জন্যে তাদেরকে অন্যত্র যেতে হয়েছে। (M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & English Education, pp. 57-58. Calcutta Review-1850, p. 457: Adam, op. cit. pp. 37, 41)।

মুসলমানদের শিক্ষার জন্যে ১৭৮০ সালে যে কোলকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়, তার প্রতি কোম্পানী এবং ব্রিটিশ সরকার এমন অবহেলা প্রদর্শন করেন যে, মনে হয়, শিক্ষার পরিবর্তে অশিক্ষা ও কুশিক্ষা দেয়াই ছিল কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য। এ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা প্রয়োজন বোধ করছি।

বেশ কিছু সংখ্যক খ্যাতনামা মুসলিম শিক্ষাবিদের আবেদনে হ্যাস্টিংস্ ১৭৮০ সালে মুসলমানদের শিক্ষার জন্যে কোলকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করেন। সে সময় পর্যন্ত ফৌজদারী-দেওয়ানী আদালতগুলিতে এবং পুলিশ বিভাগে মুসলমানগণ বিভিন্ন দায়িত্বে ছিল এবং প্রশাসনক্ষেত্রে ফার্সী ভাষা প্রচলিত ছিল বলে আপাততঃ শাসনকার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের জন্যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখা কোম্পানী সরকারেরও প্রয়োজন ছিল। মাদ্রাসা স্থাপনের পর জনৈক মুসলিম শিক্ষাবিদ মজ্‌দুদ্দীনের উপর মাদ্রাসা পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয়। কিন্তু ১৭৮০ সাল থেকে ১৭৯১ পর্যন্ত মাদ্রাসার কোনই অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। মজদুদ্দীনের পরিচালনায় ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা পড়ে এবং অপসারিত করে জনৈক মুহাম্মদ ইসরাইলকে দায়িত্ব দেয়া হয়। মাদ্রাসা কমিটি পুনর্গঠিত হয়, নিম্নলিখিত পাঠ্যসূচী প্রণীত হয় ঃ

প্রকৃতি দর্শন (Natural Philosophy), ফেকাহ্ শাস্ত্র, আইন শাস্ত্র, জ্যোতিঃ শাস্ত্র, জ্যামিতি, গণিত, তর্ক শাস্ত্র, এবং ব্যাকরণ। কিন্তু ১৯১২ সাল পর্যন্ত অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। অতএব মাদ্রাসা কমিটির জনৈক প্রভাবশালী সদস্য ডাঃ এম, ল্যামস্‌ডেন (Lamsden) তাঁর রিপোর্টে একজন ইউরোপিয়ান অধ্যক্ষ নিয়োগের সুপারিশ করেন। সরকার সে সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করেন, তবে Lamsden এবং Lt. Gallowny-কে মাদ্রাসার উন্নতিকল্পে গঠনমূলক প্রস্তাব ও সুপারিশের অনুরোধ জানান। ১৮১৮ সালে কমিটি একজন ইউরোপিয়ান সেক্রেটারী নিয়োগের প্রস্তাব করেন। সরকার এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন কিন্তু আর্থিক

* F. J. Mouat, Secretary to the Committee of Education.

দায়িত্ব কমিটির উপরে অর্পণ করেন যাতে করে সরকারী রাজস্বের উপর কোন চাপ না পড়ে। দুঃখের বিষয় এই যে, Dr. M. Lamsden পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের বইপুস্তক আরবী ও ফার্সীতে অনুবাদ, মাদ্রাসায় ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন ও মুসলমান ছাত্রদেরকে ইংরাজী শিক্ষাদানের জন্যে যে প্রস্তাব দেন, তা সরকার প্রত্যাখ্যান করেন অথবা বহু বৎসর যাবত গড়িমসি করতে থাকেন। (M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & English Education, pp. 68-70; A. R. Mallick : British Policy & the Muslims of Bengal, p. 176)।

কমিটির একজন দায়িত্বশীল সদস্য (Dr. M. Lamsden) যখন মাদ্রাসায় ইংরাজী ক্লাস খোলার প্রস্তাব দেন, তখন নিশ্চয়ই বুঝতে হবে যে, মুসলমান ছাত্র এবং অভিভাবকগণ ইংরাজী শিক্ষার প্রতি অনুরাগী ছিল। নতুবা তারা এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করতো। একথা স্মর্তব্য যে, বেনারস সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী ক্লাস খোলার জন্যে ১৮১৫ সালে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। মাদ্রাসা কমিটি এ ব্যাপারে পেছনে পড়ে থাকেন। অপরদিকে ১৮১৬ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয় এবং ইংরাজীতে শিক্ষাদান শুরু হয়। ১৮৫৪ সালে মুসলমানদের আবেদন নিবেদনে এ হিন্দু কলেজটি প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হয় এবং এর দ্বার সকল ধর্ম ও গোত্রের ছাত্রদের জন্যে উন্মুক্ত করা হয়। (আবদুল মওদূদ, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ৯৪; শতাব্দী পরিক্রমাঃ ডাঃ হাসান জামান, অধ্যাপক আবদুর রহীম, পৃঃ ২৩৯)।

যাহোক Lamsden-এর প্রস্তাবানুযায়ী ক্যাপ্টেন ইরভিন মাসিক তিনশত টাকা বেতনে কমিটির সেক্রেটারী নিযুক্ত হয়। ১৮২১ সালের আগস্ট মাসে নতুন বিধিব্যবস্থা অনুযায়ী প্রথম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং পরীক্ষায় ফল হয় সন্তোষজনক। পরবর্তী দু'বৎসরের ফলও ভালো হয়। ১৮২৩ সালে মিঃ জন অ্যাডাম কর্তৃক জনশিক্ষার সাধারণ কমিটি (General Committee of Public Instruction) গঠিত হয়। কমিটি ১৮২৪ ও ১৮২৫ সালের পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক বলে মন্তব্য করেন। ল্যামস্‌ডেন (Lamsden) পুনর্বার প্রস্তাব করেন যে, ছাত্রদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার প্রেরণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইংরাজী পাঠ্যপুস্তক আরবী ও ফার্সীতে অনুবাদ করা হোক। তিনি মাদ্রাসার প্রাথমিক শিক্ষাকে উন্নতমানের করার উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তুতিমূলক (Preparatory) স্কুল স্থাপনের আবশ্যকতার উপরে বিশেষ জোর দেন। কিন্তু ইউরোপীয়ানদের দ্বারা প্রভাবিত

মাদ্রাসা কমিটি ল্যামসডেনের সকল প্রস্তাব মেনে নেন। কিন্তু ইউরোপীয় শিক্ষা বিস্তারের দফাটি মেনে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। অধিকাংশ সদস্য এ মত প্রকাশ করেন যে, ইংরাজী বা ইউরোপীয় শিক্ষা প্রচলন করলে যে উদ্দেশ্যে মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছিল তা ব্যর্থ হবে। (Board's Collection, 909, p. 321, pp. 365-67, 909, p. 322; Lamsden to Madrasah Commitee, 30 May, 1823; Madrasah Committee to Governor-General, 3 July 1823)। ফলে কমিটির এ অস্বীকৃতি মুসলমান ছাত্রদের ইংরাজী শিক্ষার পথে চরম বাধার সৃষ্টি করে। অপরদিকে জনশিক্ষা কমিটি কোলকাতা সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী ক্লাস খোলার প্রস্তাবটি উৎসাহ সহকারে বিবেচনা করেছিলেন এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্যে হিন্দু কলেজটি হাতে নেন। Dr. H. H. Wilson-কে এ কলেজের সরকারী পরিদর্শক হিসাবে কমিটির সেক্রেটারী পদে নিয়োগ করেন। এর জন্যে প্রভূত পরিমাণে সরকারী অর্থও বরাদ্দ করা হয়। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসায় ইংরাজী শিক্ষা চালু করার জন্যে বার বার দাবী জানানো সত্ত্বেও তার প্রতি সরকার কোন গুরুত্বই আরোপ করেন না। অথচ বেসরকারী হিন্দু কলেজের প্রতি সরকারের অনুকম্পা, সাহায্য সহানুভূতি ও দান উপচে পড়ছিল। এর থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে, মুসলমানদের প্রতি এবং বিশেষ করে তাদের ইংরাজী শিক্ষার প্রতি সরকার কতখানি উদাসীন ছিলেন। এর থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানরা ইংরাজী শিক্ষা বর্জন করেছিল বলে তাদের প্রতি যে অভিযোগ করা হয়, তাও ভিত্তিহীন। একটি বিশেষ শ্রেণীর জন্যে পক্ষপাতিত্বের অপরাধ ঢাকার জন্যেই মুসলমানদের ঘাড়ে দোষ চাপানো হয়। হিন্দুদের মধ্যে খৃস্টান মিশনারীদের কর্মতৎপরতা ও খৃস্টধর্ম প্রচারের ইতিহাস, এমনকি হিন্দুদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হিন্দু কলেজের ইতিহাস যাঁর ভালো করে জানা আছে, তিনি অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, ইংরাজী শিক্ষার প্রতি হিন্দুদের ঘৃণা বা অনীহা যতোখানি ছিল, মুসলমানদের ততোখানি ছিল না। (M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & English Education, pp. 73-74)।

১৮২৫ সালের মাদ্রাসার বার্ষিক পরীক্ষার পর পরীক্ষকগণ, মিঃ মিল ও মিঃ টমসন পরীক্ষায় ছাত্রদের প্রশংসনীয় সাফল্য লক্ষ্য করে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়ার প্রস্তাব করেন। তাঁদের প্রস্তাবে উৎসাহিত হয়ে ল্যামস্‌ডেন মাদ্রাসায়

ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের চাপ দেন। তিনি কমিটির নিকটে তাঁর প্রেরিত প্রতিবেদনে বলেন যে, মুসলমান ছাত্র ও জনসাধারণের সংগে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ সম্পর্কের ফলে তাঁর এ ধারণা জন্মেছে যে, ইংরাজী ভাষাকে যদি শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জনের বাহন হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তাহলে এতে মুসলমানদের কোনই আপত্তি থাকবে না, বরঞ্চ তা সাগ্রহে গ্রহণ করবে। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে যদি বাইবেল প্রচারের পথ সুগম করা হয়, অথবা যদি মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত করা হয়, তাহলে আপত্তি উত্থাপিত হবারই কথা। (M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & English Education, p. 74; Board's Collection, 909, pp. 713; Lamsden to General Committee, 19 February, 1825)। Lamsden আরও প্রস্তাব দেন যে, ইংরাজী শিক্ষায় উৎসাহিত করার জন্যে প্রত্যেক ছাত্রকে আট টাকার একটি করে বৃত্তি মঞ্জুর করা হোক। ম্যাকলে এর তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হয়।

মাদ্রাসায় ইংরাজী ক্লাস খোলা না হলেও ছাত্রগণ ইংরাজী শিক্ষার জন্যে এতটা আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েছিল যে, তারা যৎসামান্য পারিশ্রমিক দিয়ে শিক্ষকদের কাছে কিছু ইংরাজী শিখতে থাকে। তাতে করে তারা ভালো ইংরাজীও শিখতে পারছে না। ল্যামস্‌ডেন এবার কমিটির নিকটে একজন ইংরাজী ভাষার শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব করেন। তাতেও কোন ফলোদয় হয় না। এভাবে মুসলমানদের দোষে নয়, বরং কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতমূলক আচরণ ও মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারে তাঁদের আন্তরিকতার অভাবেই মাদ্রাসার ছাত্রগণ ইংরাজী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকে।

এদিকে অত্যন্ত প্রভাবশালী শিক্ষাবিদ Dr. H. H. Wilson, হিন্দু কলেজের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলে তিনি সে কলেজের উত্তরোত্তর উন্নতিকল্পে অধিকতর সরকারী সাহায্যের দাবী জানান। শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বশীল মিঃ হন্ট ম্যাকেঞ্জি একটি বিশেষ শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের বেসরকারী কলেজের জন্যে অর্থ বরাদ্দ করতে অস্বীকৃতি জানান এবং একটি স্বতন্ত্র সরকারী কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব দেন। কিন্তু এর জন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় হবে বলে তা সরকার প্রত্যাখ্যান করেন। এ প্রত্যাখ্যান হিন্দু কলেজের জন্যে হলো একটি বিরাট আশীর্বাদ। এখন থেকে কমিটির গোটা সুনজর পড়লো এই হিন্দু কলেজের উপর এবং এটাকেই

ইংরাজী শিক্ষার একমাত্র পাদপীঠ হিসাবে স্থান দেয়া হলো। ১৮২৫ সালের এ কলেজ সম্পর্কিত রিপোর্টে জেনারেল কমিটি সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, ছাত্রসংখ্যা একশ' থেকে দু'শ' হয়েছে এবং যদি এত সংখ্যক ছাত্রকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও ইংরাজী ভাষায় প্রশিক্ষণ দেয়া যায়, তাহলে কোলকাতা শহরের প্রধান ও অগ্রগণ্য অধিবাসীবৃন্দের (Principal Inhabitants of Calcutta) বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত গুণাবলীর বিকাশ ও উন্নতি সাধন নিঃসন্দেহে আশা করা যেতে পারে। এখানে কোলকাতা শহরে প্রধান ও অগ্রগণ্য অধিবাসী কথাটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এ কথার দ্বারা একমাত্র কোলকাতার 'হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী'-কেই বুঝানো হচ্ছে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ কথাটির দ্বারা শিক্ষাক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের প্রকৃত মনোভাবটি পরিস্ফুট হয়ে গেছে।

প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ শাসকদের শিক্ষা সম্পর্কিত পলিসি বা নীতি ছিল, পরিস্রাবণ নীতি (Policy of 'filtration') যার দ্বারা উচ্চশিক্ষা তথা ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সীমিত করা হয়েছিল হিন্দুদের একটি নির্বাচিত শ্রেণীর মধ্যে যাদেরকে বলা হয়েছে Principal Inhabitants of Calcutta (কোলকাতার প্রধান ও অগ্রগণ্য অধিবাসীবৃন্দ) অর্থাৎ হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তারা ইংরাজী শিক্ষা লাভ করে দেশের মধ্যে এ শিক্ষাবিস্তারে ব্রতী হবে। অর্থাৎ তাদের দ্বারা যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হবে তার শিক্ষকতা যেমন করবে হিন্দু, তেমনি তার শিক্ষার্থীও হবে হিন্দু। যা প্রকৃতপক্ষে হয়েছে। বলতে গেলে, প্রধানতঃ এ শিক্ষা আবার সীমিত ছিল—উচ্চশ্রেণীর হিন্দু অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের মধ্যে। আবার এ পরিস্রাবণ নীতির ফলভোগ করেছে হিন্দু ব্যবসায়ী শ্রেণী। মুসলমান ত দূরের কথা, হিন্দু জাতির অন্যান্য শ্রেণীও এর থেকে বঞ্চিত হয়েছে। রেভারেন্ড লাল বিহারী দে মন্তব্য করেন, "ভারতে উচ্চশ্রেণীর পরিস্রাবক, কোন দিক দিয়েও পরিস্রাবক নয়। এ এমন এক মৃন্ময় পাত্র যার মুখ এমনভাবে বন্ধ যাতে করে বাইরের কোন আলো-বাতাসও ঢুকতে না পারে। একদিকে একজন ব্রাহ্মণ পেট ভরে তর্কশাস্ত্র, অধিবিদ্যা ও ধর্মশাস্ত্রের জ্ঞান আহার করছে, অপরদিকে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তসহ শুদ্র অযথাই লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে কখন তার প্রভুর আহারের টেবিল থেকে এক টুকরো খাদ্য তার ভাগ্যে জুটবে।" (L. B. Dey in reply to Babu Kishori Chand Mitter of a meeting of British

Indian Association, 1868—Quoted by H. A. Stark : Vernacular Education in Bengal, p. 89)।

এই পরিস্রাবণ নীতি অনুযায়ী সরকার হিন্দু কলেজের প্রতি তাদের সর্বাধিক মনোযোগ প্রদান করেন। ছাত্রদেরকে ষোল টাকার আটটি বৃত্তি এবং মাসিক তিনশত টাকার সাহায্য মঞ্জুর করা হয়। অতঃপর প্রাথমিক বইপুস্তকাদি ছাপানোর জন্যে ৪৯,৩৭৬ টাকা এবং ইংলন্ড থেকে পুস্তক সংগ্রহের ৫০০০/- টাকা দেয়া হয়।

এভাবে হিন্দু কলেজকে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করার সুযোগ দিয়ে উইলসন সংস্কৃত কলেজের দিকে মন দেন। এখানে ইংরাজী ক্লাস খোলার ঘোষণার সাথে সাথে ১৩৬ জন ছাত্রের মধ্যে ৪০ জন ইংরাজী শিক্ষার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করে। হিন্দু কলেজের অধ্যাপক জনৈক মিঃ টিটলারকে (Tytler) অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিয়োগ করা হয়। এসব করার পর, সরকার হয়তো লজ্জার মাথা খেয়ে, ১৮২৯ সালে কোলকাতা মাদ্রাসায় ইংরাজী ক্লাস খোলার সিদ্ধান্ত করেন। প্রথম বৎসর এপ্রিল মাসে ইংরাজীতে ২৯ জন ছাত্র হয় এবং আগস্ট মাসে হয় ৪২ জন। কিন্তু ১৮৩৬ সালে রিপোর্টে জানা গেল ছাত্রসংখ্যা ১৩৬ থেকে হ্রাস পেয়ে-১০২ হয়েছে। দারিদ্র্যই এর প্রধান কারণ বলে বর্ণনা করা হয়। কারণ মুসলমানগণ ইংরাজী শিক্ষার জন্যে নির্ধারিত ফিস্ দিতে অপারগ হয়। হান্টার সায়েব মন্তব্য করেন, "মাদ্রাসার অধিকাংশ ছাত্র প্রদেশের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে আগমন করে। তাদের দারিদ্র্যের কারণে তারা ইংরেজ ভদ্রলোকদের খানসামাদের বাসায় জায়গীর থেকে এবং সায়েবদের আর্থিক সাহায্যে পড়াশুনা করে। (M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & English Education, pp. 74-80; Hunter : The Indian Mussalmans, p. 203)।

মুসলমানদের ব্রিটিশ আমলে শিক্ষা সম্পর্কে যে দীর্ঘ আলোচনা করা হলো তা দু'টি কারণে। একটি হলো ইংরেজ সরকারের মুসলমানদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ প্রমাণ করা। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, মুসলমানরা ইংরাজী শিক্ষা বর্জন করেছিল-তাদের প্রতি আরোপিত এ অভিযোগ অমূলক প্রমাণ করা। আশা করি উপরের আলোচনায় এ বিষয় দু'টি সুস্পষ্ট হয়েছে। প্রমাণ স্বরূপ আরও দু'একটি কথা বলে রাখি।

লর্ড মেকলে ১৮৩৪ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আইন মেম্বর হিসাবে নিযুক্ত হন। তিনি ভারতের ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন ঃ

"বর্তমানে আমাদের এমন একটি শ্রেণী গড়ে তুলতে হবে, সমাজে যারা শাসক ও শাসিতের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবেন। তাঁরা মাংসের গড়নে ও দেহের রঙে ভারতীয় হবেন বটে, কিন্তু রুচি, মতামত, নীতিবোধ ও বুদ্ধির দিক দিয়ে হবেন খাঁটি ইংরেজ। (Woodrow : Macaulay's Minutes on Education in India, 1862 : আবদুল মওদূদ, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ৯৭)।

মেকলে আরও বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি আমাদের শিক্ষানীতি কার্যকর হয় তাহলে আজ থেকে ত্রিশ বছরের মধ্যে শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বাঙালী সমাজে কোন মূর্তিপূজকের অস্তিত্ব থাকবে না। (Trevelyan– Life and Letters of Lord Macaulay Vol. I, p. 455)

মেকলে সায়েব তাঁর প্রথম উক্তিতে ত্রিশ বৎসর পর যা দেখতে চেয়েছিলেন, তা যে শুরু হয়ে গেছে, ইংলন্ডে বসে হয়তো তা তিনি দেখতে পাননি। বৃটিশ পণ্যের চাহিদা কতখানি বেড়েছে তার তথ্য সংগ্রহ করা হয় ১৮৩২ সালে। এ তথ্য বিবরণীতে বলা হয় যে, কোলকাতা মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে বিলেতী বস্ত্রেরই চাহিদা বাড়েনি। বরঞ্চ বিলেতী মদেরও চাহিদা–কদর বেড়েছে। তাদের মধ্যে বিলেতী বিলাসদ্রব্যের আকর্ষণ বেড়েছে। তাদের বিলেতী আসবাসপত্র সজ্জিত বাড়ী আছে, জুড়িগাড়ী আছে এবং তারা মদ্যপানও করছে। নেটিভরা নিশ্চয়ই বেশী মদ খায়। কারণ ফিরিংগীপনায় (মেকলের ভাষায় রুচি, মতামত ও নীতিবোধের দিক দিয়ে হবে খাঁটি ইংরেজ) তাদের অনীহা বা ঘৃণা বিদ্বেষ নেই এটাই প্রমাণ করতে চায়। তারা মদ, ব্রান্ডি, বিয়ার খায়। (Select Committee Report, House of Commons, 1831-32 : মওদূদ; পৃঃ ১০)।

শিক্ষা বিষয়ে সরকারের 'পরিস্রাবণ নীতি' ব্যাখ্যা করে ট্রিভেলিয়ান সায়েব বলেন, "ব্যবসায়ী ধনী, শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রথমে লাভবান হবে; একদল নতুন শিক্ষকের আবির্ভাব হবে; দেশীয় ভাষায় পুস্তকাদি বেশী প্রকাশিত হবে। তখন এসবের দ্বারা আমরা শহর থেকে গ্রামে, অল্প থেকে বিশাল জনসাধারণের ঘরে ঘরে অগ্রসর হবো—প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। কমিটির বিবেচনায় দরিদ্রের কথাও চিন্তা করা হবে, তবে আমাদের সামর্থ সীমিত, অথচ লক্ষ লক্ষ

লোককে শিক্ষা দিতে হবে। এজন্যেই নির্বাচনের প্রয়োজন এবং প্রথমে উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের দিকেই লক্ষ্য দেয়া হয়েছে। কারণ তারা শিক্ষিত হলে জনসাধারণের মধ্যেও সুযোগ ছড়িয়ে পড়বে।"

(আবদুল মওদূদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ, পৃঃ ৯৭–৯৮; Trevelyan : p. 48)।

ট্রিভেলিয়ান সায়েবের মুখ দিয়ে ইংরেজ শাসকদের মনের কথাটি বের হয়ে পড়েছে। ধনিক–বণিক ও মধ্যবিত্ত হিন্দুশ্রেণীর সহযোগিতায় তারা মুসলমানদের কাছ থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্যের ভেতর দিয়ে তাদের সাথে এ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মিতালি ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। তাদেরকে ষোলআনা তুষ্ট রেখেই তারা এদেশে শাসন ক্ষমতা অটুট রাখতে সক্ষম হবে। অতএব তাদের অনুকম্পা ষোল আনা যে এই একটি বিশেষ শ্রেণীর উপর বর্ষিত হবে, তাতে অবিচার হলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। খৃষ্টান মিশনারীগণ এদেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্যে প্রচেষ্টা চালায়। তবে তাদের উদ্দেশ্য মহৎ ছিল না মোটেই। শিক্ষার নাম করে মুসলমানদের কাছে তাদের 'সুসমাচারের' আহবান–আবেদন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় বলে মুসলমানদেরকে তারা সুনজরে দেখতে পারতো না। এ ব্যর্থতা শেষ পর্যন্ত তাদেরকে ইসলাম ও তার মহানবীর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের লিপ্ত করে। অতএব মিশনারী, ইংরেজ শাসক ও তাদের দোসর হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী –এ তিনের চক্রে মুসলমানদের ভাগ্য নিষ্পেষিত হয়, তারা শিক্ষার অঙ্গন ও জীবিকা থেকে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং অন্য সকল সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

এ দেশের লোকের শিক্ষা ও সুখ সুবিধার জন্যে যে অর্থের প্রয়োজন তা বিলাত থেকে আনতে হতো না। এদেশের অর্থই এ দেশের লোকের জন্যে ব্যয় করা যেতো। এবং তা কখনো অনুগ্রহ অনুকম্পা বলেও বিবেচিত হতো না। এ ছিল এ দেশবাসীর অধিকার। কিন্তু এ অধিকার থেকে মুসলমানদেরকে করা হয়েছিল বঞ্চিত। সরকারী তহবিল থেকে মুসলমানদের শিক্ষার জন্যে ব্যয় বরাদ্দ করা ত দূরের কথা, মুসলমানদের শিক্ষার জন্যে প্রদত্ত দানকেও তাঁরা আত্মসাত করেছেন এবং অপাত্রে ব্যবহার করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দানবীর হাজী মুহাম্মদ মুহসিনের দানের কথাই ধরা যাক। এ সম্পর্কে মুসলমানদের বক্তব্য পেশ না করে যাঁদরেল ইংরেজ ও খৃষ্টান হান্টার সায়েব কি বলেছেন তাই বিধৃত করা হচ্ছেঃ

"১৮০৬ সালে হুগলী জেলার একজন ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত মুসলমান মৃত্যুর সময় তার বিরাট জমিদারী সৎকার্যে ব্যয়ের জন্যে দান করে যান। পরে তাঁর দু'জন ট্রাস্টীর মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। ১৮১০ সালে তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে সম্পত্তি অপব্যবহারের অভিযোগ আনলে সংকট চরমে উঠে এবং জেলার ইংরেজ কালেক্টর আদালতের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে সম্পত্তির দখল নিয়ে নেন। ১৮১৬ সাল পর্যন্ত মোকাদ্দমা চলতে তাকে এবং তখন উভয় ট্রাস্টীকে বরখাস্ত করে উক্ত জমিদারীর ব্যবস্থাপনা সরকার নিজ হাতে গ্রহণ করেন। একজন ট্রাস্টীর দায়িত্ব সরকার নিজে গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় জনের স্থলে নতুন একজনকে মনোনীত করেন। পরের বছর নির্ধারিত রাজস্ব প্রদানের শর্তে সমস্ত সম্পত্তি ইজারা দেয়া হয়। মামলা চলাকালীন বকেয়া পাওনাসহ ইজারা বাবদ প্রাপ্ত মোট আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৫,৭০০ স্টার্লিং পাউন্ড। (এ আয় থেকেই কলেজ বিল্ডিং এর মূল্য পরিশোধ করা হয়)। এ ছাড়াও জমিদারীর বার্ষিক আয় থেকে এ পর্যন্ত ১২০০০স্টার্লিং পাউন্ড অধিক উদ্বৃত্ত হয়।

"আগেই বলেছি, জমিদারীর আয় বিভিন্ন সৎ কাজে ব্যয় করার জন্যে ট্রাস্ট গঠিত হয়। উইলে যেসব সৎকাজে ব্যয় করার কথা বলা হয়, তার মধ্যে রয়েছে কতিপয় ধর্মীয় প্রচার অনুষ্ঠান প্রতিপালন, হুগলী ইমামবাড়া বা বড়ো মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ, একটি গোরস্থান, কতিপয় বৃত্তি এবং বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ করা। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থ যোগান দেয়া ট্রাস্ট গঠনের উদ্দেশ্যের আওতায় পড়ে। কিন্তু প্রতিষ্ঠাতার ইচ্ছানুসারে সেটাকে মুসলমানদের রীতিমাফিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে হবে। মুসলিম দেশগুলিতে মেধাবী দরিদ্র ছাত্রদের জন্যে কলেজ প্রতিষ্ঠা করাকে ধর্মীয় কাজ হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু এই উইলের অর্থ কোন অ-মুসলিম কলেজের কাজে ব্যয় করা উইলকারীর ইচ্ছার ব্যতিক্রম বলে বিবেচিত হবে এবং সেটা ট্রাস্টীদের ক্ষমতার গুরুতর অপব্যবহার হিসাবেই গণ্য হবে।

"সুতরাং এই তহবিলের টাকা একটি ইংরাজী কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় করায় মুসলমানরা কিরূপ ক্রোধের সাথে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে তহবিল তছরুপের অভিযোগ আনতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। কার্যতঃ হয়েছেও তাই। কেবলমাত্র ইসলাম-ধর্মীয় কাজে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত সম্পত্তির টাকা দিয়ে সরকার এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে

তুলেছে যেখানে ইসলামের নীতিবিরোধী বিষয়সমূহ শিক্ষা দেয়া হয় এবং যে প্রতিষ্ঠান থেকে মুসলমানদেরকে কার্যতঃ বাদ দেয়া হয়েছে।

বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ একজন ইংরেজ ভদ্রলোক যিনি ফার্সী বা আরবী ভাষার একটি বর্ণও জানেন না। মুসলমানরা ঘৃণা করে এমন সব বিষয় শিক্ষা দেয়ার জন্যে এ অধ্যক্ষ কেবলমাত্র মুসলমানদের কাজে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত তহবিল থেকে বছরে ১৫০০ স্টার্লিং পাউন্ড বেতন পেয়ে থাকেন। অবশ্য এটা ঐ অধ্যক্ষের কোন অপরাধ নয়। এজন্যে অপরাধী হচ্ছেন সরকার যারা তাকে এ দায়িত্বে নিযুক্ত করেছেন। গত পঁয়ত্রিশ বছর যাবত সরকার ঐ বিরাট শিক্ষা তহবিলের অর্থ ইচ্ছাকৃতভাবে তছরুপ করে আসছেন। সরকার নিজের গুরুতর বিশ্বাস ভংগের অপরাধ ঢাকা দেয়ার ব্যর্থ প্রয়াস হিসাবে ইংরাজী কলেজটির সাথে একটি ছোট মুসলমান স্কুলকে (হুগলী মাদ্রাসা) সংশ্লিষ্ট করেন। কলেজ বিল্ডিং নির্মাণের জন্যে উক্ত তহবিলের টাকা তছরুপ করা ছাড়াও কলেজ রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে তহবিল থেকে বার্ষিক ৫০০০ স্টার্লিং পাউন্ড ব্যয় করা হচ্ছে। অর্থাৎ প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে এই যে, তহবিলের ৫২৬০ স্টার্লিং পাউন্ড আয়ের মধ্যে মাত্র ২৫০ স্টার্লিং পাউন্ড উক্ত ক্ষুদ্র মুসলিম স্কুলের জন্যে ব্যয় হচ্ছে এবং ট্রাস্টের মৌল বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ হিসাবে এ ক্ষুদ্র মুসলিম স্কুলটিই শুধু টিকে আছে।

"এ তছরুপের অভিযোগ নিয়ে বাদানুবাদ করা খুব কষ্টকর ব্যাপার কারণ এ অভিযোগ খন্ডন করা সম্ভবপর নয়। মুসলমানরা অভিযোগ করে বেড়াচ্ছে যে, মুসলমানদের এ বিরাট ধর্মীয় সম্পত্তির মালিকানা দখলের অসদুদ্দেশ্যে বিধর্মী ইংরেজ সরকার সম্পত্তির মুসলিম ট্রাস্টীদের অব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেছেন এবং তারপর দাতার পবিত্র ধর্মীয় উদ্দেশ্যের বরখেলাপ করে সরকার মুসলমানদের স্বার্থ বিরোধী একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন করেছেন যার ফলে সরকারের কৃত অপরাধ অধিকতর গুরুতর হয়ে দেখা দিয়েছে। বলা হয়েছে যে, কয়েক বছর আগে আলোচ্য ইংরাজী কলেজের মোট তিনশ' ছাত্রের মধ্যে এক শতাংশও মুসলমান ছিল না। তারপর এই অবমাননাকর বৈষম্য হ্রাস পেলেও অবিচারের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অসন্তোষ এখনও পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। বিষয়টি গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখেছেন এমন এক সিভিলিয়ান লিখেছেন—

"এ বিষয়ে ব্রিটিশ সরকার নিজের কাজের দ্বারা যে ঘৃণা ও অবমাননা কুড়িয়েছেন তাকে অতিরঞ্জিত করে দেখা অসুবিধাজনক বলে আমি মনে করি। আমার মন্তব্যের ভাষা কঠোর মনে হতে পারে, কিন্তু আমি প্রমাণ করে দেখাতে পারি যে, ভারতে আমার আটাশ বছর বসবাসকালে আমি বিষয়টির সত্যাসত্য যাচাই করে দেখেছি (এ দেশে প্রথম আগমনের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমি হুগলী সফর করি) এবং আমি বলতে পারি যে, তখন এদেশীয় বা ইউরোপীয় কারো কাছ থেকেই অন্য কিছু আমি শুনিনি। যথার্থ হোক বা না হোক মুসলমানরা মনে করে যে, এ ব্যাপারে সরকার তাদের প্রতি অন্যায় ও সংকীর্ণমনা আচরণ করেছেন, এবং তাদের কাছে এটা একটা স্থায়ী তিক্ত অভিজ্ঞতায় পর্যবসিত হয়েছে।"

(W. W. Hunter : The Indian Mussalmans, বাংলা অনুবাদ এম আনিসুজ্জামান, পৃঃ ১৬৩–১৬৫)।

এ ছিল দু'জন ইংরেজ সায়েবের স্পষ্টোক্তি যাঁরা ব্রিটিশ সরকারের অতীব দায়িত্বশীল কর্মচারী হিসাবে এদেশে এসেছিলেন। মুসলমানদের প্রতি চরম অবিচার দেখে তাঁদের অন্তরাত্মা হয়তো ডুকরে কেঁদে উঠেছিল। তারই অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছিল তাঁদের লেখায়। কিন্তু এতেও কি অবিবেচক ও অত্যাচারী সরকারের টনক নড়েছিল? তাঁরা এ দেশের এক শ্রেণীকে মনে করতেন তাঁদের দুশমন এবং আর এক শ্রেণীকে জানের দোস্ত। দুশমনের ন্যায্য হক আত্মসাৎ করে তাই দিয়ে মনতুষ্টি সাধন করেছেন দোস্তের। ব্রিটিশ শাসনের শেষ তক্ এ অবিচার অব্যাহত রয়েছে। গ্রন্থকার ১৯২৫ সাল থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত উক্ত কলেজ সংলগ্ন ছোট্ট মুসলিম স্কুলে বাল্যজীবন কাটিয়েছে। হান্টার সায়েবের বর্ণিত অবস্থার তখনো কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি। ধর্মীয় দানের এর চেয়ে বড়ো আত্মসাৎ ও অপব্যবহার আর কোথাও হয়েছে বলে মানব ইতিহাসে খুঁজে যে পাওয়া যাবে না তা নিঃসংকোচে বলা যেতে পারে। মুসলমানদের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে, ব্রিটিশ এ দেশ থেকে চলে যাওয়ার পর উত্তরাধিকার সূত্রে উক্ত দানের সম্পত্তি ও তহবিল লাভ করেছেন তাদেরই সেকালের দোসর। অতএব অবস্থার পরিবর্তন অচিন্তনীয়।

ইংরেজ–শাসকগোষ্ঠী, খৃষ্টান মিশনারী ও বাংলার হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী—এ ত্রিচক্রের গভীর ষড়যন্ত্রের ফলেই মুসলমানরা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা থেকে

বঞ্চিত হয় এবং তার ফলে শিক্ষা দীক্ষা ও জীবিকার্জনের পথ তাদের রুদ্ধ হয়ে যায়। ১৮৩৭ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে সরকারী কাজকর্মে অফিস আদালতে ইংরাজী ভাষা চালু করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, ইংরেজরা কূটবুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে চুপে চুপে ইংরাজীকরণ নীতি চালু করে; তার জন্যে কোন পূর্ব ঘোষণা করেই। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, জনসমষ্টিকে সচেতন না করে, নিজের সংকল্প কার্যকর করা। তাদের প্রিয়পাত্র শ্রেণীটির কিন্তু এ গোপন ষড়যন্ত্র জানা ছিল। তাই পয়লা এপ্রিল থেকে হঠাৎ ইংরাজী ভাষা হওয়ার সাথে সাথে তারা সকল সরকারী অফিসগুলিতে জেঁকে বসে গেল। এদিকে ইংরেজ মিশনারীদের কূট চালে আরবী ফার্সী শব্দাশ্রিত মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ ভাষা–অবদান উর্দুকেও স্থানচ্যুত করে সংস্কৃত শব্দবহুল হিন্দুস্থানী ভাষাও সৃষ্ট হয় এবং সরকার অনুমোদিত একমাত্র দেশীভাষা হিসাবে চাকুরী প্রাপ্তির সনদ হিসাবে স্বীকৃত হয়।

(আবদুল মওদূদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ··· পৃঃ ৯৮–৯৯)। এর উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের জন্যে সকল চাকুরীর দ্বার রুদ্ধ করে দেয়া।

এভাবে ইংরাজী শিক্ষার বোধন হয়েছিল প্রধানতঃ রাজনৈতিক গরজে এবং নগরবাসী একটিমাত্র শ্রেণীর মংগল বিধানে। বাস্তবপক্ষে ইংরাজী শিক্ষাই হলো এদেশীয়দের সরকারী অফিস আদালতে চাকুরী লাভের একমাত্র পাসপোর্ট। আর এজন্যে এ ভাষাটার শিক্ষা হয় দ্রুত, নিশ্চিত ও সর্বব্যাপক। কিন্তু এ শিক্ষানীতির সবচেয়ে মারাত্মক দিক হলো, মাত্র মধ্যবিত্ত ভদ্রসমাজেই তা সীমিত করা হয়েছিল, জনসাধারণ মর্মান্তিকভাবে উপেক্ষিত হলো। আবার ইংরাজী শিক্ষার সমস্ত সুযোগ সুবিধা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দুরাই আত্মসাৎ করলো, অভিজাত হিন্দুরা এবং সমগ্র মুসলিম দূরে পড়ে রইলো। দেশকে ইংরেজীয়ানা করণের এই অনুপ্রবেশ–যুদ্ধে মেকলে পন্থীরাই জয়ী হয়েছিলেন। (আবদুল মওদূদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ . . . পৃঃ ৯৯–১০০; John Marshall : An Advanced History of India, pp. 818-19)।

উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাঙ্গন ও চাকুরী ক্ষেত্রে মুসলমানদের কি অবস্থা ছিল সে সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধির জন্যে নিম্নে কিছু খতিয়ান সংযোজিত হলো।

১৮৫২ সালের ৩০শে এপ্রিলে সরকারী স্কুল কলেজে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রসংখ্যা ঃ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য	মোট
হিন্দু কলেজ	৪৭১	০	০	৪৭১
পাঠমালা	২১৬	০	০	২১৬
ব্রাঞ্চ স্কুল	২৫৫	০	০	২৫৫
সংস্কৃত কলেজ	২৯৯	০	০	২৯৯
মাদ্রাসা	০	৪৩৩	০	৪৩৩
হুগলী কলেজ	৩৮৯	৬	২	৩৯৭
হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল	১৬০	২	২	১৬৪
হুগলী মাদ্রাসা	১৮	১৪৫	০	১৬৩
হুগলী মক্তব	৯	৪৭	০	৫৬
সীতাপুর মাদ্রাসা	০	৪০	০	৪০
ঢাকা কলেজ	৩২৩	২৯	৩১	৩৮৩
কৃষ্ণনগর কলেজ	২০৫	৭	১	২১৩
চট্টগ্রাম কলেজ	৯৭	৮	২০	১২৫
কুমিল্লা কলেজ	৮১	৬	৪	৯১
সিলেট কলেজ	৮০	১১	১	৯২
বাউলিয়া কলেজ	৮৩	০	২	৮৫
মেদিনীপুর কলেজ	১১৭	৭	১	১২৫
যশোর কলেজ	৯৬	৭	০	১০৩
বর্ধমান কলেজ	৭১	৩	০	৭৪
বাঁকুড়া কলেজ	৭৪	০	০	৭৪
বারাসত কলেজ	১৭৪	০	০	১৭৪
হাওড়া কলেজ	১২৩	৬	০	১২৯
উত্তরপাড়া কলেজ	১৭৫	০	০	১৭৫
বারাকপুর কলেজ	৮৮	২	০	৯০
রসপাগলা কলেজ	১০	৩৭	০	৪৭
মোট	৩৮১৪	৭৯৬	৬৪	৪৬৭৪

(A. R. Mallick : British Policy & the Muslimsin Bengal, p. 280)

উপরোক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৮৫৬ সালের এপ্রিল মাসের ছাত্রসংখ্যা। ইতিমধ্যে হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজে পরিণত হয়েছে এবং কোলকাতা মাদ্রাসায় ইংরাজী শিক্ষার জন্যে অ্যাংলো পার্সীয়ান বিভাগ (A.P.) খোলা হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য	মোট
প্রেসিডেন্সী কলেজ	১২৭	০	৫	১৩২
হিন্দু কলেজ	৪৬২	০	০	৪৬২
কলুটোলা স্কুল	৫৬৭	০	৪	৫৭১
মাদ্রাসা (আরবী)	০	৫৯	০	৫৯
মাদ্রাসা (এপি)	০	১১১	০	১১১
কলিংগ স্কুল	১২৪	১৫	৪	১৪৩
সংস্কৃত কলেজ	৩৩৯	০	০	৩৩৯
পাঠশালা	৩৪৫	০	০	৩৪৫
মেডিক্যাল কলেজ	১৪৮	৯৬	৩৪	২৭৮
হুগলী কলেজ	৪৫৫	৭	৬	৪৬৮
হুগলী মাদ্রাসা	৪	১৭৫	০	১৭৯
হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল	১৬৯	৮	০	১৭৭
ঢাকা কলেজ	৩৯০	২৪	৪১	৪৫৫
কৃষ্ণনগর কলেজ	২৪০	৭	০	২৪৭
বহরমপুর কলেজ	২২৭	১০	৫	২৪২
হাওড়া স্কুল	২২৯	৩	৪	২৩৬
উত্তরপাড়া স্কুল	২০৩	০	০	২০৩
বীরভূম স্কুল	১০৪	১০	০	১১৪
মেদিনীপুর স্কুল	১৪৫	১০	০	১৫৫
বাঁকুড়া স্কুল	১৪৬	১	০	১৪৭
বাউলিয়া স্কুল	১২৯	৫	০	১৩৪
রসপাগলা স্কুল	৪০	৬৩	০	১০৩
বারাসত স্কুল	১৯২	৩	০	১৯৫
বারাকপুর স্কুল	১১৬	২	০	১১৮
যশোর স্কুল	১৩৪	৫	২	১৪১
পাটনা স্কুল	১৪৪	৪	০	১৪৮

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য	মোট
ফরিদপুর স্কুল	১০২	৪	০	১০৬
বরিশাল স্কুল	২০৯	২২	৩	২৩৪
কুমিল্লা স্কুল	৯৩	১৬	৭	১১৬
নোয়াখালী স্কুল	৬৬	১	৪	৭১
চট্টগ্রাম স্কুল	১৬৬	৪২	১৪	২২২
বগুড়া স্কুল	৮৫	৬	০	৯১
দিনাজপুর স্কুল	১১৪	৮	৪	১২৬
ময়মনসিংহ স্কুল	১৬৭	৯	৮	১৮৪
সিলেট স্কুল	১৫৭	৫	২	১৬৪
মোট	৬৩৩৮	৭৩১	১৪৭	২২১৬

(A. R. Mallick : British Policy & the Muslims in Bengal, p. 281)

বাংলায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় চাকুরীক্ষেত্রে এপ্রিল ১৮৭১ সালে মুসলমানদের স্থান কোথায় ছিল তার একটি খতিয়ান সংযোজিত করেন হান্টার সায়েব তাঁর গ্রন্থে। তা নিম্নরূপ ঃ

	ইউরোপীয়ান	হিন্দু	মুসলমান	মোট
চুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিস (মহারানী কর্তৃক ইংলন্ড থেকে নিয়োগপত্র প্রাপ্ত)	২৬০	০	০	২৬০
রেগুলেশন বহির্ভূত জেলাসমূহে				
বিচার বিভাগীয় অফিসার	৪৭	০	০	৪৭
এক্সট্রা অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার	২৬	৭	০	৩৩
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর	৫৩	১১৩	৩০	১৯৬
ইনকাম ট্যাক্স অ্যাসেসর	১১	৪৩	৬	৬০
রেজিস্ট্রেশন বিভাগ	৩৩	২৫	২	৬০
স্মল কজেজ কোর্টের জজ ও সাব-অর্ডিনেটজজ	১৪	২৫	৮	৪৭
মুন্সেফ	০	১৭৮	৩৭	২১৬
পুলিশ বিভাগ, সকল গ্রেডের গেজেটেড অফিসার	১০৬	৩	০	১০৯
গণপূর্ত বিভাগ, ইঞ্জিনিয়ারিং এস্টাবলিশমেন্ট	১৫৪	১৯	০	১৭৩
গণপূর্ত বিভাগ, সাব-অর্ডিনেট এস্টাবলিশমেন্ট	৭২	১২৫	৪	২০১
গণপূর্ত বিভাগ, একাউন্ট এস্টাবলিশমেন্ট	২২	৫৪	০	৭৬
মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট, মেডিক্যাল কলেজে, জেলখানায়, দাতব্য চিকিৎসালয়ে, স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও রোগ প্রতিষেধক বিভাগে নিযুক্ত কর্মচারী এবং জেলা মেডিক্যাল অফিসার ইত্যাদি	৮৯	৬৫	৪	১৫৮
জনশিক্ষা বিভাগ	৩৮	১৪	১	৫৩
শুল্ক, নৌ চলাচল জরিপ, আফিম নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগ	৪১২	১০	০	৪২২
মোট	১৩৩৮	৬৮১	৯২	২১১১

W.W. Hunter : The Indian Mussalmans, Bangladesh Edition 1975, p. 152)।

উপরোক্ত খতিয়ানটি সংযোজিত করার পর হান্টার সায়েব নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন ঃ

একশ' বছর পূর্বে সকল সরকারী পদ মুসলমানদের ছিল একচেটিয়া। কদাচিৎ শাসকগণ কিছু অনুগ্রহ বিতরণ করলে হিন্দুরাও গ্রহণ করে কৃতার্থ হতো; এবং টুকটাক দু' একটা অথবা কেরানীগিরিতে দু'চারটা ইউরোপীয়ানকে দেখা যেতো। কিন্তু উপরের হিসাবে দেখানো হয়েছে যে, পরবর্তীকালে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের হার দাঁড়িয়েছে সাত ভাগের একভাগেরও কম। আর হিন্দুদের সংখ্যা ইউরোপীয়ানদের তুলনায় অর্ধেকেরও বেশী। আর মুসলমানদের সংখ্যা ইউরোপীয়ানদের এক চতুর্থাংশেরও কম। একশ' বছর পূর্বে সরকারী চাকুরীতে যাদের একচেটিয়া অধিকার ছিল, এখন তাদের আনুপাতিক হার মোট সংখ্যার তেইশভাগের এক ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। এও আবার গেজেটেড চাকুরীর বেলায় যেখানে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বন্টনের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। প্রেসিডেন্সী শহরের অপেক্ষাকৃত সাধারণ চাকুরীতে মুসলমানদের নিয়োগ

প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ক'দিন আগে দেখা গেল যে, কোন একটা বিভাগে এমন একজন কর্মচারীও নেই যে মুসলমানের ভাষা জানে এবং কোলকাতার বুকে কদাচিৎ এমন একটা সরকারী অফিস চোখে পড়ে যেখানে চাপরাশী ও পিয়নের উপরের পদে একটিও মুসলমান চাকুরীতে বহাল আছে।

এ সবের কারণ কি এই যে, মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুরা অধিকতর যোগ্য এবং সুবিচার পাবার অধিকার শুধু তারাই রাখে? অথবা ব্যাপার কি এই যে, সরকারী কর্মক্ষেত্রে তারা আসতে চায় না এবং তাদের চাকুরীর জায়গাগুলি হিন্দুদের জন্যে ছেড়ে দিয়েছে? হিন্দুরা অবশ্যি উৎকৃষ্ট মেধার অধিকারী, তাই বলে সরকারী চাকুরীগুলি একচেটিয়া অধিকার ভোগ করার জন্যে যে ধরনের সার্বজনীন ও অসাধারণ মেধা দরকার, তা বর্তমানে তাদের মধ্যে নেই এবং তাদের অতীত ইতিহাসও একথার পরিপন্থী। আসল সত্য কথা এই যে, এদেশের শাসন ক্ষমতা যখন আমাদের হাতে আসে তখন পর্যন্ত মুসলমানরাই ছিল উচ্চতর জাতি। উচ্চতর শুধু মনোবল ও বাহুবলের দিক দিয়েই নয়, বরঞ্চ রাজনৈতিক সংগঠন পরিচালনার দক্ষতা এবং রাষ্ট্র পরিচালনার বাস্তব জ্ঞানের দিক দিয়েও তারা ছিল উন্নততর জাতি। এতদসত্ত্বেও সরকারী বেসরকারী কর্মক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রবেশ পথ বন্ধ হয়ে গেছে। (W.W. Hunter : The Indian Mussalmans, pp. 152-53)।

উপরোক্ত খতিয়ানে জনশিক্ষা বিভাগে মুসলমানদের যে অবস্থা দেখানো হয়েছে, তার থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানদের জীবিকার্জনের পথ বন্ধ করার জন্যে কিভাবে শিক্ষার অংগন থেকে তাদেরকে দূরে রাখা হয়েছিল। মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্যে সরকারের প্রতি বার বার দাবী জানানো হয়েছে। কিন্তু সবই অরণ্যেরোদন হয়েছে। মুসলমানরা ছিল দারিদ্র-নিষ্পেষিত। উচ্চশিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু এ ব্যাপারে মুসলমানদের দানের টাকাও সদ্ব্যবহার করা হয়নি। বরঞ্চ তা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

সৈয়দ আমীর হোসেন নামক পাটনার একজন মুসলমান ১৮৭৩ সালে ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রের স্থলে বাংলা বিধানসভার সভ্য নিযুক্ত হন। মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধিকল্পে তাঁরও উৎসাহের অন্ত ছিল না। ১৮৮০ সালে তিনি মুসলমানদের শিক্ষা সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে তাদের শিক্ষা বিস্তৃতির জন্যে বিশেষ জোর দেন। তিনি বলেন—

মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার উন্নতি হচ্ছে না। সরকার এ বিষয়ে উদাসীন। ইংরেজী শিক্ষা না করায় ভারতের অন্যান্য জাতির সঙ্গে মুসলমানরা প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে না। অথচ মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষায় আগ্রহী... অনেক আরবী-ফার্সী শিক্ষিত ব্যক্তিকে দুঃখ করতে শোনা যায় তাঁরা ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ পাননি। এজন্যে তাঁদের কোন জীবনোপায় নেই। মহসিন ফান্ডের টাকায় হুগলী, রাজশাহী ও চট্টগ্রামে যে ধরনের মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে, তার দ্বারা কোন উপকার হয় না। অতএব হুগলী মাদ্রাসা তুলে দেয়া হোক। রাজশাহী ও চট্টগ্রামের মাদ্রাসার ব্যয় সংকোচ করা হোক। এভাবে মহসিন ফান্ডে যে ৯৩ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হবে, তার দ্বারা কোলকাতা মাদ্রাসার গৃহে স্বতন্ত্র ডিগ্রী কলেজ খোলা হোক। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে ইংরাজী উচ্চশিক্ষা বৃদ্ধি পাবে। অথচ সরকারের পৃথক খরচ হবে না।

কিন্তু এমন সদযুক্তি সরকারের গ্রাহ্য হয়নি। তদানীন্তন গভর্ণর আমীর হোসেনের প্রস্তাবে কর্ণপাত করেননি। এই অজুহাত দেখিয়ে-"এখনও মুসলমানদের মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি আগ্রহ কমেনি, ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়েনি। সারা বাংলাদেশে গড়ে ৩২ জন মুসলমান ছেলে বছরে এন্ট্রান্স পাশ করে। তাদের মধ্যে বড়জোর ২০ জন কলেজে পড়ে। এতো কম সংখ্যক ছাত্র দিয়ে প্রেসিডেন্সীর মতো কলেজ খোলা যুক্তিযুক্ত হবেনা। কোলকাতার কলেজগুলিতে মুসলমান ছাত্রদের এক তৃতীয়াংশ বেতন দিয়ে পড়ার ব্যবস্থা করলেই যথেষ্ট হবে।"

একদিকে বিদেশী রাজশক্তির বিরূপ মনোভাব হেতু নিপীড়ন, ঔদাসিন্য ও অবহেলা, অন্যদিকে সেই শক্তিরই অনুগ্রহপুষ্ট প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের হৃদয়হীন বঞ্চনা ও স্বার্থরক্ষার তাগিদে মুসলমানদেরকে শিক্ষা তথা জীবনোপায়ের সবক্ষেত্র হতে সুপরিকল্পিত বিতাড়ন—এই ছিল মুসলমানদের পশ্চাদপদতার কারণ।

(আবুদল মওদূদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ... পৃঃ৩৩২-৩৪)।

ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে শুধুমাত্র মুসলমান ছেলেরাই ইংরেজী শিক্ষার জন্যে লালায়িত ছিল না। পর্দার অন্তরালে মুসলমান বালিকারাও এর জন্যে আগ্রহান্বিত ছিল। কিন্তু তাদের জন্যে কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। ১৮৪৯ সালে কোলকাতার বেথুন স্কুল (পরে বেথুন কলেজে রূপান্তরিত) স্থাপিত হলেও

সেখানে মুসলমান বালিকার প্রবেশাধিকার ছিল না।

আবদুল মওদূদ তাঁর গ্রন্থে ১৩০৯ সালের ২৩শে মাঘে প্রকাশিত 'মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্রের' বরাত দিয়ে বলেন–

'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকার একটি প্রবন্ধ 'মুসলমান স্ত্রী সমাজে ইংরেজী শিক্ষা' –এরূপ লিখেছিলেন ঃ

আমরা কখনও স্বপ্নে ভাবি নাই ১৯০১ সালের আদমশুমারী আমাদের নিকট ৪০০ (চারশত) মুসলমান স্ত্রীলোকের ইংরেজী শিক্ষার কথা প্রচার করিবে। একথা প্রচারিত হওয়ার পর আমাদের কর্তব্য কি? যদি অন্তপুরে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন সম্ভব, তবে স্কুল স্থাপন করিয়া বালিকাগণকে শিক্ষা দিতে আপত্তি কি? কলিকাতার বেথুন স্কুলে মুসলমান বালিকার প্রবেশাধিকার নাই। বেথুন স্কুল ছাড়া অন্যান্য স্কুলে পড়িতে পারে। বিশেষ করে আমাদের বালিকা মাদ্রাসাগুলিতে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করা হয়। (আবদুল মওদূদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজে বিকাশ...পৃঃ ৩৩৫)।

কিন্তু মুসলমানদের সকল আবেদন নিবেদন, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী সবকিছুই অরণ্যে রোদনে পরিণত হয়েছে। তার ফলে হতভাগ্য মুসলিম সমাজ প্রায় শতাব্দীকাল যাবত শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত রয়ে গেল। বিংশতি শতাব্দীর প্রথম পাদে মুসলমানদের উচ্চশিক্ষার জন্যে ১৯২৫ সালে কোলকাতা ইসলামিয়া কলেজ ও তার কিছু পূর্বে মুসলিম বালিকাদের জন্যে শাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ভারত বিভাগের কিছুকাল পূর্বে কোলকাতায় মুসলমানদের জন্যে লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজ স্থাপিত হয়।

বাংলার মুসলমান ও বোধনকৃত নতুন বাংলা ভাষা

বাংলা ভাষার এবং বিশেষ করে বাংলা গদ্যের জন্ম ও ক্রমবিকাশের উপরে বাংলা ভাষার পন্ডিতগণ দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং এর উপরে বিরাট বিরাট গ্রন্থও রচিত হয়েছে। সে আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তবে, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস থেকে বাংলা ভাষার আলোচনা বাদ দিলে ইতিহাসের প্রতি অবিচার করা হবে। সেজন্যে সংক্ষেপে হলেও এ বিষয়ে মূলকথা কিছু বলে রাখা দরকার। বাংলাভাষার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় ১৭৭৮ সালের পূর্বে এর রূপ ও আকৃতি ছিল একরূপ এবং পরে এ ভাষা ধারণ করে আর এক রূপ।

এদেশে ইংরেজদের আগমনের পূর্বে বাংলাভাষার যে রূপ ছিল তার মধ্যে ছিল অজস্র আরবী–ফার্সী শব্দের মিশ্রণ। এ ছিল তৎকালীন সর্ববংগীয় মাতৃভাষা। এ সাহিত্যের বিকাশ ছিল প্রধানতঃ পদ্যে। গদ্য সাহিত্যের ততোটা প্রচলন ছিল না। থাকলেও তার উন্নতিকল্পে কোন প্রচেষ্টা চালানো হয়নি। এই যে আরবী–ফার্সী শব্দবহুল বাংলা ভাষা এ শুধু এ দেশের মুসলমানের ভাষা ছিল না। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষ সকলেরই ছিল এ ভাষা। চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজ, সরকার সমীপে আবেদন নিবেদনে হিন্দু–মুসলমান উভয়েই এ ভাষা ব্যবহার করতো। প্রাচীন রেকর্ড থেকে গৃহীত জনৈক হিন্দু কর্তৃক একখানি পত্রের উদ্ধৃতি দৃষ্টান্তস্বরূপ পেশ করা হচ্ছে—

শ্রীরাম। গরীব নেওয়াজ সেলামত। আমার জমিদারী পরগণে কাকজোল তাহার দুইগ্রাম শিকিস্তি হইয়াছে সেই দুই গ্রাম পয়স্তি হইয়াছে—চাকালেএকবেলপুরের শ্রী হরে কৃষ্ট রায় চৌধুরী আজ জবরদস্তি দখল করিয়া ভোগ করিতেছে। আমি মালগুজারীর সরবরাহতে মারা পড়িতেছি—উমেদওয়ার যে সরকার হইতে আমিও এক চোপদার সরেজমিনেতে পঁহুচিয়া তোরফেনকে তলব দিয়া আদালত করিয়া হক দেলাইয়া দেন। ইতি ১১৮৫ তারিখ ১১ শ্রাবণ। ফিদবী জগতাধিব রায়। (চিঠিখানির ইংরেজী তারিখ হবে ১৭৭৮ সালের ২৬শে জুলাই)।

এ চিঠিখানির উল্লেখ করে সমকালীন বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর সজনীকান্ত এরূপ মন্তব্য করেন ঃ

এক হিসেবে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে যে ভাষার প্রমাণিক আত্মপ্রকাশ দেখিতেছি তাহা দেশে মুসলমান প্রভাবের ফল। পরবর্তীকালে হেনরী–পিটার ফ্রস্টার ও উইলিয়াম কেরী বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত জননীর সন্তান ধরিয়া আরবী পারসীর অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে রীতিমত ওকালিত করিয়াছেন। (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পৃঃ ৬২)।

সজনীকান্ত আরও বলেন ঃ কিন্তু ইংরেজের আগমন না ঘটিলে আজিও আমাদিগকে 'গরীব নেওয়াজ সেলামত' বলিয়া শুরু করিয়া 'ফিদবী' বলিয়া শেষ করিতে হইতো। তাহা মংগলের হইত কি অমংগলের হইত, আজ সে বিচার করিয়া লাভ নাই।...১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে এই আরবী পারসী নিসূদন যজ্ঞের সূত্রপাত এবং ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে আইনের সাহায্যে কোম্পানীর সময় সদর–মফস্বল আদালতসমূহে আরবী পারসীর পরিবর্তে বাংলা ও ইংরেজীর প্রবর্তনে এই যজ্ঞের

পূর্ণাহুতি। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মও এই বৎসরে। এই যজ্ঞের ইতিহাস অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। আরবী পারসীকে অশুদ্ধ ধরিয়া শুদ্ধ পদ প্রচারের জন্য সেকালে কয়েকটি অভিধান রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। সাহেবরা সুবিধা পাইলেই আরবী ও পারসীর বিরোধিতা করিয়া বাংলা ও সংস্কৃতকে প্রাধান্য দিতেন। ফলে দশ পনের বৎসরের মধ্যেই বাংলা গদ্যের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণই পরিবর্তিত হইয়াছিল। (বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস–পৃঃ ৩২)।

উপরে বর্ণিত উইলিয়াম কেরী সায়েবদের আরবী–ফার্সীর বিরুদ্ধে ওকালতির কারণ ছিল। আবদুল মওদূদ যথার্থ বলেছেন— প্রাচ্য খন্ডে ইউরোপের বিজয়াভিযান হয়েছিল সুপরিকল্পিত তিনটি উপায়ে ঃ পণ্যবাহী বণিকরূপে, তার পিছনে অস্ত্র নিয়ে পণ্য নিরাপত্তার অজুহাতে এবং তাদের পিছনে মিশনারী নিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির তালিম দেয়ার মহৎ উদ্দেশ্যে। (আবদুল মওদূদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ . . .পৃঃ ৩৬৩)।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির তালিম দেয়ার জন্যে তৃতীয় পর্যায়ে এসেছিল খৃস্টান মিশনারীগণ। কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন দেশগুলিতে খৃস্টধর্ম প্রচারের জন্যে ইংলন্ডে কতকগুলি ধর্মীয় সংস্থা গঠিত হয়েছিল; তাদের মধ্যে উইলবারফোর্সের নেতৃত্বে ক্লাপহাম উপদলটি (Clapham Seer) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চার্লস্ গ্রান্ট ছিলেন এ উপদলটির সদস্য এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর। তিনি ভারত ভ্রমণের পর এ দেশের অধিবাসীদের ধর্মীয় ও নৈতিক অবস্থার এক নৈরাশ্যজনক চিত্র তুলে ধরে বলেন, "তারা যে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে আছে তার একমাত্র সমাধান হচ্ছে—তাদের মধ্যে খৃস্টধর্মের আলোক প্রজ্জ্বলিত করা। হিন্দুরা অজ্ঞ বলে তারা ভুল করছে। তাদের ভ্রান্তি তাদের কাছে তুলে ধরা হয়নি। তারা যে উচ্ছৃংখলতা ও পাপাচারে লিপ্ত আছে, তা দূর করার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে তাদের মধ্যে আমাদের আলোক ও জ্ঞান বিতরণ করা।"

(Grant's Observations, published in the printed parliamentary paper relating to the affairs of India Several Vol. viii (734), Appendix I. Published 1832, pp. 3-60; M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & English Education, pp. 30-32)।

খৃস্টান মিশনারীগণ তাদের ধর্ম প্রচারের জন্যে প্রধানতঃ এ দেশের হিন্দুকে বেছে নিয়েছিল। এ কাজের জন্যে তাদের অনিবার্যরূপে প্রয়োজন হয়েছিল বাংলাভাষা শিখবার ও শিখাবার। হুগলী শ্রীরামপুরে এ উদ্দেশ্যে তারা একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করে। পূর্বে বলা হয়েছে—এযাবত বাংলায় যে বাংলা ভাষা রূপ লাভ করেছিল—তা ছিল মিশ্র বাংলা অর্থাৎ আরবী–ফার্সী শব্দ মিশ্রিত বাংলা। যদিও এ বাংলা হিন্দু মুসলমান উভয়ের কথ্যভাষা ছিল, তথাপি হিন্দু ব্রাহ্মণ পন্ডিতগণ এ ভাষাকে ঘৃণা করতেন। মুসলমান জাতি তাদের কাছে 'ম্লেচ্ছ', 'যবন' ও ঘৃণিত জীব। তাদের আরবী–ফার্সী ভাষাও তাদের কাছে ছিল ঘৃণিত। সম্ভবতঃ গোঁড়া হিন্দু পন্ডিতগণ আরবী–ফার্সী শব্দের মধ্যে 'গোমাংসের' গন্ধ অনুভব করতেন। এ ভাষাকে তাঁরা প্রাকৃত বা লৌকিক আখ্যা দিয়ে অভিশাপ করলেন। ইতিপূর্বে মুসলমান সুলতানদের আমলে এ ভাষায় অনেক হিন্দুধর্ম–গ্রন্থ অনূদিত হয়েছিল। একালের পন্ডিতগণ ফতোয়া দিলেন ঃ

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানিশ্চ,
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।

—ভাষায় অর্থাৎ লৌকিক ভাষায় অষ্টাদশ পুরাণ রামচরিত ইত্যাদি যে মানব শুনবে, তার ব্যবস্থা রৌরব নরকে।

(আবদুল মওদূদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ. . . পৃঃ ৩৪৪)।

এ কথা খৃস্টান মিশনারীগণও ভালোভাবে উপলব্ধি করেন যে, যে ভাষার প্রতি হিন্দু পন্ডিতগণ ঘৃণা পোষণ করেন, সে ভাষার শুদ্ধিকরণ ব্যতীত তার দ্বারা খৃস্টধর্মে আকৃষ্ট করা কষ্টকর হবে। তাই তাঁরা এক ঢিলে দুই পাখী মারার পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হন। ভাষাকে আরবী–ফার্সীর ছোঁয়াচ্ থেকে রক্ষা করে হিন্দুর গ্রহণযোগ্য করা, এবং মুসলমানদের বাংলা মাতৃভাষার নিসূদন যজ্ঞ বা ধ্বংসযজ্ঞ সম্পাদন করা যার উল্লেখ সজনীকান্ত করেছেন। এ মহান (?) উদ্দেশ্যে নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড (Halhed) ১৭৭৮ সালে A Grammar of the Bengali Literature নামে বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন এবং শ্রীরামপুর প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। মুদ্রিত গ্রন্থ হিসাবে এইটিই ছিল প্রথম যাতে প্রথম বাংলা অক্ষর ব্যবহৃত হয়। এ ব্যাকরণের মাধ্যমে এতদিনের প্রচলিত বাংলা ভাষার পরিবর্তে এক নতুন বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়। যে ভাষা ছিল একেবারে আরবী–ফার্সী শব্দ বিবর্জিত এবং সংস্কৃত শব্দবহুল। ব্যাকরণটির ভূমিকায় হ্যালহেড

বলেন, "এ যুগে তাঁরাই মার্জিত ভাষায় কথা বলেন, যাঁরা ভারতীয় ক্রিয়াপদের সংগে অজস্র আরবী ফার্সী বিশেষ্যের মিশ্রণ ঘটান।" অতএব একথা নিঃসন্দেহ যে, আঠারো শতকের মার্জিত বাংলা কথ্যভাষা এবং গদ্য ভাষার কাঠোমোতে ছিল অজস্র আরবী-ফার্সী শব্দের মিশ্রণ—যার দৃষ্টান্ত উপরে বর্ণিত জনৈক হিন্দু জগতাধিব রায়ের পত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি।

উল্লেখযোগ্য যে, কোম্পানীর ইংরেজ সিভিলিয়ানদেরকে বাংলা ভাষা শিক্ষা দেয়ার জন্যে ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হয়। উইলিয়াম কেরী হন এ বিভাগের অধ্যক্ষ। তাঁর অধীনে আটজন পন্ডিত নিযুক্ত হন। তাঁদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় তর্কালংকার ও রামরাম বসুর নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁদের সহায়তায় কেরী বাংলা গদ্য পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করতে থাকেন। প্রথমে রচিত হয় 'কথোপকথন' ও পরে 'ইতিহাস মালা'। বলা বাহুল্য গ্রন্থ দুটির ভাষা ছিল সংস্কৃত স্টাইলের এবং বিষয়বস্তুও ছিল মুসলমানবর্জিত। প্রতাপ আদিত্য, রূপ সনাতন ও বীরবল ছিলেন ভারতীয় ইতিহাসের উপজীব্য চরিত্র। অতএব ভাষা ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে পন্ডিতদের সাধনায় ও হিন্দুত্বের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠায়—ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতায় হয়েছিল ক্ষেত্র প্রশস্ত। একদিকে মিশনারীদের ছিল একটা অসভ্য জাতিকে অন্ধকার হতে আলোকে নিয়ে যাওয়ার দম্ভ। আর অন্যদিকে ছিল পন্ডিতদের সংস্কৃতের তনয়ারূপে বাংলাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে হিন্দুদের মাহাত্ম্য প্রকাশের অসীম উদ্যম ও আগ্রহ। এ দুটি উদ্দেশ্যের ধারা সম্যকভাবেই প্রতিফলিত দেখা যায়—এই কেরীর সৈনাপত্যে পন্ডিতদের রচিত ওই সময়ের গ্রন্থগুলির ভাষা ও বিষয়বস্তুর মূল্যায়নকালে।

(বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, সজনীকান্ত দাস-পৃঃ ১১২; আবদুল মওদূদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ৩৬৪)।

অতএব এসব তথ্যের ভিত্তিতে একথা আজ দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, ইংরেজ ও হিন্দুর যোগসাজসে মুসলমানরা শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থেকেই বিতাড়িত হয়নি। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে তাদের যে মাতৃভাষাটি গড়ে উঠেছিল তাকেও নস্যাৎ করা হলো। সমাজের উচ্চস্থান থেকে নীচে নিক্ষেপ করা হলো। মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে অন্যকে দেয়া হলো এবং শেষ সম্বল মুখের ভাষাটিও ধ্বংস করা হলো 'নিসূদন যজ্ঞের' মধ্যমে।

শ্রদ্ধেয় আবদুল মওদূদ বলেন—"এই মিশ্ররীতির বাংলাভাষায় সাহিত্য গড়ে উঠার মুখেই বণিকের তুলাদন্ড হলো রাজদন্ডে রূপান্তরিত এবং বণিকের তল্পীবাহক মিশনারীরাও দিলেন সাহিত্যের ভাষার মোড় পরিবর্তন করে। . . . পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তকরা বাংলা ভাষার কাঠামোকেও নতুন ছাঁচে তৈরী করে দিলেন—বাবু সম্প্রদায়ের জন্যে। তার দরুন বাবু কাল্‌চারের আবাহন হলো যে ভাষায়, তা কেবল সংস্কৃত ঘেঁষা নয়, একেবারে সংস্কৃতসম। আর এটিও হয়েছে সুপরিকল্পিত সাধনায়—হিন্দু পন্ডিতরা উল্লসিত হলেন তার দরুন—সংস্কৃত ভাষা ও কৃষ্টির নব প্রবর্তনের সম্ভাবনায় এবং মিশনারীকুল তৎপর হয়েছিলেন মুসলমানদের মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে তাকে সাহিত্য ও কাল্‌চারের দিক দিয়েও নিঃস্ব করে দিতে।"

(আবদুল মওদূদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ পৃঃ ৩৫৮)।

ইংরেজ তথা মিশনারী-পূর্ব বাংলা ভাষাকে ভিত্তি করে মুসলমানদের যে এক নতুন বাংলাভাষা গড়ে উঠে, যার মধ্যে শক্তি ও প্রেরণা সঞ্চার করছিল আরবী ও ফার্সী তাকে বলা যেতে পারে মুসলমানী বাংলা। স্বভাবতঃই তা মোটেই গ্রহণযোগ্য ছিল না হিন্দুদের কাছে। ১৮৩৭ সালের পর হিন্দুবাংলা (আরবী-ফার্সী শব্দ বর্জিত সংস্কৃত শব্দবহুল বাংলা) প্রাদেশিক মাতৃভাষা হিসাবে সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি লাভের পর মুসলমানী বাংলার অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়। অফিস-আদালত থেকে এতদিনের প্রচলিত ফার্সী ভাষা তার আপন মর্যাদা হারিয়ে ফেলে এবং নতুন বোধনকৃত বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে থাকে। নতুন বাংলা ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে থাকে এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর এ ভাষা হিন্দু সংস্কৃতি ও জাতীয় আশা-আকাংখার বাহন হিসাবে মর্যাদা লাভ করে।

এ নতুন বাংলা ভাষাকে স্কুল কলেজে মাতৃভাষা হিসাবে বাধ্যতামূলক করা হয়। এমনকি যে কোলকাতা মাদ্রাসায় অনেক ছাত্র মুসলমানী বাংলাও জানতোনা, সেখানেও এই নতুন বাংলা পাঠ্য করা হয়। প্রফেসার উইলসন প্রমুখ ইউরোপীয় শিক্ষাবিদগণ সংস্কৃত ভাষার সপক্ষে এমন জোর ওকালতি শুরু করেন যে, সায়েবদের সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করাটা একটা চরম বাতিকে পরিণত হয়। উইলসন একটি সহজ সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করে সায়েবদের সংস্কৃত শিক্ষার পথ সুগম করে দেন। ১৮২৮ সালে তিনি'বাংলাভাষায় ইউরোপীয় জ্ঞান-

বিজ্ঞান অনুবাদ সমিতির' প্রেসিডেন্ট হন এবং General Committee of Public Instruction বা জনশিক্ষা সাধারণ কমিটির পৃষ্ঠপোষকতায় নতুন বাংলাভাষায় বহু পুস্তক রচনা করেন। এসব বইপুস্তক পাঠ্যপুস্তকে পরিণত হয়। মুসলমানী বাংলা এবং নতুন বাংলার মধ্যে শুধু ভাষার দিক দিয়েই নয়–বিষয়বস্তু, সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাসের দিক দিয়ে এমনই আকাশ–পাতাল পার্থক্য ছিল যে, মুসলমানদের জন্যে নতুন ভাষা গ্রহণ অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে পড়ে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি গ্রন্থের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

করুণা নিধন বিলাস, পদাংক দূত, বিল্ব মংগল, গীতা গোবিন্দ—শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কিত,

চন্ডী, আনন্দ মংগল দূর্গা সম্পর্কিত,

মহিমা স্তব, গংগা ভক্তি—শিব গংগা সম্পর্কিত

চৈতন্য চরিতামৃত, রস মঞ্জরী, আদিরস, পদাবলী, রতিকাল, রতি বিলাস–প্রেমোদ্দীপক।

স্কুলে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে গৃহীত ঃ

শিশু বোধক—বাংলার সর্বত্র এবং গ্রাম্য স্কুলগুলিতে ব্যাপকভাবে পড়ানো হয়। এর মধ্যে ছিল বহু সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ যা প্রধানতঃ হিন্দু দেব–দেবী সম্পর্কে লিখিত। এর প্রথম পাঠগুলি—সরস্বতী, গংগা প্রভৃতি সমীপে প্রার্থনা দিয়ে শুরু করা হয়েছে।

তারপর আসে আনন্দ মংগলের কথা। এটাও আগাগোড়া হিন্দুধর্ম ও তাদের দেব–দেবীদের স্তবস্তুতিতে পরিপূর্ণ। এ ধরনের আরও বহু পাঠ্যপুস্তকের নাম পাওয়া যায়। (M. Fazlur Rahman : The Bengali Muslims & Eng. Education, pp. 106-108)।

উল্লেখযোগ্য যে, সংস্কৃতসম হিন্দুবাংলার পূর্বে যে বাংলা ভাষা কয়েক শতাব্দী যাবত লালিত–পালিত ও পরিপুষ্ট হচ্ছিল তা প্রধানতঃ ছিল পদ্যসাহিত্য বা পুঁথিসাহিত্য। এ সাহিত্যকে আধুনিককালে পুঁথিসাহিত্য হিসাবেই চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু এ সাহিত্যের যারা চর্চা করেছেন, তাঁদের দুজন 'মালে মুহাম্মদ' ও 'মুহাম্মদ দানিশ' এ সাহিত্যের রীতিকে বলেছেন 'চলতি বাংলা' এবং 'রেজাউল্লাহ' (১৮৬১) বলেছেন 'ইসলামী বাংলা'। ১৮৫৫ সালে পাদরী লং তাঁর

গ্রন্থতালিকায় এ ভাষাকে বলেছেন 'মুসলমানী বাংলা' আর এ ভাষায় রচিত সাহিত্যের নামকরণ করেছেন 'মুসলমানী বাংলা সাহিত্য'।

(আবদুল মওদূদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ . . . সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ৩৫৫)।

এ সাহিত্যের প্রতি হান্টার সায়েবের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং তিনি বলেন ঃ

আজ পর্যন্ত বদ্বীপ অঞ্চলের কৃষক সমাজ মুসলমান। নিম্নবংগে ইসলাম এতই বদ্ধমূল যে, এটি এক নিজস্ব ধর্মীয় সাহিত্য ও লৌকিক উপভাষার উদ্ভব ঘটিয়েছে। হিরাতের ফার্সী ভাষা থেকে উত্তর ভারতের উর্দু যতোখানি পৃথক, 'মুসলমানী বাংলা' নামে পরিচিত উপভাষাটি উর্দু হতে ততোখানি পৃথক।" (W. W. Hunter : The Indian Mussalmans, p. 146)।

এ সাহিত্যের যে নামই দেয়া হোক, তা ছিল না প্রাণহীন। কয়েক শতাব্দী যাবত তা লক্ষ লক্ষ মুসলমান নর–নারীর প্রাণে সাহিত্য তরংগ তুলেছে। তাদের চিন্তা–ভাবনা ও আশা–আকাংখাকে প্রভাবিত করেছে। শ্রী শ্রী কুমার বন্দোপাধ্যায় বলেন—

মুসলমান সাহিত্যের গল্পভান্ডারও নিতান্ত দরিদ্র ছিলনা। 'আরব্য উপন্যাস', 'হাতেম তাঈ', 'লায়লা মজনু', 'চাহার দরবেশ', 'গোলে বাকাওলী' প্রভৃতি আখ্যায়িকাগুলি নিশ্চয়ই বাঙালী পাঠকের সম্মুখে এক অচিন্তপূর্ব রহস্য ও সৌন্দর্যের জগত উন্মুক্ত করিয়াছিল। . . . উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন ইংরেজী সাহিত্যের আদর্শে আমাদের উপন্যাস সাহিত্য ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল তখন এই শ্রেণীর মুসলমানী গল্পের অনুবাদ আমাদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার একটা প্রধান অংগ হইয়াছিল। উহারা পাঠকের হৃদয় স্পর্শ ও রুচি আকর্ষণ করিতে না পারিলে আমাদের সাহিত্যিক উদ্যমের একটা মুখ্য অংশ কখনই উহাদের অনুবাদে নিয়োজিত হইতে পারিত না। অন্ততঃ এই সমস্ত গল্পের মধ্যে একটা চমকপ্রদ (Sensational), বর্ণবহুল (Romance), একটা নিয়ম–সংযমহীন সৌন্দর্য বিলাসের অপরিমিত প্রাচুর্য আছে, তাহাই আমাদের একশ্রেণীর ধর্মশাস্ত্রাস্বাদক্লিষ্ট, অবসাদগ্রস্ত রুচিকে অনিবার্য বেগে আকর্ষণ করিয়াছিল। (বংগসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা, শ্রী শ্রী কুমার বন্দোপাধ্যায়–৪র্থ সং, পৃঃ ১৮–১৯)।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও সাম্প্রদায়িকতা

আধুনিক বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি এবং সমৃদ্ধি ও উন্নয়নে যাঁদের অবদান রয়েছে, তাঁদের মধ্যে রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার ও রাজা রামমোহনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত দু'জন উইলয়াম কেরী কর্তৃক নিযুক্ত পন্ডিতগণের অন্তর্ভুক্ত। রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য' গ্রন্থ ১৮০১ সালে প্রকাশিত হয়। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার পাঁচখানি গ্রন্থ রচনা করেন, তার মধ্যে রাজাবলী (১৮০৮) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারপর আসে রামমোহনের নাম। তাঁর গদ্যসাহিত্য ছিল বলিষ্ঠ ও প্রাণবন্ত। কিন্তু এঁদের সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা বা মুসলিম বিদ্বেষ ছিল না। অবশ্যি মৃত্যুঞ্জয়ের 'রাজাবলী' ছিল চন্দ্র বংশের ক্ষেত্রজ সন্তান বিচিত্রাবলী থেকে বাংলাদেশের কোম্পানী শাসন প্রতিষ্ঠার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস লেখার প্রথম প্রয়াস এবং মুসলমানী আমলটা অত্যন্ত অযত্নের সংগে বিদ্বেষদুষ্ট ভংগীতে লেখা।

পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের অংগনে দু'জন দিকপালের আবির্ভাব হয়। বাংলা পদ্যসাহিত্যে মাইকেল মধুসূদনের এবং গদ্য সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের। বাংলা সাহিত্যে তাঁদের শ্রেষ্ঠ অবদান অনস্বীকার্য।

আবদুল মওদূদ বলেন—

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার বিকাশক্ষেত্রে যখন মধ্যাহ্ন গগন বিরাজমান, তখন বাংলার রাজনৈতিক গগনেও মোড় ফিরে গেছে। তখন ইংরেজের সংগে হার্দিক সম্বন্ধে বিদারণ রেখা দেখা দিতে শুরু করেছে। ইংরেজের অনুগ্রহের ষোলআনা অংশটার এক পক্ষ প্রবল দাবী জানাচ্ছে আত্মসচেতন হয়ে। শিক্ষিত বর্ণহিন্দু সমাজে বেকার সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এবং তার দরুন তাদের মনে নৈরাশ্যভাব দেখা দেয়ায় তারা হিন্দুজাতীয়তা মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই যুগমানসের সন্তান। তিনি রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ–মনের প্রতিভূ হিসেবে এবং হিন্দু জাতীয়তা মন্ত্রের উদ্যোক্তা ঋষি হিসেবে বাংলার সাহিত্যাকাশে আবির্ভূত হলেন। এবং এভাবে তীব্র সাম্প্রদায়িকতার যে বিষবহ্নি তিনি ছড়িয়ে দিলেন লেখনী মুখে, জগতের ইতিহাসে তার দ্বিতীয় নজীর নেই। প্রগাঢ় পান্ডিত্য, ক্ষুরধার বুদ্ধি ও গভীর বিশ্লেষণ শক্তির অধিকারী হয়েও সংকীর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল ও রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের আদর্শের–উদ্দেশ্যের ক্রীড়নক হয়ে তিনি মানবতার যে অকল্যাণ ও অসম্মান করে গেছেন, তারও পৃথিবীর ইতিহাসে তুলনা নেই। অস্ত্রের মুখে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়, কালের প্রলেপে সে ক্ষতও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

কিন্তু লেখনীর মুখে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়, তার নিঃশেষ নেই, নিরাময় নেই— যুগ থেকে যুগান্তরে সে ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে।

—(আবদুল মওদূদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ৩৬৯–৭০)।

সাহিত্যের মাধ্যমে বঙ্কিম মুসলিম সমাজ ও জাতির বিরুদ্ধে যে বিষবহ্নি প্রজ্জ্বলিত করে গেছেন, দৃষ্টান্তসহ তার কিছু আলোচনা আমরা পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে করেছি। বাংলা তথা ভারত উপমহাদেশে হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের চরম অবনতির জন্যে তাঁর সাহিত্যই প্রধানতঃ দায়ী।

বঙ্কিম তাঁর 'রাজসিংহ' ও 'আনন্দমঠে' মুসলমান বিদ্বেষের যে বিষবহ্নি উদগীরণ করেছেন সে বিষজ্বালায় এ বিরাট উপমহাদেশের দু'টি বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে যেটুকু সম্প্রীতির ফল্গুধারা ছিল, তা নিঃশেষে শুষ্ক ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। . . . এ উপমহাদেশে মুসলমানের অস্তিত্বও বঙ্কিমচন্দ্র অস্বীকার করে তাদের বিতাড়িত করে সদাশয় ব্রিটিশজাতির আবাহনে ও প্রতিষ্ঠায় তিনি বার বার মুখর হয়ে উঠেছেন। (ঐ. . . পৃঃ ৩৭০)।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পূর্বে মুসলমানদের যে সাহিত্য সাধনা ছিল, তার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার কোন লেশমাত্র বিদ্যমান ছিল না। একথা হিন্দু সাহিত্যসেবীগণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন।

মুসলমানদের কাব্য কাহিনীতে সাম্প্রদায়িক হিন্দুধর্মের পরিবর্তে আছে সুফী মতবাদের প্রভাব ও ছদ্মবেশী রূপকাভিপ্রায়, ও ইহার ঘটনাবলীও প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিবিম্ব নহে। জীবনোদ্ভুত এক উচ্চতর আদর্শ কল্পনার সুকুমার ভাবরঞ্জিত ও অসাধারণত্বের স্পর্শদীপ্ত।

—(বংগ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রী শ্রী কুমার বন্দোপাধ্যায়, ৪র্থ সং, পৃঃ ১৮–১৯)।

একথা উল্লেখ্য যে, সাহিত্যের অংগনে সাম্প্রদায়িকতার বীজ প্রথম বপন করেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'অঙ্গুরী বিনিময়ে' (১৮৫৭)। সম্ভবত তাঁর থেকে প্রেরণা লাভ করে বঙ্কিম সে বীজকে সাম্প্রদায়িকতার বিরাট বিষবৃক্ষে পরিণত করেন। বঙ্কিমের মৃত্যুর পরে বাংলা সাহিত্য সাম্প্রদায়িকতার পংকিলতা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেনি। তাঁর পদাংক অনুসরণ করে পরবর্তীকালেও লেখনী চালনা করেছেন পন্ডিত–অপন্ডিত, সাহিত্যিক–অসাহিত্যিক বর্ণহিন্দু সম্পদায়।

বাংলা সাহিত্যকে যে দু'জন মনীষী–কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সুষমামন্ডিত ও কিরীটশোভিত করেছেন, তাদের লেখনীও সে পংকিলতার স্পর্শমুক্ত হতে পারেনি। শরৎচন্দ্রের সাম্প্রদায়িকতা বিষদুষ্ট লেখনীর উদ্ধৃতি আমরা উপরে দিয়েছি।

কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথকেও যখন এ আবর্তে অবগাহন করতে দেখি তখন ক্ষোভে ও লজ্জায় স্বতঃই বেদনার্তকণ্ঠে মুসলমান বলে উঠে জুলিয়াস সীজারের মতো ঃ Et tu Brute! তোমাকে ত রবীন্দ্রনাথ,এসবের উর্ধ্বে ভেবেছিলাম। এ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ না করে রবীন্দ্রনাথের 'দুরাশা' গল্পটি ও 'শিবাজী উৎসব' কবিতা পাঠ করে দেখতে পাঠক সমাজকে অনুরোধ করি।

(আবদুল মওদূদ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ৩৭১)।

অষ্টম অধ্যায়

আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলমান

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সাধনা যখন সাফল্যের শীর্ষে, তখন তারই সমসাময়িক একজন মুসলমান বাংলাসাহিত্য গগনে উদিত হন। তিনি হলেন মীর মশাররফ হোসেন। তাঁর সাহিত্য ছিল আলবৎ আধুনিক বাংলা সাহিত্য এবং রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতার বহু উর্ধ্বে। বঙ্কিমচন্দ্র যখন সাহিত্যের অংগনে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছিলেন, তখন মশাররফ হোসেন সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে শিল্পীসুলভ মনোভাব নিয়ে মুসলমানদের প্রতি উপদেশমূলক সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। চল্লিশ বছরেরও অধিক সময় তিনি সাহিত্য সাধনা করেন এবং উপন্যাস, জীবনী, ঐতিহাসিক কাহিনী, নাটক, রম্যরচনা, কবিতা ও গান তাঁর সাহিত্য সাধনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর শ্রেষ্ঠতম রচনা 'বিষাদসিন্ধু'। বিষাদসিন্ধুর চরিত্রগুলি ইতিহাস থেকে গৃহীত হলেও এটাকে কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলা যায় না। তথাপি মুসলমান সমাজে এটা ছিল সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের গগনে আর একটি জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটে এবং তা হলো বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম। বাংলা সাহিত্যের অংগনে আরও অনেক মুসলিম কবি–সাহিত্যিকের আগমন সমসাময়িককালে হয়েছে। যথা– কায়কোবাদ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মুন্সী মেহেরুল্লাহ প্রমুখ। নিজেদের স্বতন্ত্র ধারায় সাহিত্য সৃষ্টি করে তাঁরা মুসলমান জাতিকে আত্মসচেতনায় ও স্বাতন্ত্রবোধে উদ্বুদ্ধ করেন। নজরুলের আগেও বাংলা সাহিত্যের আসরে বহু মুসলিম কবি সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু তাঁদের ও নজরুলের সাহিত্য ধারায় ছিল সুস্পষ্ট পার্থক্য। অন্যান্যগণ সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করেছেন, মনে হয়, ভীরু পদক্ষেপে, মনের দুর্বলতা সহকারে। বাংলা সাহিত্যকে হিন্দুর, সংস্কৃত–তনয়া মনে করে গা বাঁচিয়ে যেন তাতে ছোঁয়া না লাগে মুসলমানের আরবী–উর্দু–ফার্সীর শব্দাবলীর, এমনকি উপমায়, অলংকারে ও রচনারীতিতে মুসলমানী নিদর্শন–আলামতকে সতর্কতার সাথে বাঁচিয়ে চলেছেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নজরুলের হঠাৎ আবির্ভাব যেমন সৃষ্টি